সৌখীন নাট্যকলায়

রবীন্দ্রনাথ

সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
২৫শে বৈশাখ,
১৮৮১ শকাব্দ

৩'৫০
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

রবীন্দ্রতীর্থে আমার সতীর্থ

শ্রীঅমল হোম

সুহৃদ্বরেষু

ভূমিকা

একটু ভূমিকা দরকার।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেসে যাবার অল্পদিন পরেই আমি দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি।

ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করতে পারেন এমন কয়েকজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আমার আলোচনা অধিকতর বিশদ ও সম্পূর্ণ করে তুলব। কিন্তু রোগশয্যায় বন্দী হয়ে সে ইচ্ছাও কার্যে পরিণত করতে পারলুম না। দু'একটি তথ্য সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ থেকে গিয়েছে। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সংক্রান্ত আরো কিছু কিছু উপকরণ হাতে মজুদ থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়নি। একাধিক ক্ষেত্রে অল্পস্বল্প পুনরাবৃত্তিও থাকতে পারে। এসব বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আমার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে পাঠকরা আমাকে ক্ষমা করলে বাধিত হব। যদি ব্যাধিমুক্ত হই এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সুযোগ পাই, তবে কথিত অপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করবার চেষ্টা করব।

সাহিত্য এবং চারুকলায় অতুলনীয় ও বিস্ময়কর প্রতিভার অবতার রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বিশেষত্ব নিয়ে বহু পণ্ডিত, চিন্তাশীল ও লিপিকুশল ব্যক্তি অসংখ্য তার আলোচনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তবে রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যজীবন নিয়ে একটি ধারাবাহিক পৃথক আলোচনা অদ্যাবধি সাধারণ পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়নি ব'লেই জানি। আমার শক্তি অল্প ও লেখনী দুর্ব্বল হ'লেও আমি সেই অভাবই কতকটা করবার চেষ্টা করেছি, এর চেয়ে আর বেশী কিছু বলতে চাই না।

কয়েকজন লেখকের রচনা থেকে অল্পবিস্তর সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা আমার ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষ করে একজনের কাছে আমি বেশী ঋণী—তিনি শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর "রবীন্দ্রজীবনী" হচ্ছে বহু তথ্যের আকর। ইতি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে সৌখীন অভিনয়ের ধারা

সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় নিয়ে প্রথম আলোচনা। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, সৌখীন নট বলতে তাঁকেই বোঝায়, যিনি বৈতনিক বা পেশাদার নন। তবে সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের শিল্পী যদি কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করবার জন্যে টাকা তোলবার চেষ্টা করেন, তা'হলে তাঁকে পেশাদার ব'লে গণ্য করা হয় না।

বালক ও কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের বাড়ীতে পারিবারিক নাট্যাভিনয়ের সমারোহ দেখেছেন এবং সেখানকার সৌখীন শিল্পীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন যৌবনসীমায় পদার্পণ ক'রেই। তারপর থেকে প্রায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত তাঁর ঐ নাট্যসাধনার ধারা ছিল অব্যাহত। সৌখীন নাট্যজগতে তাঁর মত বিস্ময়কর, অতুলনীয় ও সমর্পিতচিত্ত সাধক পৃথিবীর আর কোথাও দেখা গিয়েছে ব'লে জানি না। কাজেই সর্ব্বপ্রথমেই বাংলাদেশের সৌখীন নাট্যাভিনয়ের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠকদের সুবিধার জন্যে প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি।

পৃথিবীর সব দেশেই সৌখীন শিল্পীরাই নাট্যাভিনয়ের আসরে দেখা দিয়েছেন সর্ব্বপ্রথম। বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যায়, যদিও কলকাতা সহরের প্রথম বাংলা থিয়েটারে বাংলা ভাষায় প্রথম অভিনয় দেখাবার ভার নিয়েছিলেন বিদেশী হেরাসিম লেবেডেফ (১৭৯৫ খৃঃ), কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়কে সৌখীন ব'লে গণ্য করা চলে না। ঐ সম্প্রদায়টি আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানও ছিল না এবং তারও কিঞ্চিদধিক তিন যুগ পরে বাঙালীর দ্বারা প্রথম বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে লেবেডেফ সাহেবের একটি মত নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। তখনকার বাঙালী দর্শকদের রুচি সম্বন্ধে তিনি উন্নত ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি বলেছেন: "এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—অনুকরণ ও হাসিতামাসাই বেশী পছন্দ করে" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ)। কিন্তু লেবেডেফ সাহেব বাঙালীদের যে হালকা স্বভাবের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন, সেটা কেবল এদেশী দর্শকদেরই নিজস্ব

নয়। এলিজাবেথীয় যুগে যখন মার্লো, সেক্সপিয়ার, বেন জনসন এবং বুমণ্ট ও ফ্লেচার প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর নাটক রচনা ক'রে বিখ্যাত হয়েছেন, ইংলণ্ডের জনসাধারণও তখন গভীর ভাবের ভাবুক ছিল না। বিলাতের তখনকার দর্শকরা প্রেক্ষাগারে গিয়ে নিতান্ত অরসিকের মত যে সব অকাণ্ড বা কুকাণ্ড করত, এদেশের অতি নিম্নশ্রেণীর দর্শকরাও কোনদিন তা করেছে ব'লে শুনিনি। প্রফেসর জে. বি. ব্ল্যাক স্পষ্টই বলেছেন: "We should remember that Shakespearean drama was far above the habitual level of the contemporary dramatic productions. The Elizabethan play often staged scenes that would revolt a modern audience" প্রভৃতি। লেবেডেফ সাহেবও সেকেলে বাঙালী দর্শকদের জন্যে নির্ব্বাচন করেছিলেন ঐ শ্রেণীরই একখানি এলিজাবেথীয় নাটকের বাংলা অনুবাদ।

সকলেই জানেন, যাত্রা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি হ'লেও আমরা থিয়েটারের ভক্ত হয়েছি ইংরেজদেরই দেখাদেখি। কলকাতায় প্রথম সৌখীন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নাম তার হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১ খৃঃ), কিন্তু সেখানে অভিনীত হ'ত ইংরেজী নাটক! থিয়েটারে বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বাংলা নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন নবীনচন্দ্র বসু (১৮৩৩ খৃঃ)। কিন্তু নবীনবাবুর সম্প্রদায় ঠিক অবৈতনিক ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ আছে। লেবেডেফের মত নবীনবাবুর সম্প্রদায়েও নারী-ভূমিকা গ্রহণ করতেন অভিনেত্রীরাই। আঠারো শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে এবং উনিশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে বাংলা দেশের ভদ্রমহিলারা যে কেবল সখের খাতিরেই রঙ্গমঞ্চের উপরে আরোহণ করতেন, এটা বিশ্বাস করবার মত কথা নয়। তাঁরা যে পতিতা ছিলেন, এটা জোর ক'রেই বলা যায়। আজকের দিনেও বাঙালী পতিতারা বিনা বেতনে কেবল নাট্যানুরাগের জন্যে রঙ্গালয়ে দেখা দিতে প্রস্তুত নন, সুতরাং তখনকার কথা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু সে যুগের বাঙালী দর্শকরা বিনা দর্শনীতেই অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু অভিনেতারা (অন্ততঃ অনেকেই) যে অবৈতনিক ছিলেন না, তারও নিশ্চিত প্রমাণের অভাব নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিখ্যাত গোপাল উড়ের নাম করা যায়। তিনি রাধামোহন সরকারের "সৌখীন" সম্প্রদায়ে বৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। তখন সম্প্রদায় সখের হ'লেও অনেক অভিনেতাই যে কেবল সখের খাতিরেই অভিনয় করতেন না, এমন কথা অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে। সে সময়ে প্রায়ই ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সখ বা খেয়াল হ'লেই এক একটি নাট্য-সম্প্রদায়ের পত্তন হ'ত এবং লোকে তাকে সৌখীন সম্প্রদায় ব'লেই গ্রহণ করত।

অর্থের বদলে জনসাধারণের কাছ থেকে বাহবা পেলেই ধনী অনুষ্ঠাতারা পরম তৃপ্তিলাভ করতেন এবং তাঁদের সখ মিটলেই বা খেয়াল ফুরুলেই তথাকথিত সৌখীন সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'ত বর্ষণের অভাবে ভেকছত্রের মতই। খুব সম্ভব নবীনচন্দ্র বসু ছিলেন এই শ্রেণীরই সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের অধিকারী বা প্রতিষ্ঠাতা এবং এজন্যে তিনি যে "অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয়" করেছিলেন, এ কথাও জানতে পারা যায়। অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসুও লিখেছেন: নবীনচন্দ্র "তাঁহার নিজ বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যে চমকপ্রদ অভিনয় করাইয়াছিলেন তাহার নূতনত্বের মধ্যে ছিল কেবল অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য।" ("বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ")

আমাদের মতে, নবীনচন্দ্রের সম্প্রদায়ের নূতনত্ব "কেবল অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যে"র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এবং একেবারে সেকেলে হ'লেও সেই "চমকপ্রদ অভিনয়ের" রীতি অতি-আধুনিক যুগেও পাশ্চাত্য দেশে অভিনব ব'লে অবলম্বন করা হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু মাইকেল মধুসূদনের জীবনীতে ঐ ব্যাপারটির উল্লেখ ক'রে লিখেছেন: "আধুনিক রীতি অনুসারে বিচার করিলে নবীনবাবুর বাটীর অভিনয় অবশ্যই সম্পূর্ণ নাটকোচিত হয় নাই। তাহাতে **** প্রত্যেক দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দর্শকদিগকেও স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইত। বকুলমূলে উপবিষ্ট সুন্দর বা মালিনীর গৃহ দেখিবার জন্য দর্শকদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হইত। তথায় তাঁহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত। ইহাতে দর্শক ও অভিনেতা উভয়েরই অসুবিধা হইত।"

যোগীন্দ্রনাথের জীবনের উত্তমার্দ্ধ কেটে গিয়েছে উনিশ শতকের উত্তরার্দ্ধে। তাঁর পক্ষে অতি-আধুনিক যুগের কথা কল্পনা করা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু য়ুরোপে এখন স্থানে স্থানে ঐ শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ই প্রচলিত হয়েছে। ঠিক তারিখ মনে নেই, তিন-চার যুগ পূর্ব্বে বেলজিয়মের কবি-নাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্কও তাঁর পল্লীভবনে এই ভাবেই ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয় দেখিয়েছিলেন এবং বোধ করি যোগীন্দ্রনাথ তখন ইহলোকেই বিদ্যমান। তবে তিনি একটু খবর নিলেই জানতে পারতেন যে, নবীনচন্দ্রের সম্প্রদায়ের তথাকথিত "চমকপ্রদ অভিনয়ে"র মূলে আছে প্রাচীন বাংলারই অবদান। অনেকেই জানেন না বোধহয়, চৈতন্যদেব একাধারে কেবল ধর্ম্মবীর, মহাপণ্ডিত ও নর্ত্তকই নন, সেই সঙ্গে ছিলেন নিপুণ অভিনেতাও। শান্তিপুরে তিনি দানলীলাভিনয়ের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মন্মথমোহনই লিখেছেন: "এই অভিনয়ে তিনি স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকার, অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের, নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ির, শ্রীবাসাদি কতিপয় সখীর, কমলাকান্তাদি কতিপয় সখার, গৌরীদাস সুবলের এবং

নরহরি মধুমঙ্গলের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভাগীরথীতীরে অভিনয় হয়। সখীরা প্রকৃত গাভী লইয়া চরাইতে যান। নদীর ধারে একটি কদম্ব বৃক্ষ ছিল, সেটিকেও অভিনয়কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। দধিদুগ্ধ লুণ্ঠনাদি ব্যাপারও ঠিকমত দেখান হইয়াছিল। অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব অভিনয় করিতে করিতে এরূপ ভাবোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অচেতন হইয়া জলে পড়িয়া যান এবং কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিবার পর তাঁহাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসে।" বাংলার সেই প্রাচীন অবৈতনিক অভিনয়-পদ্ধতি আধুনিক য়ুরোপের বৈতনিক রঙ্গালয়েও নতুন ক'রে গৃহীত হয়েছে।

আপনারা সকলেই জানেন, এদেশে ফুটবল ও হকি খেলার খেলোয়াড়রা সৌখীন ব'লে বিখ্যাত। কারণ পেশাদার হ'লে নাকি খেলোয়াড়দের আভিজাত্য নষ্ট হয়! এবং আপনারা সকলেই এ কথাও জানেন যে, ঐ খেলোয়াড়দের অনেকেরই সৌখীনতার মুখোস কেবল লোক-দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ তলে তলে সব চলে এবং ফুটবল ও হকির বহু খেলোয়াড়ের খেলাই হচ্ছে প্রধান পেশা। বিলাতে এমন "ঢাক ঢাক গুড় গুড়" ব্যাপার দেখা যায় না, ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার তাবৎ খেলোয়াড় সেখানে প্রকাশ্যেই পেশাদার ব'লে পরিচিত হ'তে পারে। কিন্তু এমনই মানুষের দুর্ব্বলতা যে, সে দেশের লোকরাও পেশাদার খেলোয়াড়দের মুখে আদর করলেও মনে মনে খুব উঁচু নজরে দেখে না। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই এ সত্য প্রমাণিত হবে। আজও বিলাতে ফি বছরে একটি বাৎসরিক ক্রিকেট খেলার অনুষ্ঠান হয়, তার এক দলে থাকেন সৌখীনরা ও আর এক দলে পেশাদাররা এবং সেই প্রতিযোগীদের যথাক্রমে নাম দেওয়া হয় "ভদ্রলোকগণ" ও "খেলোয়াড়গণ"। অর্থাৎ পেশাদারদের সেখানেও কেউ ভদ্রলোক ব'লে স্বীকার করতেই প্রস্তুত নন!

অনেকেই ভাবছেন বোধ হয়, নাট্যজগতে ফুটবল ও ক্রিকেট প্রভৃতি খেলোয়াড়দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা এবং ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হচ্ছে একইরকম বেমক্কা ব্যাপার। আসলে আমার উদ্দেশ্য কিন্তু আলাদা। আমি বলতে চাই, বাংলা নাট্যজগতের প্রথম যুগে যে সব অভিনেতা সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করতেন, তাঁদের অনেকেরই সখ ছিল পেশারই নামান্তর—একালের এক শ্রেণীর বাঙালী ফুটবল-হকির খেলোয়াড়ের মত। লেবেডেফের রঙ্গালয় তো "সৌখীনতা"র কোন ছদ্মবেশই পরে নি, সুতরাং ঐ রঙ্গালয়ের নট-নটীদের পুরোপুরি পেশাদার ব'লে ধ'রে নিলেও অন্যায় হবে না। নবীনচন্দ্রের সম্প্রদায়ের অভিনেত্রীরা বৈতনিক হ'লেও অভিনেতাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলবার উপায় নেই। কিন্তু তারপরে এমন বহু সৌখীন সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল,

যাদের শিল্পীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোকই ছিল—বৈতনিক এবং অবৈতনিক। বিশেষতঃ নারী-ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে তখন যে সব বালক সংগ্রহ করা হ'ত, তাদের অধিকাংশেরই পেশা ছিল অভিনয়। এই রীতি সেদিন পর্য্যন্ত অনুসৃত হ'তে দেখেছি। অনেক সৌখীন সম্প্রদায়েরই অধিকারী কেবল সখের খাতিরেই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করতেন বটে, কিন্তু নারী-ভূমিকার জন্যে পালন করতেন কতকগুলি বালককে। আমাদের যৌবনকালে কোন কোন বালক উচ্চশ্রেণীর "অভিনেত্রী" ব'লে দস্তরমত খ্যাতিলাভ করেছিল। আজও মফঃস্বলে এই শ্রেণীর "অভিনেত্রী"র অস্তিত্ব আছে শুনলে বিস্মিত হব না।

একটা উল্লেখযোগ্য কথা। কলকাতায় যখন ইংরেজী থিয়েটারেও নারী-ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতার আবির্ভাব ছিল সাধারণ ব্যাপার, লেবেডেফের বাংলা রঙ্গালয়ে তখনই নারী-শিল্পী গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই নূতনত্ব তখন যে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষে অসহনীয় হয়েছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু কিঞ্চিদধিক তিন যুগ পরে নবীনচন্দ্র যখন প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয়ের সময়ে সৌখীন থিয়েটারে আবার নারী-শিল্পী গ্রহণ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে প্রতিবাদী হয় ইংরেজের "ইংলিশম্যান" পত্রিকাই—যদিও উস্‌কানী দিয়েছিলেন কোন দেশীয় পত্রলেখকই। থিয়েটারে পতিতাদের আবির্ভাবের স্বপক্ষে ছিলেন অনেকেই এবং তার বিরুদ্ধেও যে জনমত ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছিল, এটুকু আমরা অনায়াসে অনুমান করতে পারি। কারণ তারপরে দেশে সৌখীন সম্প্রদায়ের প্রভাব অত্যন্ত বেড়ে উঠলেও আর কেহই রঙ্গালয়ে পতিতাদের আহ্বান করতে সাহসী হন নি। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্রেই প্রকাশ: "এক্ষণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে।" কিন্তু সে-সব ভেকছত্রের তলায় কোন পতিতা শিল্পীরই স্থান সঙ্কুলান হ'ত না।

প্রসঙ্গসূত্রের মাঝখানে একটু ছেদ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক্। জনমতের গতি দেখে সৌখীন নাট্যানুষ্ঠাতারা আপন আপন সম্প্রদায়ে পতিতা শিল্পীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন বটে, কিন্তু দেশে তখনও এমন বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা সহ্য করতে পারতেন না স্ত্রীলোকের ভূমিকায় পুরুষের অস্বাভাবিক আবির্ভাব। সকলেই জানেন চিরবিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন জিদ ধরাতে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতারা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে সর্ব্বপ্রথম আবার নারী-শিল্পী গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু তার অনেক আগেই স্ত্রীলোকের ভূমিকায় পুরুষের ন্যাকামি দেখে দেখে আরো অনেকেই এই প্রথার উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এবং এঁদেরই মুখপাত্র হয়ে জনৈক

নাট্যরসিক ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকায় মেট্রোপলিটান থিয়েটার নামে সৌখীন সম্প্রদায়ে "বিধবা বিবাহ" নাটকের অভিনয় দেখে প্রস্তাব করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে ঐ নাটকের নারী-ভূমিকার জন্যে যেন নারীদেরই গ্রহণ করা হয়। তখনকার সৌখীন সম্প্রদায়ের অধিকারীরা সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করতে সাহসী হন নি—তাঁরা নিরাপদ হ'তে চেয়েছিলেন গড্ডলিকা প্রবাহ অনুসরণ ক'রেই। প্রায় এক যুগ পরে স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন উদ্যোগী না হ'লে এ দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের মালিকরাও তখনকার দিনে অচল ঐতিহ্যকে ত্যাগ ক'রে নূতন অবদান স্থাপন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

তবু নারী-শিল্পীদের বিরুদ্ধবাদীরা সহজে হার মানতে রাজী হন নি। তারও চৌদ্দ-পনেরো বৎসর পরে যখন সহরের প্রত্যেক সাধারণ রঙ্গালয়ে নারী-ভূমিকায় দেখা দিচ্ছেন নারীরাই, তখনও যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ছিলেন ঐ নির্ব্বোধ রুচিবাগীশের দল। তাঁদের যুক্তি ছিল, পতিতাদের ছোঁয়াচ লাগলে পুরুষদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি হবে। সাধারণতঃ রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসেন সাবালক পুরুষরাই—যখন তাঁরা অধঃপতন থেকে আত্মরক্ষা করবার মত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। কিন্তু থিয়েটারের আখড়ায় নাবালকদের গ্রহণ করলে তাদের পরকাল যে ঝরঝরে হয়ে যেতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কেউ দরকার মনে করেন নি। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বলেছেন: "ছেলেদের দ্বারা নারী-ভূমিকায় অভিনয় করালে কতকগুলো এঁচোড়ে-পাকা বয়াটের সৃষ্টি করা হবে।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রুচিবাগীশের দল নাছোড়বান্দা। নিরীহ কবি-মানুষ রাজকৃষ্ণ রায়। দুনিয়াদারির ধার ধারবার কথা তাঁর নয়। সকলে তাঁর কাণে মন্ত্র দিলেন, 'সাধারণ রঙ্গালয় পতিতাদের জন্যে সজ্জনদের কাছে পরিত্যক্ত হয়েছে। আপনি যদি এমন থিয়েটার খুলতে পারেন, যেখানে মেয়ে সাজবে বালকরাই, তা'হলে দর্শকদের আসনে তিলধারণের ঠাঁই থাকবে না।' তাদের কুপরামর্শে ভুলে কবি সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মেছুয়াবাজার (এখন কেশব সেন) ষ্ট্রীটে নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থে "বীণা থিয়েটার" (এখন সেখানে সিনেমা দেখানো হয়) নামে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। নারী-ভূমিকায় দেখা দিতে লাগল বালকেরাই। বিনামূল্যে লোকে নারীবেশধারী পুরুষদের অভিনয় কোনরকমে সহ্য করে, কিন্তু ট্যাঁকের টাকা ফেলে এরকম কৃত্রিম অভিনয় দেখবার দর্শক বেশী হ'ল না। দুঃসময়ে পরামর্শদাতারা চম্পট দিলেন, কবির স্বপ্ন ছুটে গেল, দেনার দায়ে তিনি হলেন সর্ব্বস্বান্ত। এর আগে গিরীশ-অর্দ্ধেন্দু পর্য্যন্ত পেশাদার-রঙ্গালয়ে ঐ চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যদিও আমাদের অধিকাংশ সৌখীন সম্প্রদায় কেবল পেশাদার নয় ব'লেই সাবেক চাল আজ পর্য্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছে।

যাত্রা-পাঁচালির আসরে থিয়েটারি অভিনয় দেখতে দেখতে জ'মে উঠল রীতিমত। ভারতবর্ষের আরও নানা প্রদেশে বড় বড় সহরে যেখানে ইংরেজদের সংখ্যাধিক্য হয়েছে, সেখানেই দেখা গিয়েছে সৌখীন বা পেশাদার বিলাতী থিয়েটারের অভিনয়। মোগল রাজশক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়লেও যখন তার প্রভাব বিলুপ্ত হয় নি, তখনও ভারতের নানা প্রদেশে য়ুরোপীয়রা সৌখীন অভিনয়ের আয়োজন করতেন। কিছুকাল আগে আমি সাময়িক পত্রিকায় ঐ শ্রেণীর একটি প্রাচীন অভিনয়ের চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রদান করেছি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাঙালীর মত সমান সুযোগ পেলেও অবাঙালীরা যে বিলাতী থিয়েটারের দ্বারা উচিতমত প্রভাবান্বিত হয়েছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের যুগে অবাঙালীর মধ্যেও যে মঞ্চকলার চর্চ্চা ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু তখনকার নাট্যকাররা অক্ষয় যশ অর্জ্জন করলেও তখনকার অভিনেতাদের শক্তির নিরিখ ছিল কতখানি, আজ আর তা জানবার কোন উপায়ই নেই—এমন কি একজন মাত্র প্রখ্যাত অভিনেতার নাম পর্য্যন্ত আমরা জানি না। সেকালেও রাজা-রাজড়ারা ও ধনী ব্যক্তিরা যে সৌখীন নাট্যাভিনয়ে নিযুক্ত হ'তেন, সংস্কৃত সাহিত্যে তার একাধিক নজির আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন নিজেই ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার ও সৌখীন মঞ্চশিল্পী। সেকালে পেশাদার অভিনেতা (এমন কি অভিনেত্রীও) এবং তাদের জন্যে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চও ছিল, উপরন্তু প্রাচীন কালের নাট্যশাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার দেখলে বোঝা যায়, সেকালে অবাঙালীরাও ছিলেন বিশেষরূপে অভিনয়কলাবিশারদ।

তারপর লুপ্ত হ'ল আর্য্যাবর্ত্তের স্বাধীনতা, আবির্ভূত হ'ল মুসলমান বিজেতারা। বিশেষজ্ঞের চোখে পড়ে একটা ব্যাপার। কোরাণ ও কৃপাণ হাতে ক'রে মুসলমানরা যে দেশেই গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে, সেখানেই হয়েছে নাট্যকলার অধঃপতন। তাই হ'ল ভারতবর্ষেও। "The Indian stage declined when the Mohammedans rode ruthlessly through that beautiful land in a series of invasions.' (A History of the Theatre : By George Freedly and John A. Reeves : P. 176.) মঞ্চাভিনয়ের প্রথা উঠে গেল ক্রমে ক্রমে। কিন্তু নাট্যকলা সম্পর্কীয় কোন না কোন অনুষ্ঠান না নিয়ে মানুষ থাকতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশের বাইরেও যে আমাদের যাত্রা-পাঁচালির অনুরূপ পালাগানের আসর বসত, এটুকু সহজেই অনুমান করা যায় এবং আজ পর্য্যন্ত অবাঙালীদের মধ্যে ঐ শ্রেণীর নাট্যানুষ্ঠানের প্রচলন আছে।

কিন্তু তারপর বিশেষরূপে উল্লেখ্য আর কোন কথাই বলবার উপায় নেই।

আমাদের মত অবাঙালীরাও এ দেশে ব'সেই পাশ্চাত্য থিয়েটার দর্শন করেছে এবং কোথাও কোথাও তার অনুকরণেরও চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! সে নিম্নশ্রেণীর অনুকরণের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র রসবোধ ও সৃষ্টিক্ষমতা—সাত নকলে হ'ত আসল খাস্তা। বাংলাদেশে যখন চলছে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগ, তখন বোম্বাই সহরের পারসী অভিনেতারা নাকি অত্যন্ত নামজাদা হয়ে উঠেছিলেন—অন্ততঃ এ খবর পাওয়া যায় কলকাতার ইংরেজ কাগজওয়ালার মুখে। তখনকার ঐ সব অভিনয় স্বচক্ষে দেখবার মত বয়স আমার হয় নি, কিন্তু তার ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর পরে, আজ থেকে অর্দ্ধশতাব্দী আগে কলকাতায় পারসী থিয়েটারে বোম্বাই থেকে আগত একটি অতি বিখ্যাত নাট্য-সম্প্রদায়ের যে অভিনয় আমি দেখেছি, আজও আমার কাছে তা হয়ে আছে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত। বাংলা রঙ্গালয়ে তখন আমি গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল বসু প্রভৃতির অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত, উক্ত সম্প্রদায়ের কেউ তাঁদের ছায়ার কাছেও দাঁড়াতে পারতেন না। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে সব নামগোত্রহীন সৌখীন নাটুকে দল ছিল, তাদের মধ্যেও অনেকে তথাকথিত সম্প্রদায়ের শিল্পীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারত। প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর আগে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে দিল্লীবাসীদেরও যে অভিনয় আমি দেখেছিলুম, তাও একসঙ্গে ভয়াবহ ও কৌতুকাবহ। বাংলার বাইরে ভারতীয় নাট্যজগতের অবস্থা এখনো কিছুমাত্র উন্নত হ'তে তো পারেই নি, বরং অবনত হয়েছে বললেই চলে। অবাঙালীরাও ইংরেজদের দেখাদেখি অল্পবিস্তর পরিমাণে থিয়েটারি নেশায় মেতেছেন বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁদের ভিতর থেকে গিরিশচন্দ্র বা অর্দ্ধেন্দুশেখর বা শিশির ভাদুড়ির মত একজনমাত্র অভিনেতাও আত্মপ্রকাশ করেন নি।

ভারতের মধ্যে কেবল বাঙালীরাই বিলাতী থিয়েটারের আদর্শকে নিজের মত ক'রে নিয়ে গ'ড়ে তুলতে পেরেছে। বাংলাদেশে এমন নটনটীও দেখা দিয়েছেন, যাঁরা অনায়াসে বিলাতে গিয়েও প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ব'লে গণ্য হ'তে পারেন। কেবল নটনটী নয়, বাঙালী নাট্যকারদেরও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারেন, বাংলার বাইরে ভারতে এমন লেখক খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের বয়স একশত বৎসর পূর্ণ হ'তে এখনো কিছুকাল বাকি, কিন্তু এর মধ্যেই সেখানে বাঙালীর প্রতিভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিয়েছে।

এই উন্নতির মূলে আছে বাংলাদেশের গত শতাব্দীর সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলি। আজ সখের থিয়েটারের নাম শুনলে আমাদের মনে বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব জাগে না বটে, কিন্তু আমাদের পেশাদার রঙ্গালয়ের বীজ রোপিত হয়েছে আমাদের অবৈতনিক নাট্য-

প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই। আর এইটেই হচ্ছে স্বাভাবিক। দেখা যায়, মানুষের—বিশেষতঃ শিল্পীর—জীবনে সখই অবশেষে হয়ে দাঁড়ায় পেশা। এ দেশের মত বিলাতেও আগে সৌখীন ধনী ও খেতাবী ব্যক্তিগণ নাটুকে দল পালন করতেন। এই শ্রেণীর দলের জনৈক অভিনেতা (জেমস বার্ব্বেজ) ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে সর্ব্বপ্রথমে "দি থিয়েটার" নামে একটি পেশাদার রঙ্গালয় স্থাপন করেন। আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত রঙ্গালয় হচ্ছে রুশিয়ার "মস্কো আর্ট থিয়েটার"। তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অভিনেতা কনষ্টানটিন ষ্টানিস্লাভ্স্কি সহ-নটনটীদের নিয়ে আগে সৌখীন প্রতিষ্ঠানেই নাট্যানুশীলন করতেন। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায়।

কলকাতা সহরে প্রথম প্রথম যখন সৌখীন মঞ্চাভিনয় সুরু হয়, তখন দেশের লোক তাকে যাত্রারই রূপান্তর ব'লে গ্রহণ ক'রেছিল। তখনকার "সংবাদ প্রভাকরে" দেখি, থিয়েটারকে বলা হয়েছে "বিলাতী যাত্রা"। আর সত্যকথা বলতে কি, আধুনিক যাত্রার মধ্যে দেখা যায় যেমন থিয়েটারের ছাপ, তখনকার সৌখীন থিয়েটারের উপরেও ছিল তেমনি দেশী যাত্রার প্রভাব। এমন কি আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ও বেশ কিছুকাল পর্য্যন্ত যাত্রার অল্পবিস্তর প্রভাব বর্জন করতে পারে নি। এদেশে সৌখীন রঙ্গালয়ের যুগ হচ্ছে ১৮৩১ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। প্রধানতঃ এই বিয়াল্লিশ বৎসর কাল ধ'রে চলেছিল বাংলাদেশের সৌখীন শিল্পীদের অবিচ্ছিন্ন নাট্যসাধনা।

১৮৩১ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাঙালী নাট্যরসিকরা কেবল সৌখীন রঙ্গালয়েই অভিনয় দেখবার সুযোগ লাভ করতেন। সুদীর্ঘ এই বিয়াল্লিশ বৎসর কাল ধ'রে বিভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায় নাট্যশালার পাদপ্রদীপের যে শিখাগুলি অদম্য উৎসাহে জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার আলো সম্বল ক'রেই আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় সর্ব্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং অবশেষে অবৈতনিক শিল্পীরাই পরিচিত হন বৈতনিক অভিনেতারূপে।

*

সখের যুগে যে কয়টি রঙ্গালয় "ল্যাণ্ডমার্ক" বা ক্ষেত্রসীমাচিহ্নের মত এদেশে বিখ্যাত হয়ে আছে তাদের নাম হচ্ছে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু রঙ্গালয় এবং নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার রঙ্গালয়; আশুতোষ দেবের বাড়ীর রঙ্গালয়; কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গালয়, পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া রঙ্গালয়; পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গালয়; শোভাবাজার রাজবাড়ীর রঙ্গালয়; জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গালয়; বহুবাজারের বলদেব ধর ও চুনীলাল বসুর রঙ্গালয় এবং বাগবাজারের গিরীশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির রঙ্গালয়।

আমাদের নাট্যশালার ইতিহাসে ঐ দশটি রঙ্গালয়ের নাম শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে বটে, কিন্তু বাঙালীর নাট্যানুরাগের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে আরো বহু সৌখীন সম্প্রদায়ের নাম করতে হয় এবং অনেক সম্প্রদায়ের নাম পর্য্যন্ত আজ আর জানবার উপায় নেই। পূর্ব্বোক্ত বিয়াল্লিশ বৎসর ধ'রে বাংলা দেশের সহরে ও মফঃস্বলে নাট্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে অসংখ্য সম্প্রদায়। পুরাতন সংবাদপত্রের সাহায্যে তাদের অনেকের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মূল্যবান "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" গ্রন্থে তা নিপুণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। যাঁরা ভালো ক'রে সব কথা জানতে চান, তাঁরা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করলে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু এবং আরো কারুকে কারুকে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ঐ প্রসঙ্গে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। কিন্তু তাঁরা যে কেবল তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎকালে প্রচলিত অবৈতনিক সম্প্রদায়গুলির কাছ থেকে প্রেরণা লাভই ক'রেছিলেন, তা নয়; উপরন্তু নাট্যকলা সম্পর্কীয় যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্যেও পূর্ব্ববর্ত্তী সৌখীন শিল্পীদের কাছে তাঁদের ঋণের মাত্রা বড় অল্প হবে না। ঐ সকল শক্তিশালী অবৈতনিক সম্প্রদায় বিলাতী আদর্শে নাট্য-সাধনায় নিযুক্ত না হ'লে এদেশে গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতির আবির্ভাব সম্ভবপর হ'ত কি না সন্দেহের বিষয়; বড় জোর, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলা দেশও মঞ্চাভিনয়ের নামে ছেলেখেলা নিয়েই মেতে থাকত।

একটা ব্যাপার পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গিয়েছে। যাঁরা প্রথম থেকেই নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা বিশেষরূপে কবি ও সাহিত্যিক (কিন্তু পরে হয়েছেন নাট্যকারও), তাঁদের অনেকেরই থাকে রঙ্গমঞ্চের দিকে স্বাভাবিক প্রাণের টান। এক্ষেত্রে নাট্যকলাভক্ত পাশ্চাত্য কবি ও সাহিত্যিকদের নাম করতে গেলে জায়গায় কুলিয়ে উঠতে পারব না। বাংলাদেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে সৌখীন মঞ্চাভিনয়ের প্রথম যুগ থেকেই নাট্যকলার দিকে রীতিমত আকৃষ্ট হয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বর গুপ্ত, মনোমোহন বসু, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশিরকুমার ঘোষ এবং পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

গোড়ার দিকে অবৈতনিক নাট্যসমাজে যাঁরা নাট্যকার রূপে সমধিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন

দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বসু। এঁরা সকলেই লেখনীধারণ করেছিলেন নারী-বর্জ্জিত রঙ্গালয়ের জন্যে। আমার কথা বলা বাহুল্য, এখনকার অতি-বৃদ্ধ লেখকরাও সে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না। কিন্তু তখনকার নাট্য-জগতের পঞ্চদিকপালদের মধ্যে অন্যতম মনোমোহন বসু দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন, তিনি পরলোকগমন করেন ১৩১০ সালে। তাই একমাত্র তাঁর সঙ্গেই আমি প্রথম যৌবনে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলুম। সেই সাক্ষাৎকারের কাহিনী সেই সময়ে "ভারতী" পত্রিকায় (প্রসাদ রায় ছদ্মনামে) আমার "বঙ্কিম যুগের কথা" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাচীন নাট্যকার অবৈতনিক নাট্যজগতের লোক হয়েও আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম বাৎসরিক উৎসবসভার সভাপতিরূপে অতিশয় আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রঙ্গালয়ের সঙ্গে পতিতার সম্পর্ক তাঁর পক্ষে ছিল যার-পর-নাই অসহনীয়। ঐ সম্পর্কে তিনি আমার কাছে যা ব'লেছিলেন, তার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই: "বিদ্যাসাগর মহাশয় পাবলিক থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হ'তে চেয়েও তার সঙ্গে পতিতাদের সম্পর্ক স্থাপিত হবে শুনে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐ কারণে পাবলিক থিয়েটারের জন্যে আমি নূতন কোন নাটক লিখিনি। আমি নারী নিয়ে অভিনয়ের বিরোধী নই। কিন্তু হিন্দুদের কুলকন্যারা যে নটী হয়ে রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করবেন, এ কথা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি না। সেই জন্যেই আমি নারীর পার্টে পুরুষকেই দেখতে চাই। জানি তার ফলে অভিনয় স্বাভাবিক হয় না, কিন্তু থিয়েটারে স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে গিয়ে সমাজের সর্ব্বনাশ করতে যাব কেন?" প্রভৃতি।

বলেছি, কেবল পুরুষ নিয়ে অভিনয় করতে গিয়ে কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে ফতুর হ'তে হয়েছিল। মাইকেলের প্রস্তাবে নারীদের গ্রহণ ক'রে (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে) বেঙ্গল থিয়েটার আসর জমিয়ে তোলে। কিন্তু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নারীবর্জ্জিত ছিল ব'লে তার পরিচালকরাও (গিরীশ, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃতলাল প্রভৃতি) অবশেষে (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) পতিতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হন। মনোমোহনের জীবনকালেই ঘটেছিল এ-সব ঘটনা; কিন্তু তবু তাঁর মত পরিবর্ত্তিত হয়নি। বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরেও তিনি কয়েকখানি নাটক লিখেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি বোধ হয় সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের জন্যে লিখিত হয়েছিল; কারণ সাধারণ রঙ্গালয়ে তাদের (একখানি নাটক ছাড়া) অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। মনোমোহন বসু বোধ করি এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি যে, অধিকাংশ দর্শকই বিনা পয়সায় অভিনয় দেখবার সুযোগ পায় ব'লেই সৌখীন শিল্পীদের আসরে হাজিরা দিতে আপত্তি করে না। কিন্তু টাকার

দাবি থাকলে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ নাট্যকারও গোঁফকামানো পুরুষ দেখিয়ে উচিতমত দর্শক আকর্ষণ করতে পারতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে যথেষ্ট।

বার্ণার্ড স তাঁর "The Three Unpleasant Plays"-এর ভূমিকায় বলেছেন: "আজকাল নিজের ভিতরকার তাগিদে নাটক রচিত হয় না, রচিত হয় রঙ্গালয়ের তাগিদে। যা-কিছু মুস্কিল ঐখানেই।"

কিন্তু কেবলই কি আজকাল? অতি প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দি, ইংলণ্ডের তথা পৃথিবীর নাট্যসাহিত্য যখন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, সেই এলিজাবেথীয় যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? তখনকার প্রবীণ নাট্যকার সেক্সপিয়ার লেখনী ধারণ ক'রেই নাট্যজগতে প্রবেশ করেন নি। রঙ্গালয়ের দিকে তাঁর স্বাভাবিক মনের ঝোঁক ছিল ব'লে সর্ব্বপ্রথমে তিনি নাট্যকলার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলেন। তারপর রঙ্গমঞ্চের ভিতরে সামান্য একটি চাকরি গ্রহণ করেন। তারপর ক্রমেই তাঁর পদোন্নতি হয়। প্রথমে তিনি হন মঞ্চাধ্যক্ষ এবং তারপর অভিনেতা। অবশেষে রঙ্গালয়ের তাগিদেই তিনি নাট্যকাররূপে দেখা দেন।

আমাদের গিরীশচন্দ্র কি করেছিলেন? প্রথমে তিনি যথাক্রমে হন সৌখীন ও পেশাদার অভিনেতা। তাঁর লিপিকুশলতা ছিল কিন্তু তিনি ঈশ্বর গুপ্ত ও রামনিধি গুপ্তের অনুকরণে লিখতেন কেবল কবিতা ও গান। মাঝে মাঝে চলতি উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করতেন। এইভাবে যৌবনকাল কাটিয়ে তিনি পদার্পণ করেন প্রৌঢ়ত্বের সীমায়। তারপরের কথা তাঁর নিজের মুখেই শ্রবণ করুন: "আমার dramatist হবার কোনও কালে ambition ছিল না। * * * যখন মাইকেল, বঙ্কিম প্রায় dramatised করা শেষ হ'ল, ষ্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিলল না, তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হ'ল।" গিরীশচন্দ্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম নাটক "রাবণ-বধ" রচনা করেন।

কিন্তু এ-সব হচ্ছে তো পেশাদার রঙ্গালয়ের কথা। বাংলা নাট্যজগতের গোড়াপত্তন হয় সৌখীন রঙ্গালয়েই। সেই সময়ে দু-একখানি নাটক বা নাটিকা রচনার খবর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি একেবারে উল্লেখযোগ্য নয়। শক্তিশালী বাঙালী লেখকরা নাট্যশালার দিকে আকৃষ্ট হন এদেশে সৌখীন অভিনয়ের রেওয়াজ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁরা নিজেরাই যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এমন কথাও বলা চলে না। সৌখীনরা যখন অভিনয় নিয়ে মেতে উঠতে চাইলেন তখন দেখা গেল, বাংলা ভাষায় মঞ্চাভিনয়ের উপযোগী নাটক নেই বললেও চলে। কোন কোন সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠানের রচনানিপুণ

পরিচালক (যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহ ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি) রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটাবার জন্যে নিজেরাই কলম ধ'রে বসলেন। যাঁরা নিজেরা রচনাবিশারদ নন, তাঁরা নাট্যজগতে আমন্ত্রণ করলেন কবি ও অন্যান্য লেখকদের। মাইকেল মধুসূদন, মনোমোহন ও রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি এমনি আমন্ত্রণের ফলেই নাট্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন। তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নতুন বাংলার প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তও আমন্ত্রণ পেয়ে "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামে একখানি নাটক লিখে দেন। কিন্তু কবি হ'লেই নাটক রচনা করা যায় না। কবির কাজ ও নাট্যকারের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। যুরোপের বহু প্রথম শ্রেণীর কবির নাটকরচনা হয়েছে পণ্ডশ্রম মাত্র। এদেশেও প্রথম যুগে নাটক রচনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত ও "মহিলা" কাব্য প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একালের নাটক এবং অন্যান্য অধিকাংশ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় লেখকের মত সেকালের বাংলাদেশের লেখকরাও নাটক রচনা করতেন রঙ্গালয়ের তাগিদেই। অধিকাংশ স্থলে কেবল রঙ্গালয়ের মৌখিক তাগিদে নয়, তখনকার বাঙালী লেখকরা নাট্যশালার দিকে আকৃষ্ট হ'তেন আর এক কারণে। সেটা হচ্ছে পুরস্কার বা পারিশ্রমিকের লোভ। তখনকার সৌখীন নাট্যশালার কর্ত্তারা পুরস্কার ঘোষণা বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা না করলে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি নাটক রচনার জন্যে উৎসাহিত হ'তেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আজকের বাংলাদেশেও চারিদিকে সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি থাকলেও নাট্যকারদের পারিশ্রমিকের কথা নিয়ে কেউ এখানে মাথা ঘামায় না। সেকালের এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-গুলি মৌলিক নাটকের অভাব অনুভব করত না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রঙ্গালয় থেকে নূতন নূতন নাটকের জন্যে একাধিক বার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার ফলে পাওয়া গিয়েছিল একাধিক নূতন নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্ন নিজের মুখেই স্বীকার ক'রে গিয়েছেন যে, তিনি তাঁর "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব", "রত্নাবলী", "নবনাটক", "মালতীমাধব", "সুনীতিসন্তাপ" ও "রুক্মিণীহরণ" নাটকের জন্যে যথাক্রমে একশত, দুইশত, দুইশত, একশত, দুইশত ও পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক লাভ করেছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, সে যুগে টাকার মূল্য এখনকার চেয়ে অনেক গুণ বেশী ছিল। পাইকপাড়ার রাজাদের কাছে চার বার পুরস্কৃত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

একথা স্বীকার্য্য যে, সাধারণতঃ তখনকার সৌখীন নাট্যশালাগুলির পরিচালক বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণই। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, ক্রমাগত ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার জন্যে আধুনিক লেখকদের উৎসাহ না হওয়াই

স্বাভাবিক। প্রধানতঃ এই কারণেই নূতন নাটকের অভাবে এখনকার সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলি অভিনেয় নাটকের জন্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের ভাণ্ডারে ঢুকে পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব'লেই তাও সম্ভবপর হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশের কথা স্বতন্ত্র। সেখানকার নাট্যকাররা আপন আপন নাটকের অভিনয়-স্বত্ব সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন। নাট্য-সম্প্রদায় সৌখীন হ'লেও তাঁরা তাকে রেহাই দেন না, প্রত্যেক অভিনয়ের জন্যে কিঞ্চিৎ মূল্য আদায় না ক'রে ছাড়েন না। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া উচিত ব'লে মনে করি।

বাংলা নাট্যজগতে সৌখীনদের আসরে প্রথম যুগে যে সব বিখ্যাত জ্ঞানী, গুণী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ম্মী ও রসগ্রাহী রূপে সাগ্রহে যোগদান করেছিলেন, এখানে তাঁদের নামের দীর্ঘ ফর্দ্দ দাখিল না করলেও চলবে। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁদের অধিকাংশেরই নাম ও কার্য্য বাংলাদেশের নানা বিভাগে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যাঁদের প্রতিভা নিয়ে আজ আমরা বাঙালী ব'লে গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করি, সেকালের সৌখীন নাট্যচর্চ্চার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর আর্ট না থাকলে নিশ্চয়ই তাঁরা তার দিকে আকৃষ্ট হতেন না। তাঁরা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ললিতকলার ভক্ত; কলকাতায় তখন নিয়মিতভাবে যে সব বিলাতী অভিনয়ের অনুষ্ঠান হ'ত তাঁরা ছিলেন তাদের সঙ্গে রীতিমত সুপরিচিত; তবু যে সৌখীন বাঙালী নটরা সকলের কাছে সাদর অভিনন্দন লাভ করতেন, এইটেই হচ্ছে তাঁদের নাট্যনিপুণতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সুতরাং বাংলা দেশের পেশাদার রঙ্গালয়ে পরে যে তাঁদেরই আদর্শ গৃহীত হবে, এটা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়। এবং এ কথা ভুললেও চলবে না যে, বাংলাদেশে পরে যাঁদের নিয়ে প্রথম পেশাদার রঙ্গালয় গঠিত হয়েছিল, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন আগে সৌখীন নাট্যশিল্পী।

কিন্তু আগেই বলেছি, পরে এ ধারা বদলে যায়। পেশাদার রঙ্গালয় ক্রমে ক্রমে অধিকতর লোকপ্রিয় হয়ে উঠলেও এদেশে সৌখীন নাট্যানুশীলনের উৎসাহ একটুও দুর্ব্বল হয়ে পড়েনি, বরং ধীরে ধীরে তা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল ব'লেই মনে হয়। জ্ঞানোদয়ের পর থেকেই (সে আজ প্রায় ষাট বৎসর আগের কথা) দেখছি, সহরের প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ের আসর অত্যন্ত সরগরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাট্য-কলার চর্চ্চা প্রায় সার্ব্বত্রিক হয়ে উঠলেও আমাদের গৌরব করবার কিছুই নেই; এর দ্বারা বড় জোর কেবল বাঙালীর নাট্যানুরাগই প্রমাণিত হ'তে পারে। কারণ ক্রমে আসে ধারে নয়, ভারে কাটবার যুগ। পালে-পার্ব্বণে, সময়ে বা অসময়ে দিকে দিকে জ্বলত বটে পাদপ্রদীপের আলো, কিন্তু তার শিখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত যে সব মুখ তাদের

কারুকে দেখেই স্মরণ হ'ত না পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সৌখীন, ধুরন্ধর শিল্পীদের কথা। স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর এবং সজ্জন ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে নাট্যানুষ্ঠানে যোগ দিতেন বটে, কিন্তু সে ছিল কেবল তাঁদের সাময়িক সখের খেলা মাত্র, তার মধ্যে ছিল না কোন ঐকান্তিক আগ্রহ, ছিল না কোন মহত্তর লক্ষ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতিপয় অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত এবং বেকার ও বকাটে যুবক সখের থিয়েটার নিয়ে মেতে উঠত। (এবং আজও তাদের দল হাল্কা হয়ে পড়ে নি)। কাজ না পেলে যারা খুড়োর গঙ্গাযাত্রার আয়োজনেও নিযুক্ত হ'তে চায়, তারাই যদি গায়ের জোরে নাট্যলক্ষ্মীকে কবলগত করবার চেষ্টা করে, তাহ'লে অবস্থাটা কি রকম ভয়াবহ বা নৈরাশ্যজনক হয়ে ওঠে, সকলেই তা অনুমান করতে পারবেন।

আমার গুরুজনরা ছিলেন অতিশয় নাট্যপ্রিয়। সেইজন্যে শৈশব থেকেই আমি পেয়েছি নাট্যাভিনয় দর্শনের সুযোগ। পঞ্চান্ন বৎসর আগেও আমি কেবল পেশাদার রঙ্গালয়ে নয়, সৌখীন নাট্যশালাতেও যে সব নাটকের অভিনয় দেখেছিলুম, তার কয়েকটির নাম আজও আমার মনে আছে। সেগুলি হচ্ছে: প্রমোদরঞ্জন, আলিবাবা, জুলিয়া, বভ্রুবাহন, বিল্বমঙ্গল, জনা, বিষবৃক্ষ, সংসার, বিবাহ-বিভ্রাট, বাবু, হীরার ফুল, কৃপণের ধন, নাট্যবিকার, মৃণালিনী, প্রতাপাদিত্য, রাজসিংহ ও রাজা ও রাণী। পাঠকরা লক্ষ্য করলে দেখবেন, ঐ নাটকগুলির প্রত্যেকখানি অভিনীত হয়েছে আগে পেশাদার রঙ্গালয়ে। তখনকার সৌখীন সম্প্রদায়গুলি সাধারণতঃ নিজস্ব নূতন নাট্যকারের কথা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চাইত না, পালার জন্যে দ্বারস্থ হ'ত তারা সাধারণ রঙ্গালয়ের এবং বহু-অভিনীত পুরাতন ভূমিকাগুলির নূতন ধারণা দেবার মত মনীষাও ছিল না তখনকার সৌখীন অভিনেতাদের। পূর্ব্ববর্ত্তী পেশাদার শিল্পীরা যে ভাবে নাটক মঞ্চস্থ ক'রে তার অভিনয় দেখাতেন, সৌখীনদের দৃষ্টি একাগ্রভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকত কেবল সেইদিকেই। অর্থাৎ যাকে বলে একেবারে প্রাণহীন অনুকরণ, অনেকে আবার পেশাদারদের মুদ্রাদোষ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করতে পারতেন না। ফলে যাঁরা কোন নাটকের ও অভিনয়ের সঙ্গে আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিচিত হয়ে পরে সৌখীনদের আসরে গিয়ে হাজিরা দিতেন, তাঁরা পেতেন না আনন্দ লাভের কিছুমাত্র অবসর। সুতরাং আশী-নব্বই বৎসর আগেও যে সৌখীন নাট্যাভিনয় বাংলাদেশকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিল, মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই তার অধঃপতন হয়েছিল যৎপরোনাস্তি। কিন্তু মরুজগতেও নাকি ওয়েসিসের পুষ্পপল্লবের বাহার থাকে। ব্যতিক্রমও দেখেছি অর্দ্ধশতাব্দী আগেও।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বজীবনে রচনা করেছিলেন "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জ্জন" নাটক।

প্রথমোক্ত পালাটি পেশাদার রঙ্গালয়ে গৃহীত ও জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু ওখানকার কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা সত্বেও "বিসর্জ্জনে"র উপরে হস্তক্ষেপ করতে ভরসা পান নি কেবল এই কারণে যে, ওর মধ্যে কালিপ্রতিমা বিসর্জ্জনের যে দৃশ্য আছে, তা হিন্দুদের ধর্ম্মবোধকে আহত করতে পারে। প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর আগে কলকাতার পটুয়াটোলায় একটি সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে তার চমৎকার অভিনয় দেখেছিলুম, রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। অভিনেতারা ছিলেন ব্রাহ্ম, সুতরাং প্রতিমা বিসর্জ্জনের দৃশ্যে তাঁদের পক্ষে আপত্তিকর কিছুই ছিল না। তাঁরা কেবল সুশিক্ষিত ছিলেন না, পেশাদার রঙ্গালয়ের কোন অভিনয়ও তাঁরা হয়তো কখনো দেখেন নি। সুতরাং নূতন নাটক ও তার অভিনয়-ভঙ্গির মধ্যে কোথাও পড়েনি পেশাদার রঙ্গালয়ের এতটুকু ছাপ। রাজা, রঘুপতি, জয়সিংহ ও অপর্ণার ভূমিকার অভিনেতারা এত ভালো অভিনয় করেছিলেন যে, আজও আমার স্মৃতিপটে তা মলিন হয় নি। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে পরলোকগত বিখ্যাত অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছিল, এ কথা আমি জানি। বিনয়েন্দ্রনাথ ছিলেন পরের যুগে সুপ্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সৌখীন সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

সেই অভিনয় দেখে কোন কোন সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। প্রথমতঃ, সৌখীন অভিনেতারা যদি উচ্চশিক্ষিত ও রসজ্ঞ এবং পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তবে তাঁদের অভিনয়ও হয়ে ওঠে রীতিমত তাজা ও নব নব সৌন্দর্য্যের প্রকাশক। এক হিসাবে বলতে গেলে বলতে হয়, পেশাদারদের অভিনয় হচ্ছে সৌখীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনেকটা ফাঁদ বা লোভনীয় টোপের মত। সে টোপ গলাধঃকরণ করলে প্রভূত বিপদের সম্ভাবনা। এর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়। তাঁর মনীষা ছিল প্রবল। এদিক দিয়ে দানীবাবু তাঁর কাছে দাঁড়াতেই পারতেন না। কিন্তু উঠতি বয়সে নির্ম্মলেন্দু পড়েছিলেন দানীবাবুর প্রভাবে এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত এ প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'তে পারেননি।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা পেশাদার রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী না হয়ে একেবারে স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করেন, তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় নূতন ভঙ্গী, নূতন সুর, নূতন ভাবের লীলা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলাদেশে এই শ্রেণীর একমাত্র নাট্যকার। "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জ্জন" প্রভৃতি তাঁর পুরাতন পর্য্যায়ের নাটকগুলি আধুনিকতার দিক দিয়ে কতকটা রিক্ত বটে, কিন্তু রচনাভঙ্গী এবং ভাব, শব্দ ও কাব্য-সম্পদ প্রভৃতির দিক দিয়ে সে যুগের যে কোন থিয়েটারি নাটকের চেয়ে ছিল অধিকতর উন্নত ও অগ্রসর।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালও প্রথম জীবনে সাধারণ রঙ্গালয়ের লোক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন সাহিত্যিক। কিন্তু তাঁদের যে সব নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে বিখ্যাত হয়েছে, সেগুলি রচনার সময়ে তাঁদের দৃষ্টি ছিল যে সাধারণ রঙ্গালয়ের চাহিদার দিকেই, তাদের গঠন ও চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি দেখলেই সে কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" ও "পাষাণী" প্রভৃতি নাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। এগুলি রচনার সময়ে নাট্যকার পেশাদার নাট্যজগতের চাহিদা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন ব'লে মনে হয় না,—অন্ততঃ নিজের জীবনকালে ঐ সব নাটককে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন ব'লে শোনা যায় না। হয়তো সেই কারণেই ঐ সব নাটকের রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে উচ্চতর শ্রেণীর। তাই হওয়াই স্বাভাবিক। "ড্রামাটিষ্ট" নিরঙ্কুশ হ'তে পারেন, "প্লেরাইটে"র হাত-পা বাঁধা। প্রতিভাধর শিশিরকুমার ছিলেন ব'লেই "সীতা" ও "পাষাণী"র প্রকাশ্য অভিনয় সম্ভবপর হয়েছিল এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"কে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়েও পেশাদার রঙ্গালয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা কোনদিনই তার অভিনয় দেখাতে সাহস করেননি।

পেশাদার রঙ্গালয়ের নিজস্ব নাট্যকার, অভিনেতা—এমন কি চিত্রশিল্পীরা পর্য্যন্ত একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথ ধ'রে চলতে বাধ্য হন। তাঁরা চলাফেরা করেন সুপরিচিত গণ্ডীর ভিতরেই বন্দী হয়ে। তার বাইরে পা বাড়াতে চাইলেই বেঁকে বসেন রঙ্গালয়ের মালিকরা। এখানে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। এই সব দেখে-শুনেই পাশ্চাত্য দেশে "লিটল থিয়েটারে"র আন্দোলন সুরু হয়। যে সব উচ্চতর শ্রেণীর নাটক পেশাদার রঙ্গালয় গ্রহণ করতে নারাজ, "লিটল থিয়েটার" তাদের অভিনয় দেখাবার ভার নেয়। কেবল নাট্যকার নন, সেখানকার চিত্রশিল্পী এবং অভিনেতারাও সাধারণ রঙ্গালয়ের কাছ থেকে পরিকল্পনা ধার করবার চেষ্টা করেন না। ফলে দর্শকরা যা উপহার পায় তাকে অভিনব বলা চলে—তা বহু-ব্যবহৃত নয়, আনকোরা জিনিষ।

বারবার এটাও দেখা গিয়েছে যে সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা আগে যে নাটকের দিকে ফিরেও তাকাননি, "লিটল থিয়েটারে" তার সাফল্য দেখে তাকেও গ্রহণ ক'রে তাঁরা নিজেদের কপাল ফিরিয়ে ফেলেছেন। আমাদের দেশে "লিটল থিয়েটার" নেই, কিন্তু তার স্থান অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারে এখানকার সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়গুলি। এই কথাটা তলিয়ে বুঝলে এদেশের সৌখীন শিল্পীরাও আমাদের নাট্যকলাকে পৌঁছে দিতে পারেন যথার্থ উন্নতির পথে। সাধারণ রঙ্গালয়ের মোহ-শৃঙ্খলকে কেমন ক'রে ছিন্ন করতে

হয়, সে কথাও বাতলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, এবং কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী আগেও রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জনে"র সৌখীন অভিনয় দেখে এই বিষয় নিয়ে আমি পেয়েছিলুম যথেষ্ট চিন্তার খোরাক।

যেখানে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে সৌখীনদের রঙ্গাবতরণ করতে দেখেছিলুম, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সেই পটুয়াটোলার রূপ বদলে গেছে যথেষ্ট। কলকাতা সহরের বিভিন্ন পাড়ায় আছে এক এক শ্রেণীর কারিগরদের বসতি। যেমন কাঁসারীপাড়া, শাঁখারীপাড়া ও কুমারটুলী প্রভৃতি। পটুয়াটোলাতেও তখন সেই পটুয়া দলের অনেক লোক একসঙ্গে বাসা বেঁধেছিল, যাদের কাজ ছিল সৌখীন বা ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায়ের জন্যে দৃশ্যপট অঙ্কন করা। সহরে তখনও রাস্তায় রাস্তায় মোটর-ট্যাক্সির হত্যাভিযান সুরু হয়নি এবং অন্যান্য শ্রেণীর যানবাহনেরও সংখ্যা ছিল অল্প—বিশেষতঃ বড় বড় রাজপথের আশপাশের গলিগুলো ছিল এমন নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ যে, অবোধ শিশুরাও অবাধে খেলাধূলো করতে পারত। পটুয়াটোলাও ছিল এইরকম একটি পথ।

যদি বলি, সেখানে পটুয়াদের চিত্রশালা ছিল রাজপথের উপরেই, তাহ'লে অত্যুক্তি করা হবে না। যে কোন বাড়ীর বাইরের দেওয়ালের গায়ে বড় বড় পট টাঙিয়ে পটুয়ারা রাজপথেই ব'সে বা দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে পটের উপরে তুলিকাচালনা করত এবং তাদের চারিপাশে সাজানো থাকত ভিন্ন ভিন্ন রঙের ভাঁড়। ছেলেবেলায় আমাকে পেয়ে ব'সেছিল সেই সব পট ও পটুয়া। ঐ অঞ্চলে আমার মামার বাড়ী এবং সেখানে গেলেই যখন তখন সাগ্রহে দৌড়ে যেতুম পটুয়াটোলায়। অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম সেই সব পটের দিকে। চোখের সামনে দেখতুম, পটুয়াদের তুলির ছোঁয়ায় পটের উপরে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে বিভিন্নবর্ণসমৃদ্ধ প্রান্তর, কান্তার, নদনদী, গিরিদরী ও নগরের রাজপথ প্রভৃতি। শেষোক্ত শ্রেণীর দৃশ্যপট আমার কাঁচা বুদ্ধিকে অল্প আকৃষ্ট করত না—হয়তো আজকের বালক ও শিশুদের এখনও আকৃষ্ট করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জনশূন্য অসম্ভব সব রাজপথ এবং পটুয়ারা যে স্বাভাবিকতার অনুগামী বিশেষ রূপে সেটা প্রমাণিত করবার জন্যে দুই ধারের ঘর-বাড়ীর শ্রেণী ক্রমাতিসূক্ষ্ম হয়ে চ'লে গিয়েছে অনেক দূর পর্য্যন্ত। কিন্তু তখনও আমার বোঝবার বয়স হয় নি যে, এই দেখতে-বেশ বাড়ী-ঘর-রাস্তা নিয়ে পটখানা যখন মঞ্চস্থ হয়ে জীবন্ত অভিনেতাদের সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন হয়ে উঠবে কতখানি অস্বাভাবিক! পুরোভূমিতে বৃহতী জনতা, কিন্তু প্রত্যেক বাড়ী ও রাস্তা জনশূন্য। কেবল কি তাই? জীবন্ত মানুষদের উপস্থিতির ফলে ব্যর্থ হয়ে যাবে পটুয়াদের এত চেষ্টায় সৃষ্ট "পার্সপেক্টিভ"

বা পরিপ্রেক্ষিতের কৌশল। ঘরবাড়ীর দরজাগুলো দেখলে মনে হবে না যে, তাদের ভিতর দিয়ে প্রমাণ আকারের মানুষরা আনাগোনা করতে পারে। পাদপ্রদীপের মহিমায় মানুষদের ছায়া বৃহত্তর হয়ে উঠবে বড় বড় প্রাসাদের চেয়ে। তখন এই পটখানা হয়ে উঠবে পিছনে-টাঙানো এমন একখানা ছবির মত, যার উপরে আঁকা আছে কোন পরিত্যক্ত নগরের বিজন এক রাজপথ। অর্থাৎ দৃশ্যপট তখন আর নাট্য-ক্রিয়ার অনুগামী হবে না।

সৌখীন শিল্পীদের জন্যে দৃশ্যপট আঁকতে ব'সে পটুয়ারা পেশাদার রঙ্গালয়ের চিত্রকরদেরই অনুসরণ করত। শেষোক্ত রঙ্গালয়ের আকার ও পট বৃহত্তর ব'লে সেখানকার অস্বাভাবিকতা তবু কতকটা সহনীয় হ'তে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্রতর অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে ওঠে একেবারেই ছেলেখেলার সামিল। মনে হয়, যেন পুতুলের জগৎ দখল করতে চায় ধাড়ী ধাড়ী মানুষরা। কেবল রাজপথের দৃশ্যে নয়, অন্যান্য দৃশ্যপটেও থাকে এই হাস্যকর ও অশোভন অস্বাভাবিকতা। পাশ্চাত্য দেশের সৌখীন ও পেশাদার নাট্য-বিশেষজ্ঞরা আজকাল এই সব উপসর্গ থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের দেখাদেখি বাংলা দেশের পেশাদার রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও মাঝে মাঝে সাবধান হবার চেষ্টা করেন বটে, তবে ঐ পর্য্যন্ত। কারণ সেখানে আজও প্রায়ই দেখা যায়, দৃশ্যপটকে ব্যবহার করা হচ্ছে পিছনে-টাঙানো ফ্রেমহীন ছবির মতই। কাজে-কাজেই এখনো সৌখীনদের কিংবা অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের জন্যে যে সব নকলিয়া পটুয়া তুলিকা চালনা করেন, তাঁদেরও মাথায় সুবুদ্ধির উদয় হয় নি। এবং সেটা সম্ভবপরও নয়, কারণ তাঁরা পটের উপরে রং দেন, রেখা টানেন যে-সব সৌখীন নাট্য-পরিচালকের মুখ চেয়ে, তাঁরা নিজেরাই এ সম্বন্ধে মস্তককে ঘর্ম্মাক্ত করতে রাজী নন। বাংলা দেশে দৃশ্যপট নিয়ে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের সাহায্য নিয়েও যে ঐ শ্রেণীর অস্বাভাবিকতা পরিহার করা যায়, বহুকাল পূর্ব্বেই এটা তিনি প্রমাণিত করেছিলেন জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" ভবনে অনুষ্ঠিত "ডাকঘর" নাট্যাভিনয়ে। দৃশ্যপট সম্বন্ধে তাঁর মতামত অধিকতর পরিবর্ত্তিত হয়েছিল, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা করব অন্য সময়ে।

সম্প্রতি একদিন বেড়াতে গিয়েছিলুম পটুয়াটোলায়। দেখলুম, সে পথের উপর দিয়ে আজ মোটর, অশ্বযান ও রিক্সা ছুটছে ঘড়ি ঘড়ি এবং পথিকরাও দলে ভারী হয়ে উঠেছে রীতিমত। পটুয়াটোলার নামমাত্র বজায় রাখবার জন্যে দুই-একখানা ঘরের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে দুই-চারজন পটুয়া, কিন্তু বাড়ীর দেওয়ালে পট টাঙিয়ে

রাজপথে কৌতূহলী বালকদের মাঝখানে ব'সে কেউ আর ছবি আঁকে না। সহরে সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরো বেড়েছে, কিন্তু তাদের দৃশ্যপট আসে কোথা থেকে ?

পৃথিবীর সব দেশেই প্রথমে অভিনয় স্থরু করেন সৌখীনরাই এবং নারী-ভূমিকায় তাঁরা নারীদের বর্জ্জন ক'রেই চলতেন। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীতেও দেখি, ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা চতুর্দ্দশ লুই সৌখীন সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয়ে একটি বেদেনীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন।

কিন্তু বাংলা দেশে দেখা গিয়েছে এর ব্যতিক্রম। প্রথমতঃ, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম বাংলা থিয়েটারের জন্ম দেন পেশাদাররাই এবং অভিনয়ে যোগ দেন নারীরাও। দ্বিতীয়তঃ, এখানে সৌখীন সম্প্রদায়ের প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয়েও (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) নারী ভূমিকার জন্যে নির্ব্বাচন করা হয়েছিল নারীদেরই। বলা বাহুল্য, সেই সব নারী ছিল পতিতা। তদানীন্তন কালের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ নাট্যজগতে গণিকা নটীর আবির্ভাবকে যে একবাক্যে সমর্থন করেছিল, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই, কিন্তু জনৈক উদার-নৈতিক পত্রিকা-সম্পাদক বলেছিলেন : "ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র।"

বহুর মধ্যে এক বা একাধিক জনকয়েক লোকের দ্বারা সহজে কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় না। নবীনচন্দ্র বসুকেও তাঁর প্রচেষ্টার জন্যে বিভিন্ন পত্রিকার দ্বারা ধিকৃত হ'তে হয়েছিল। এবং দুই-চারজন সংস্কারমুক্ত নাট্যরসিক ছাড়া তথাকথিত প্রচেষ্টার জন্যে যে জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না, তার যথেষ্ট প্রমাণের অভাব নেই। কারণ পরবর্ত্তীকালে দেখা যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক অবৈতনিক সম্প্রদায় রঙ্গমঞ্চে নারীদের বর্জ্জন করতে বাধ্য হয়েছে। সাধারণতঃ দেখতে পাই, টাকার পাহাড়ের উপরে আরোহণ ক'রে সামাজিক হুমকি কিংবা জনসাধারণের মতামতের কোন তোয়াক্কাই রাখেন না ধনকুবেরগণ। নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করেন অম্লানবদনেই। কিন্তু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পর বাংলা দেশের সৌখীন নাট্যসমাজের উপরে যখন ধনপতিরা পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন, তখনও রঙ্গমঞ্চের উপরে তাঁরা নারীদের নিয়ে আসতে ভরসা পান নি।

এমন অবস্থায় কলকাতার বাগবাজারের কতিপয় যুবকের এবং চুঁচুড়ার কয়েকজন নাট্যরসিকের যখন সখের অভিনয় করবার সাধ হ'ল, তখনও তাঁরা রঙ্গালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীদের নিয়ে মাথা ঘামাতে চান নি। তাঁরা ছিলেন মধ্যবর্ত্তী পরিবারের সন্তান ; ধনীরা যে ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়েছেন, সেখানে অগ্রসর হবেন তাঁরা কোন্

সাহসে? তাই বাগবাজারের যুবকরা পেশাদার হয়ে ব'সেও নারীদের নাম মুখে আনেন নি। পুরুষরাই গোঁফ কামিয়ে মেয়েদের কাপড় প'রে অভিনয়ের তাবৎ কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সেই পুরুষ-প্রধান যুগে (অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার আগে) বাঙালীদের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব'লে গণ্য হতেন, তদানীন্তন কালের সমালোচকরা সে সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। এইখানেই শিল্পী হিসাবে অভিনেতাদের চরম অসুবিধা; সমসাময়িক সমালোচকরা শিল্পীদের কথা লিপিবদ্ধ ক'রে না রাখলে পরবর্ত্তী যুগও তাঁদের প্রতিভা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না, কারণ "দেহপট সনে নট সকলি হারায়।" সৌভাগ্যক্রমে কবিবর মাইকেল মধুসূদন নিজের সমসাময়িক একজন প্রতিভাধর অভিনেতার কথা কাগজে-কলমে স্থায়ী ক'রে গিয়েছেন। "কৃষ্ণকুমারী নাটক" কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করবার সময়ে তিনি লিখেছিলেন: "আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুল-শিরোমণি; ইহার দোষ-গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ আমার এই বাঞ্ছা যে, ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতেন।" মাইকেলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে, গিরীশচন্দ্রের পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ই ছিলেন বাংলা দেশের নট-কুল-শিরোমণি।

কোন কোন দেশে সামাজিক বিধান হচ্ছে অমোঘ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চীন দেশের নাম করা যায়। সেখানে আজও নারীদের সাহায্য না নিয়েও রঙ্গালয় পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওলটপালট এবং রাজ্যবিপ্লবের পর চৈনিক রঙ্গালয় আংশিক ভাবে নারীদের সাহায্য নিতে সুরু করেছে কি না জানি না, কিন্তু চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর এবং তারও কিছুকাল আগে আমি কলকাতায় যে দুটি পেশাদার চীনা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখেছিলুম, তার মধ্যে নারীদের কোন স্থানই ছিল না। কলকাতাতেও প্রথম সৌখীনদের (এবং পরবর্ত্তী পেশাদারদেরও) যুগে ইংরেজী রঙ্গালয়েও দেখা দিতেন নারীবেশধারী পুরুষরাই। পেশাদার পারসী থিয়েটারেও দেখেছি, নারী-ভূমিকায় নারীদের সঙ্গে অভিনয় করছেন পুরুষরাও। এবং সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম যুগেও নারী-ভূমিকার জন্যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ওঁদের মধ্যে প্রথম চারজন পরে পুরুষ-ভূমিকার জন্যেও প্রভূত প্রশস্তি লাভ করেছিলেন।

কিন্তু তার পরেই সহসা আজন্মবিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবে সমস্ত বাঁধা

ব্যবস্থাই ভণ্ডুল হয়ে গেল। তিনি এসেই সাধারণ রঙ্গালয়ে সর্ব্বপ্রথমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন নারীদের দাবী। কিছুকাল পরে জনকয়েক রুচিবাগীশের চেষ্টায় পেশাদার বীণা থিয়েটারে নারীবর্জ্জিত অভিনয়ের প্রথা আংশিক ভাবে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি। কিছুকাল ধ'রে অসম্ভবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বীণা থিয়েটারও শেষটা নারীদের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখন থেকে বহুকাল পর্য্যন্ত আমাদের সৌখীন নাট্যসমাজে নারীদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। দর্শকরাও বিনামূল্যে আসন অধিকার করবার সুযোগ পায় ব'লে নারীবর্জ্জিত অভিনয় নির্ব্বিকার ভাবে দর্শন করে। কিন্তু এখানেও বিদ্রোহ প্রকাশ করেন আর এক মহাকবি—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং আজকাল তাঁর দেখাদেখি আরো অনেকেও সৌখীনদের রঙ্গমঞ্চে নারীদের আমন্ত্রণ করতে ভয় পান না।

এ কথা সত্য বটে, এখানে সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে সাধারণ বা পেশাদার রঙ্গালয়; কিন্তু শেষোক্ত নাট্য-প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে বাংলা দেশের সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের ক্রমাবনতি সুরু হয়, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এক সময়ে যাঁদের ভিতর থেকে দেখা দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রলাল বসু ও অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (দানীবাবুও প্রথমে ছিলেন সৌখীন) প্রভৃতির মত শিল্পী, সাধারণ রঙ্গালয়ের পূর্ণ প্রভাবের যুগে তাঁদের মধ্য থেকে ঐ সব শিল্পীর সঙ্গে তুলনীয় আর কোন শক্তিধরের নাম শোনা যায় নি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গালয় এক সময়ে ছিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; এবং তার সেই প্রসিদ্ধির সঙ্গত কারণও ছিল যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি তখনও উক্ত সম্প্রদায়কে আলোকিত করেনি। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, রবীন্দ্রনাথ তখনও বালক। সর্ব্বপ্রথম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি প্রহসনে "অলীকবাবু" ও তৎপরে "মানময়ী" গীতিনাট্যে ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গালয়ে মদনের ভূমিকায় তিনি যখন রঙ্গাবতরণ করেন, সে হচ্ছে আরো কয়েক বৎসর পরেকার কথা। কিন্তু যে সব কারণে উক্ত রঙ্গালয় আমাদের নাট্যশালার ইতিহাসে স্থায়ী স্থানলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিল, তার একটি হচ্ছে প্রথম যুগে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে নাট্যানুশীলনের ধারা প্রবর্ত্তিত করেছিল, সে ছিল তাদেরই অন্যতম। কিন্তু তার পরেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিরীশ-অর্দ্ধেন্দুদের সখের সম্প্রদায় যে ঠাকুরবাবুদের সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী নাম কিনেছিল, তার নজীর পাওয়া যায়। গিরীশচন্দ্র নিজেই এই খবরটি দিয়েছেন: "সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার

কানাইলাল দে, ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন—"আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোরা।" পেশাদার নট হবার আগেই গিরীশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মতিলাল সুর ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাট্য-প্রতিভা কতদূর বিকশিত হয়েছিল, সেই সত্যই প্রমাণিত করছে পূর্ব্বোক্ত উক্তি। কেবল ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গালয় নয়, সে সময়ে কলকাতায় আরো অনেক অবৈতনিক নাট্য-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। সে সম্বন্ধে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অমৃতলাল বসু বলেছেন: "পূর্ব্ববর্ত্তী থিয়েটারের প্রধান অভিনেতারা ভাব ও ভঙ্গি সং রসাভিনয় করিতেন বটে, কিন্তু অনেক সময়েই তাহা অনুকরণ বোধ হইত, ভিতর হইতে যেন বলিতেন না। কিন্তু গিরীশবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিতেন, তাহা যেন ভিতর হইতে বাহির হইত। তাঁহারা feel করিয়া acting করিতেন এবং সেইরূপ শিখাইতেন।"

গিরীশচন্দ্র ও অমৃতলালের ঐ দুটি উক্তি আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধেও এ দেশে পেশাদার রঙ্গালয় স্থাপিত হবার আগে আমাদের অবৈতনিক সম্প্রদায়ের শিল্পীদের আদর্শ ছিল কোন্ স্তরের, তার উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড দুর্লভ। কিন্তু ঐ দুটি উক্তির মধ্যে আছে প্রত্যক্ষদর্শীর মতামত। তখনকার মত সৌখীন গিরীশ-অর্দ্ধেন্দু প্রমুখ অভিনেতাদের নিয়েই পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং সে যুগের অবৈতনিক শিল্পীরা যে তাঁদের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন না, একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তখনকার অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়গুলির শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর, শোভাবাজার রাজবাড়ীর, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর ও বউবাজারে বসু ভ্রাতৃযুগলের রঙ্গালয় এবং তাঁদের অভিনয়ের দর ছিল যে উনিশ-বিশ, এটুকু মনে করলেও অন্যায় হবে না। অমৃতলালের উক্তি থেকেই জানতে পারি, ঐ সকল রঙ্গালয়ের শিল্পীদের চেয়ে গিরীশ-অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের আদর্শ ছিল উচ্চতর শ্রেণীর। এমন অবস্থায় তাঁদের দ্বারা পরিচালিত সাধারণ রঙ্গালয়ের তুলনায় তদানীন্তন কালের অন্যান্য সৌখীন সম্প্রদায়গুলির কাজ যে অধিকতর নিম্নশ্রেণীর ছিল, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তারপর আমাদের পেশাদার রঙ্গালয় যতই পরিপুষ্ট হয়, এ দেশের সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠানের মান ততই নীচের দিকে নেমে যায়। একটি প্রমাণ দেখেই এমন অনুমান করছি। গিরীশ ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতির আবির্ভাবের পরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাঁদের মত উল্লেখযোগ্য আর কোন সৌখীন শিল্পী সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন নি। কেউ কেউ বলতে পারেন হয়তো সৌখীন জগতে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী

ছিলেন, কিন্তু তাঁরা নানা কারণে কুবিখ্যাত সাধারণ রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসতে চাইতেন না। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন শিল্পীর কথা আমরা বাল্যকালে লোকের মুখেও শ্রবণ করি নি।

দেখেছি বরং উল্টো ব্যাপারই। পাড়ায় পাড়ায় ছিল যে সব থিয়েটারের আখড়া, সেখানে গিয়ে নাট্যানুশীলনের নাম ক'রে যারা আড্ডা দিত তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই দেখা যেত নামকাটা বখাটে ছোকরাদের। তাদের না ছিল সংস্কৃতি, না ছিল বিদ্যাবুদ্ধি বা নাট্যপ্রতিভা। অভিনয় ছিল তাদের কাছে একরকম ছেলেখেলার মত। অভিনয় যে সৃষ্টিক্ষম আর্ট, এ জ্ঞান তাদের ছিল না; তারা ভাবত, বড় বড় পেশাদার নটদের হুবহু অনুকরণ করতে পারলেই ভালো অভিনেতা হওয়া যায়। কেবল আমাদের বাল্য ও যৌবন কালেই নয়, আজও অধিকাংশ স্থলে দেখতে পাই এদের বিরক্তিকর অস্তিত্ব। ওরই মধ্যে কালে-ভদ্রে হয়তো জনকয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি একত্র হয়ে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করতেন, কিন্তু উল্লেখ্য হ'ত না সে সব প্রচেষ্টা বা সাময়িক খেয়ালও। এদিকে নব্য সমাজের অনেকেই পেশাদার থিয়েটার পছন্দ না করলেও নাট্যরস উপভোগ করবার সুযোগ খুঁজতেন। এই শ্রেণীর দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্যে অবশেষে বিখ্যাত "সঙ্গীত সমাজে"র প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের কিশোর বয়সে সেখানকার অভিনয়ের কথা শুনতুম লোকের মুখে মুখে।

"সঙ্গীত সমাজ" বটে, কিন্তু মাত্র তৌর্য্যত্রিকই ছিল না তার অবলম্বন। এক হিসাবে ওটি হচ্ছে "misnomer" বা মিথ্যা নাম। ওখানে নাচ-গান প্রভৃতির চর্চ্চা হ'ত, কিন্তু তার উপরে পরিপূর্ণ মাত্রায় চলত নাট্যানুশীলন। নাট্যসমাজকে কেউ সঙ্গীত সমাজ নামে পরিচিত করে না। সে যা হোক্, আপাততঃ তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কারণ "সঙ্গীত সমাজ" এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক সখের নাট্য-সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করবার আগে আমরা সেকালের সৌখীন রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আরো দুই-চার কথা ব'লে নিতে চাই।

এ-বিষয়ে আমাদের প্রধান সম্বল হচ্ছে পুরাতন খবরের কাগজ ও পুঁথিপত্র। চোখে যা দেখিনি, তার সম্বন্ধে জোর ক'রে নিশ্চিতভাবে কিছু বলবার উপায় নেই। প্রথম যুগের সৌখীন অভিনেতারা এখানে কি-রকম রঙ্গমঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতেন? প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিদেশী লেবেডেফ সাহেব এবং সেটি যে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে কিন্তু তার কথা তোলাই বাহুল্য, কারণ সেটি ছিল পেশাদারদের জন্যে। তার প্রায় তিন যুগ পরে

প্রতিষ্ঠিত হয় শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গালয়। সেখানেই সৌখীন শিল্পীদের দ্বারা প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় সুরু হয়। কিন্তু সে রঙ্গমঞ্চেরও দুই রকম বর্ণনা পাই।

মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিতে যোগীন্দ্রনাথ বসু জানিয়েছেন, সেখানে এক একটি দৃশ্য এক এক জায়গায় আগে থাকতেই প্রস্তুত করে রাখা হ'ত। "সেই সব দৃশ্য দেখিবার জন্য দর্শকদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হইত। তথায় তাঁহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত। ইহাতে দর্শক ও অভিনেতা উভয়েরই অসুবিধা হইত।"

আবার সেকালকার সংবাদপত্রের সমালোচনা পড়লে বোঝা যায়, নবীনবাবুর বাড়ীতে ঐ অভিনয়ে ষ্টেজ বেঁধে কৃত্রিম দৃশ্যপটও ব্যবহার করা হয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, দর্শক ও অভিনেতার অসুবিধা দেখে নবীনবাবু পরে প্রথমোক্ত পদ্ধতিটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু বাংলা নাটকের সেই প্রথম মঞ্চাভিনয়ে কোন্ শ্রেণীর ষ্টেজ ব্যবহার করা হয়েছিল? স্থায়ী, না অস্থায়ী? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায় না।

তারপর এখানে কিছুকাল ধ'রে স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটকের অনিয়মিত অভিনয় চলে, নিশ্চয়ই অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে। কেবল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থেকে যায় এবং প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। কিন্তু ঐ সব রঙ্গমঞ্চের কথাও এখানে অবান্তর, কারণ তারাও বাংলা নাটকের ধার ধারত না। তারপর এখানে-ওখানে সখের অভিনয়ের আসর বসত বটে, কিন্তু সেগুলির অবস্থা এখন যেমন, তখনও তেমনি ছিল—অর্থাৎ দুই-একদিনের জন্যে মঞ্চ বেঁধে আবার ভেঙে ফেলা হত। ওরই মধ্যে বাংলা নাটকের উল্লেখযোগ্য অভিনয় দেখানো হ'ত আশুতোষ দেবের ভবনে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে)। কিন্তু সেখানকার রঙ্গমঞ্চও স্থায়ী বা পাকা ছিল কিনা জানা যায় না।

প্রায় সেই সঙ্গেই বাংলা দেশের সৌখীন নাট্যসমাজে আসে যুগান্তর—সাহিত্যিক ও নাট্যবিশারদ কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত করেন বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার। সে সময়ে কালীপ্রসন্নের বয়স ছিল মাত্র যোলো বৎসর। কিন্তু সেই প্রায়-বালক বয়সেই তিনি দেখিয়েছিলেন নাট্যকলার এমন অপরূপ রূপ যে, তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পাইক-পাড়ার রাজারা এবং তখন বাবু ও পরে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও আপন আপন ভবনে বিখ্যাত সৌখীন রঙ্গালয় স্থাপন করেন। শুনতে পাই কালীপ্রসন্নের বাড়ীর রঙ্গমঞ্চ প্রথমে ছিল অস্থায়ী ও পরে স্থায়ী। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে বালকবয়সে আমি একবার সিংহ-বাবুদের বাড়ীতে যাবার সুযোগ পেয়েছিলুম। বাড়ীর উঠানের

পূর্ব্বদিকে দেখেছিলুম একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাকা রঙ্গমঞ্চ। হয়তো সেই মঞ্চেই তারও বিয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ বৎসর আগে সপার্ষদ কালীপ্রসন্ন অবতীর্ণ হয়ে বাংলা অভিনয়ের উচ্চাদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে জোর ক'রে কিছু বলতে পারি না।

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুসরণ ক'রে পাইকপাড়ার রাজারা যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্বোধন করেন, সমালোচকদের মতানুসারে সেইটিই ছিল নাকি ঐ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিষ্ঠান। এইজন্যেই তার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে মাইকেল মধুসূদন লিখেছিলেন: "রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে দর্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে।" এবং অন্যত্র রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র ভ্রাতৃযুগলের কথা স্মরণ ক'রে তিনি বলেছিলেন: "যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুইজন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না,—ইঁহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।" বেলগাছিয়া নাট্যশালার একাধিক উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায় এবং তার রঙ্গমঞ্চ যে স্থায়ী ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

তারপর আসে চারটি প্রধান নাট্যশালার কথা। প্রথম, পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গ-নাট্যশালা। ওখানে যে পাকা মঞ্চের উপরে অভিনয় হ'ত, বোধ করি এমন কোন লিপিবদ্ধ প্রমাণ নেই। গত শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভবনে গিয়েও আমি কোন পাকা রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব দেখতে পাই নি। ঐ সময়ে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের ভবনেও অভিনয় দেখেছি—কিন্তু অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে। তখনকার আর দুটি প্রধান নাট্য-প্রতিষ্ঠানও (শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাবুদের নাট্যশালা) যে সাময়িকভাবে মঞ্চ খাটিয়ে অভিনয় করত, এ কথা মনে করবার কারণ আছে। তখনকার চতুর্থ প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, "বহুবাজারস্থ বঙ্গ-নাট্যালয়"। ওখানে খোলা জমির উপরে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ ক'রে অভিনয় হ'ত। ১৩৩০ সালের "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবন্ধ পাঠ ক'রে জানতে পারি, স্তম্ভ তৈরি করবার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল কেটে-আনা বড় বড় নারিকেল গাছ এবং সেগুলির উপরে ছিল সাদা রং-মেশানো মাটির প্রলেপ। সেখানে "সতী" নাট্যাভিনয়ে যে সব দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয়েছিল, তৈলবর্ণে অঙ্কিত তার কয়েকখানি প্রতিলিপি এখনো পাওয়া যায়। সেগুলি দেখে বুঝতে পারি, দৃশ্যপটাঙ্কনে সেই পুরাতন পদ্ধতি আজও একেবারে বর্জ্জিত হয় নি।

তারপরেই যে সৌখীন অভিনয়ের যুগ আসে, সে সময়ে গিরীশ-অর্দ্ধেন্দুর সম্প্রদায়ই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। এ-সম্প্রদায়ও প্রথমে অস্থায়ী ও তারপর স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে (শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল পালের ভবনে) অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে)। দীনবন্ধুর "লীলাবতী" নাটকের অভিনয় দেখাবার পরেই সম্প্রদায় সৌখীনদের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয় (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে)। তারপরেই কলকাতায় সাধারণ বা পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় পর্ব্ব। এই সময়েও এখানে সৌখীনদের মধ্যে নাট্যকলাচর্চ্চা অব্যাহত থাকলেও সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নি।

সাধারণ রঙ্গালয় জ'মে ওঠবার পর থেকে সঙ্গীত সমাজ প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে যুগটা গিয়েছে, সৌখীন নাট্যজগতের পক্ষে সেটাকে অজন্মার যুগ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই সময়ের মধ্যে গিরীশ, অর্দ্ধেন্দু, অমৃতলাল মিত্র ও মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন, এমন কোন সৌখীন অভিনেতার নাম আমরা শুনতে পাই না এবং ব্যষ্টি-গতভাবে না হোক, সমষ্টিগতভাবেও কোন অবৈতনিক নাট্য-প্রতিষ্ঠান রসিকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু তা ব'লে এখানে তথাকথিত অভিনেতাদের অভাব ছিল না, বরং প্রাদুর্ভাবই ছিল বলা যেতে পারে। ব্যাঙের ছাতা কেউ পোঁতে না, তা আপনি গজায় ঝাঁকে ঝাঁকে, নিতান্ত অপ্রয়োজনেই; তারপর আপনি শুকিয়ে যায়, কারুর যত্নাদরের তোয়াক্কা না রেখেই। কবিরা তাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে উৎসাহিত হন না, ঐতিহাসিকরা তাদের জন্ম ও মৃত্যুর কালনিরূপণের জন্যে তর্কসভা আহ্বান করেন না। মহাকালের যাত্রাপথকে বন্ধুর না ক'রেই তারা জন্মে ও মরে।

বিচিত্র বিষয় এই, আমাদের দেশে নাট্যকলাচর্চ্চা আরম্ভ হবার পর প্রথম যুগে রামনারায়ণ, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সব নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁরা কেউ পেশাদার রঙ্গালয়ের লোক নন; অথচ সাধারণ রঙ্গালয়ের আশ্রয়ে যখন বাংলা নাট্যকলা ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে লাগল, তখন গিরীশচন্দ্র প্রভৃতির দ্বারা বারংবার আহূত হয়েও বাহির থেকে কোন শক্তিশালী নাট্যকার সাড়া দেননি। এই নীরবতার কারণ যেন রহস্যময়। তখনও তাবৎ বিষয় নিয়ে দলে দলে লেখক কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আহূত হয়েও এবং অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকলেও কেউ প্রবুদ্ধ ও প্রলুব্ধ হ'তেন না নাটক রচনার জন্যে। কাজে কাজেই নট গিরীশচন্দ্র নিজেই হয়ে দাঁড়ালেন নাট্যকার এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি যাঁরা ছিলেন পেশাদার রঙ্গালয়ের ঘরের লোক। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল সাধারণ

রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছিলেন তারও অনেক পরে—একেবারে গত শতাব্দীর শেষ ভাগে।

উচ্চশ্রেণীর সৌখীনরা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগারে রাম-শ্যাম দশজনের সঙ্গে হেটো নাট্যাভিনয় দেখে বোধ করি তাঁদের চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হ'ত না, কারণ তাঁদের মধ্যে ছিলেন তথাকথিত আভিজাত্য-গর্ব্বিত এমন অনেক ব্যক্তি, কাঞ্চনকৌলীন্যের মহিমায় জনসাধারণের ছোঁয়াচ যাঁদের ধাতস্থ হ'ত না। তাঁরা গত যুগের কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাবুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রখ্যাত নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। অবশেষে এঁদেরই চিত্তবিনোদনের জন্যে এঁদেরই অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল সঙ্গীত সমাজ। কিছুকালের জন্যে এঁরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

"সঙ্গীত সমাজ" কেবল গান-বাজনার আসর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিতকার প্রভাতকুমার বলেছেন: "সঙ্গীত সমাজ হইল বিলাতী ক্লাব ও বাবুদের বৈঠকখানার সংমিশ্রণ। ফরাশ, তাকিয়া, জাজিম, গড়গড়া, তাস, পাশার সঙ্গে থাকিল পিয়ানো, টেবিল অর্গান, বিলিয়ার্ড টেবিল প্রভৃতি। জমিদার ও ধনীরা আসিলেন। বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার ডাক্তার আসিলেন, কণ্ঠসঙ্গীতে ওস্তাদ কেহ কলিকাতায় আসিলে যেমন তাঁহাকে সমাজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার কৃতিত্ব উপভোগ করিবার সুযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, তেমনি আনন্দ ও শিক্ষার জন্য সুসংস্কৃত প্রণালীতে অভিনয়ের ব্যবহার হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সঙ্গীত সমাজের প্রথম সম্পাদক। পরে অন্যতম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গীত সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী', 'অলীকবাবু' প্রভৃতি বহু নাট্য ও গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। সমাজের সভ্যদিগকে লইয়া অভিনয়ের আয়োজন হইত। কোনো মহিলা সভ্য না থাকায় স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করিবার জন্য কয়েকজন বেতনভোগী কিশোর স্থায়িরূপে প্রতিপালিত হইয়া সমাজের বিশিষ্ট অভিনয়ভঙ্গিতে দীক্ষিত হইত। সঙ্গীত সমাজের সৃষ্টি হইতে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগদান করেন। * * * * প্রায় দশ বৎসর ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, ১৩০৮ সালের পর তাঁহার সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়া আসে।"

সঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতারা বোধ করি স্থানমাহাত্ম্য বিস্মৃত হ'তে পারেননি। এক হিসাবে বাংলা রঙ্গালয়ের আদি পর্ব্বের প্রধান পুরোধা ছিলেন কালিপ্রসন্ন সিংহ। বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে নিজের প্রাসাদোপম বাসভবনে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "বিদ্যোৎসাহিনী

সভা" প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ঐখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর "বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গালয়"। বিশেষজ্ঞরা জানেন, সেকালকার অন্যান্য অভিজাত নাট্যরসিকরা ঐ রঙ্গালয় দেখেই নূতন নূতন সৌখীন নাট্যপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলবার প্রেরণা লাভ করেন। সুতরাং নাট্যরসিকদের পক্ষে ওটা হচ্ছে "হিষ্টরিক" বা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভবন। কিঞ্চিদধিক তিন যুগ পরে কলকাতার ধনীরা বোধ হয় আর কোন দিক দিয়ে না হোক, অন্ততঃ আভিজাত্যের দিক দিয়ে কালিপ্রসন্নের সান্নিধ্য অনুভব করলেন এবং হয়তো সেই কারণেই তাঁরা প্রথম আস্তানা বাঁধলেন তাঁরই বাস্তভিটায় গিয়ে। এইভাবেই তাঁরা সৌখীন নাট্যজগতে অতীতের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ যোগসূত্র বেশীদিন অবিচ্ছিন্ন থাকে নি। কিছুকাল পরেই দলাদলির ফলে সঙ্গীত সমাজ স্থানান্তরিত হয় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এবং কালিপ্রসন্নের বাস-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বল্পকালস্থায়ী "সঙ্গীত সমিতি"। শেষোক্ত স্থানে আমি যে রঙ্গমঞ্চটি দেখেছি, খুব সম্ভব তা নির্ম্মিত হয় সঙ্গীত সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরই তত্ত্বাবধানে। পরে আমি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সঙ্গীত সমাজের নূতন রঙ্গমঞ্চ দেখেছি। দুটি রঙ্গমঞ্চের ভিতরেই সাদৃশ্য ছিল অল্পবিস্তর। দুটি রঙ্গমঞ্চেরই "প্রসিনিয়ামে" বা সম্মুখভাগের ফ্রেম ছিল সোনালী কাজ করা। আজও তারা বিদ্যমান আছে কিনা জানি না।

মহারাষ্ট্রের "গায়েন সমাজ" দেখে কলকাতায় "সঙ্গীত সমাজ" প্রতিষ্ঠার কল্পনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে ওঠে। কিন্তু ঐ "গায়েন সমাজ"টা কি? গায়েন বলতে গায়ন বা গায়ক বুঝি। মহারাষ্ট্রে আজও অভিনয় ব্যাপারটার প্রাধান্য নেই, সুতরাং সেকালে ওখানে যে অভিনয়ের চল ছিল, এমন কথা মনে না করলেও চলে। অতএব "গায়েন সমাজে" বোধ করি কেবল গান-বাজনারই চর্চ্চা হ'ত। সঙ্গীত নাট্যকলার অন্তর্গত হ'লেও কেউ অভিনয় বলতে সঙ্গীত বা সঙ্গীত বলতে অভিনয় বোঝে না। কাজেই মনে প্রশ্ন জাগে, সর্ব্বপ্রথমে কি সঙ্গীত সমাজেরও প্রধান লক্ষ্য ছিল গানবাজনা এবং তারপর কি সেখানে অভিনয়ের প্রস্তাব ওঠে? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই।

রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "রবীন্দ্র-কথা" গ্রন্থে "সঙ্গীত সমাজে"র যে বিবরণ দিয়েছেন, নিম্নে তার কতকাংশ উদ্ধৃত হ'ল :

"ভারত সঙ্গীত-সমাজ" নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইল। কলিকাতার অভিজাত বংশের যুবক ও মধ্যবয়স্ক অনেকেই আগ্রহের সহিত ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন ও প্রায় নিত্যই সমাজভবনে মিলিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে মিঃ (পরে লর্ড) এস. পি.

সিংহ, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ ব্যারিষ্টারবৃন্দ ও বিলাত-ফেরৎ ডাক্তাররা অনেকেই ইহার সভ্য হন। সুচারুরূপে কার্য্য আরম্ভ হইল, কিন্তু আমাদের যেমন হয়,—তিনজনে একসঙ্গে কাজ করিতে পারি না, এ ক্ষেত্রেও দলাদলি আরম্ভ হইয়া শেষে সেটা কেলেংকারীতে পরিণত হইল। সে সকল বিবৃত করিবার স্থান এ নহে। জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ অনেকেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের অনতিদূরে একটি সমগ্র বাড়ি শ্রীআশুতোষ চৌধুরীর নামে "লীজ" লইয়া "ভারত-সঙ্গীত-সমাজের" পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অপর দল পূর্ব্বস্থানে "সঙ্গীত-সমিতি" নাম দিয়া কিছুদিন তাঁহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিলেন।

সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোকের "বৈঠকখানার" আদর্শে "সমাজের" পরিচালনা হইত। সেইজন্য বিস্তৃত হলে দোতলায়, কুর্সি কেদারা টেবিল সোফা বর্জ্জিত প্রশস্ত সাদা জাজিম তাকিয়া দেওয়া ফরাশ বিছানা ও আলবোলা পানদান ও গোলাপদানি ইহার আনুষ্ঠানিক রূপ ধার্য্য হয়। বিলাতি ধরণের ক্লাবের পানভোজনের ও রুলেট্ টেবিলের পরিবর্ত্তে আমপাতার নল দেওয়া রূপাবাঁধা হুঁকা ও বৈঠক, পরাতে সজ্জিত সুবাসিত তাম্বুল ও বরফসংযুক্ত জল ও এইরেটেড্ পানীয়ের ব্যবস্থা হয়। দেশীয় নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, বিলাতি সচিত্র পত্রিকাবলী, তাস, দাবা ও পাশা সভ্যদের ব্যবহার ও অবসর বিনোদনের জন্য তথায় রক্ষিত হইত। মধ্যে মধ্যে বৈঠকী গান ও কথকতা দেওয়া হইত। তরুণদিগের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থায় একটি স্বতন্ত্র ঘর ছিল। অধিকন্তু তাঁহাদের অভ্যাস ও শিক্ষার কারণ একখানি ঐকতানের ঘর পিয়ানো, টেবিল-অর্গ্যান, হারমোনিয়াম, বড় বেহালা ইত্যাদিতে সজ্জিত ছিল ও একজন সঙ্গীতাচার্য্য নিযুক্ত ছিলেন। এক ঘরে ক্রীড়ার জন্য সবুজ বনাতমোড়া এক প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিল মায় আনুসঙ্গিক সাজসরঞ্জাম ও দর্শকদের জন্য বসিবার বেঞ্চ থাকায়, তাহা প্রায়ই ফাঁক যাইত না। উৎসব উপলক্ষে সে ঘর বন্ধ করিয়া দিতে হইত। প্রাঙ্গণে একটি সুবৃহৎ বাঁধা স্টেজ রঙ্গমঞ্চের জন্য ছিল।

কণ্ঠসঙ্গীতে বা যন্ত্রসঙ্গীতে কৃতী বা গুণী কেহ কলিকাতায় আসিলেই যেমন তাঁহাকে সমাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার কৃতিত্ব দেখিবার সুযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, তেমনিই আনন্দ, শিক্ষা ও সুসংস্কৃত প্রণালীর অভিনয়ের ব্যবস্থাও হইত।

প্রারম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহ সহকারে "ভারত-সঙ্গীত-সমাজে" যোগ দিয়াছিলেন। অভিনয়ের সহিত সঙ্গীতের নিত্য সম্বন্ধ। সমাজের সভ্যদিগকে লইয়া অভিনয়ের আয়োজন হইত। কোনো মহিলা সভ্যা না থাকায় স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করিবার জন্য কয়েকজন বেতনভোগী কিশোর স্থায়িরূপে প্রতিপালিত হইয়া সমাজের বিশিষ্ট অভিনয়

ভঙ্গিতে দীক্ষিত হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সহযোগী সম্পাদকরূপে যেমন সকল ব্যবস্থা ও আয়-ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অভিনয়, গীত ও নৃত্য শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। সঙ্গীতচর্চার জন্য "সঙ্গীত প্রকাশিকা" নাম দিয়া স্বরলিপিবহুল একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। রাজা ডঃ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত দণ্ড ত্রিকোণ মাত্রিক স্বরলিপি ছাপার অসুবিধা বিধায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক নব প্রণালীর প্রচলন করেন। অদ্যাবধি সুলভ মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য সেই গীতলিপি-পদ্ধতিই ব্যবহৃত হইতেছে। ত্রিপুরাধীপের ইচ্ছাক্রমে এই পত্রিকাখানি "ভারত-সঙ্গীত-সমাজের" মুখপত্র স্বরূপ চালিত হয় ও ইহার প্রকাশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহারাজ মাসিক স্বতন্ত্র দানের ব্যবস্থা করেন। সমাজের অনুষ্ঠিত অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত করিতে রবীন্দ্রনাথও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তবে "সঙ্গীত প্রকাশিকায়" সহযোগিতা করা বা সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে বা বক্তব্য জ্ঞাপনে তাঁহার লেখনী তৎকালে বিরত ছিল।

সাধারণের জন্য সমাজগৃহ প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। অবৈতনিক সম্পাদক ও কার্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণকে সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত বেতনদানে কর্ম্মচারীবৃন্দ, পাণ্ডুলিপিলেখক এবং বেহারা, দ্বারবান প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের বন্দোবস্ত ছিল। কাজেই দিবসেও প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকা হইতে তথায় লোক-সমাগম হইত। কেহ কেহ দৈনিক সংবাদপত্র দেখিতে আসিতেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা কার্য্য-পরিদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় কাজই ঐ গৃহে করিতেন। ব্যক্তিবিশেষের সম্বর্ধনার জন্য সময়ে সময়ে দস্তুরমত মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য ভোজের আয়োজন হইত ও তাহা নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট স্থানও ছিল। সময়ে সময়ে মেনু কার্ড মুদ্রণ করা হইত ও বিরাট ভোজ্য-তালিকায় ও তাহার লিখনভঙ্গিতে সহরবাসী চমৎকৃত হইয়া যাইত। ত্রিপুরাধিপতি, কুচবিহারের মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, দ্বারবঙ্গেশ্বর, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও বাঙলার মফস্বলের জমিদারগণের অনেকেই ইহার সভ্য ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যায় অবকাশ রঞ্জনের নিমিত্ত সমাজভবনে পদার্পণ করিতেন ও সাধারণের সহিত সমান ভাবে মিশিতেন। সেদিন তাঁহাদের সম্মানার্থে বিশেষ আয়োজন কিছু হইত না। বিদেশীয় বা কোনো ইংরাজের জন্য কখনো অভ্যর্থনার আয়োজন হয় নাই। সকলের মনের ভাবগতি দেখিয়া কেহ সেকথা উত্থাপিত করিতেও সাহসী হইতেন না। বিলাতে নব আবিষ্কার প্রদর্শন করিয়া যখন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক সান্ধ্য আয়োজন ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। অভিনয়ে সময়-নিষ্ঠার জন্য (Punctuality) সমাজের সুনাম ছিল, তাহা দীর্ঘ কয় বৎসরের মধ্যে

কখনো ক্ষুন্ন হয় নাই, বিত্তবান সভ্যদের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কবিতা "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র" এই উপলক্ষে রচিত হয়।

সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ব্যক্তিরা সখের খাতিরে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় করিতেন, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, তাঁদের মধ্যে অনেকে এমনই ছিলেন যে মাতৃভাষা উচ্চারণ করিতে অনেক সময়ে তাঁহাদের জিহ্বা অস্বীকার করিত, তন্মধ্যে কেহ কেহ বিলাত প্রত্যাগতও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিপ্রহরে কাহারও কাহারও বাড়ীতে ও সমাজভবনে গিয়া তাঁহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন, আবার সন্ধ্যার পর মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভূমিকা পাঠের আবৃত্তি গ্রহণ করিতেন ও আনুসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দিতেন। সেটা প্রকাশ্যভাবে সকলের সমক্ষেই সমাজবৈঠকে হইত ও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মঞ্চোপরি হইত। এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া পরিশ্রম স্বীকারের পর যখন সমাজ জাঁকাইয়া উঠিল, রবীন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।"

সঙ্গীত সমাজে "মেঘনাদ বধ", "আনন্দমঠ" ও "মৃণালিনী" প্রভৃতি নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁদের সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত নাটকাবলীও মঞ্চস্থ করা হ'ত। এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "অশ্রুমতী", "অলীক বাবু", "পুনর্বসন্ত" ও "ধ্যানভঙ্গ" এবং রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন", "গোড়ায় গলদ" (আধুনিক নাম "শেষরক্ষা") ও "বৈকুণ্ঠের খাতা" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতৃযুগল কেবল নাটকের দিক দিয়ে নয়, অন্যান্য দিক দিয়েও সঙ্গীত সমাজকে প্রভূত সাহায্য দান করেছিলেন। তাঁরা দুই সহোদরই বালকবয়স থেকেই একান্তভাবে নাট্যকলার উপাসক ছিলেন। সুতরাং সঙ্গীত সমাজের কর্ম্মচাঞ্চল্যের মধ্যে তাঁরা পেতেন নিজেদেরই প্রাণের সাড়া। বাংলা রঙ্গালয়ে তাঁদের দুই ভ্রাতার দান ছিল অকৃপণ ও অপরিমিত। সেই প্রাচুর্য্যের একটা মোটা অংশ লাভ করেছিল সঙ্গীত সমাজ।

সঙ্গীত সমাজে কর্ম্মী ছিলেন অনেকজন, তাঁদের সকলের কথা আমরা জানি না এবং আমার জানবার কথাও নয়। এমন প্রসিদ্ধ একটি সৌখীন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত আলোচনা তাঁরাও করেন নি। বহুকাল ধ'রে দেশীয় নাট্যকলা নিয়ে যাঁরা প্রচুর কালি-কাগজ খরচ ক'রে ও বড় বড় বুলি কপচে আসছেন, বোধ হয় তাঁদের বিশ্বাস যে, সাধারণ নাট্যজগতের বাইরে থাকে যে সব সৌখীন প্রতিষ্ঠান, তাদের বিষয়ে বিশেষ বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সুখের বিষয়, অল্পকাল আগে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যসেবক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় "মাসিক বসুমতী"র পৃষ্ঠায় সঙ্গীত সমাজ

সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। তিনি উক্ত সমাজের সঙ্গে অন্যতম কর্ম্মীরূপে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু বলেছেন, সঙ্গীত সমাজের নাট্যাচার্য্যের আসনে অধিষ্ঠিত করবার জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাধামাধব করের নিকটে গমন করেছিলেন। রাধামাধব গিরীশ-যুগের লোক এবং পেশাদার রঙ্গালয়ে কিছুকাল অভিনয় ক'রে কয়েকটি ভূমিকায় বেশ নাম কিনেছিলেন। তিনি ছিলেন সুগায়কও। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনয় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের "বউঠাকুরাণীর হাটে"র নাট্যরূপ "বসন্ত রায়"-এর নাম-ভূমিকায়। সে অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে পরে ঐ ভূমিকায় পূর্ণচন্দ্র ঘোষকে আমি দেখেছি, তাঁর গান ও অভিনয় আজও গাঁথা আছে আমার কানে ও প্রাণে। শেষ-জীবনে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরীশচন্দ্র "চন্দ্রশেখর"-এর নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, সেই সময়ে একাধিক রাত্রির জন্যে প্রাচীন রাধামাধব করকে লরেন্স ফষ্টারের ভূমিকায় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

রাধামাধব কেবল নাট্যাচার্য্যের কর্ত্তব্য পালন করেন নি, অবতীর্ণ হয়েছিলেন সঙ্গীত সমাজের মঞ্চাভিনয়েও। যতদূর জানি, ওখানে নাট্যাচার্য্যের আসন অধিকার করেছিলেন আরো কেউ কেউ যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ওখানে আরো কোন কোন কাজে কর্ম্মনায়করূপে যোগ দিয়েছিলেন, পরে নাট্যজগতে তাঁর মহার্ঘ দান নিয়ে যখন বিশেষ আলোচনা করব, তখনই সকলকে শোনাব সে সব কথা।

শুনেছি চারুচন্দ্র মিত্রও সঙ্গীত সমাজে কেবল অভিনেতা রূপে দেখা দিতেন না, নাট্যশিক্ষাদানও করতেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রখ্যাত অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাগুরু। রাধিকানন্দ সঙ্গীত সমাজের অভিনয়েও ভূমিকাগ্রহণ করেছেন। একথাও অনেকের জানা নেই বোধ হয়, আধুনিক বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগের প্রবর্ত্তক নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীও ছিলেন সঙ্গীত সমাজের সভ্য; কিন্তু কেন যে তিনি ওখানকার মঞ্চে দেখা দেন নি, তার কারণ আমি জানি না। সঙ্গীত সমাজে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মনাশা দলাদলির প্রভাবটা ছিল বেশীমাত্রায়। তার কাছে আশা করবার ছিল অনেক কিছুই এবং সে আমাদের যতটুকু আশা পূর্ণ করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। তার আরম্ভ যেমন স্মরণীয়, তার সমাপ্তি তেমনি নৈরাশ্যজনক।

বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে প্রধান প্রধান যে কয়েকটি সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠান আমাদের জাতীয় নাট্যকলাকে একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, "সঙ্গীত সমাজ" নিশ্চয়ই তাদের উত্তরসাধকের কর্ত্তব্য

পালন করতে পারত ; কারণ সে সম্মিলিত ধনপতিদের অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্য এবং ততোধিক দুর্লভ শীর্ষস্থানীয় বিদ্বজ্জনদের ক্ষুরধার মনীষার সাহায্য একসঙ্গে লাভ করেছিল ;—"সঙ্গীত সমাজে"র পরবর্ত্তী আর কোন বাংলা নাট্য-পরিষদ অদ্যাবধি তেমন সৌভাগ্যের অধিকারী হ'তে পারেনি। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে বললেই চলে। সেইজন্যেই আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে "সঙ্গীত সমাজ" হয়ে রইল "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"র অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মত।

কিন্তু তারপরেও এখানে ব্যাহত হয়নি সৌখীনদের নাট্যানুশীলনের ধারা। এই সময়ের মধ্যে অবৈতনিক রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখা গিয়েছে বালক-যুবা-বৃদ্ধ সকলেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিনয়টা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের ব্যসনের মত। বিয়ের সময়ে তথাকথিত 'প্রীতি-উপহারে'র পদ্য ছাপানোর এবং উৎসবের সময়ে বাদ্যভাণ্ডের কোলাহল শোনানোর মত সম্পন্ন গৃহস্থরা পালেপার্ব্বণে অভিনয়ের আয়োজন করাও প্রায় একটা অবশ্য পালনীয় রীতি ব'লেই মনে করেছেন। বাল্যকালে ও যৌবনে ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে উঠানে সাজানো নড়বড়ে রঙ্গমঞ্চের উপরে কত অভিনয়ই দেখবার সুযোগ বা দুর্য্যোগ হয়েছে। কিন্তু সে-সবের মধ্যে নাট্যকলার প্রতি গভীর অনুরাগের কোন চিহ্নই প্রকাশ পেত না। লোকে যেমন একবার চোখ বুলিয়েই বিয়ের পদ্য ফেলে দেয়, সে সব অভিনয়ের কথাও তেমনি দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ভুলে গিয়েছি।

ভবানীপুরের কয়েকজন নাট্যপ্রিয় ব্যক্তি বাড়ীর উঠানে 'ষ্টেজ' বেঁধে বা ধর্ম্মতলার কোরিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া নিয়ে মাঝে মাঝে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের দ্বারা অভিনীত "প্রতাপাদিত্য", "রাজসিংহ", "রাজা ও রাণী" ও "বিবাহ বিভ্রাট" প্রভৃতি পালা আমি দেখেছি। উল্লেখযোগ্য ব'লে তাঁদের কথা মনে আছে। তাঁদের মধ্যে পরে সাধারণ রঙ্গালয়ে ও চলচ্চিত্রে যথাক্রমে দেখা দিয়েছেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও স্বর্গীয় ধরণী রায় (তাঁর ছোট ভাই স্বর্গীয় ফণী রায়ও একজন সুপরিচিত চিত্রাভিনেতা)। লক্ষ্মীবাবু নামে এক ভদ্রলোক নারী-ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় করতেন, এবং পরে সর্ব্বসাধারণের সামনে দেখা দেন নি এমন কারুর কারুর কথাও স্মরণে আসে। আর্টের ক্ষেত্রে স্মৃতি ভালো জিনিষের নিরিখ বেঁধে দিতে পারে। একবারের পরিচয়ের পরেই শ্রেষ্ঠ কাব্য, শ্রেষ্ঠ চিত্র বা শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের কথা ভোলা যায় না।

তারপর আরো কোন কোন সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় নাম কিনেছিল অল্পবিস্তর। একটি দলের নাম ছিল বোধ করি "ইভনিং ক্লাব"। প্রখ্যাত কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুপরিচিত নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেও চোরবাগানে একটি সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল। সহরের এখানে ওখানে সৌখীন

নাটুয়ারা আরো কোন কোন দল গড়েছিল বটে, কিন্তু নাট্যপ্রবাহে বুদ্বুদের মতই হয়েছিল তাদের উদয় ও বিলয়।

কিন্তু ওদেরই সমসাময়িক দুইটি সৌখীন সম্প্রদায়ের নাম আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমটি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের নাট্য-প্রতিষ্ঠান। পেটে বিদ্যা থাকলে যে নাট্যানুশীলনেও সমধিক উৎকর্ষলাভ করা যায়, পাশ্চাত্য দেশে এই সত্য বারংবার মীমাংসিত হয়েছে এবং ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণও এদেশে ঐ কথাটা বিশেষভাবে প্রমাণিত করেছেন। কয়েকজন বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ওখানকার সুশিক্ষিত যুবকগণ বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যে নাট্য-নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সহরে লোকের মুখে মুখে শোনা যেত তার সুখ্যাতি। নাট্যকলার চর্চ্চাকে নিশ্চয়ই তাঁরা বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম অঙ্গ ব'লে একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন, অধিকাংশের মত সাময়িক খেয়াল ব'লে উড়িয়ে দেন নি, তাই তাঁদের কাছে গিয়ে উচ্চশ্রেণীর রসিকগণও করতেন প্রভূত আনন্দ উপভোগ। ওঁদের সকলেই পরে সাধারণ রঙ্গালয়ের সংস্রবে আসেন নি বটে, কিন্তু ওখান থেকে আগত শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ নাট্যকলাবিদদের নাম আজ আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সুপরিচিত। দ্বিতীয় নাট্য প্রতিষ্ঠানের নাম "ওল্ড ক্লাব"। ওখানে কেবল শিশিরকুমার নন, তাঁর সঙ্গে প্রধান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন পরে সাধারণ রঙ্গালয়ের সর্ব্বসম্মত নাট্যশিল্পী নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও ললিতমোহন লাহিড়ী প্রভৃতি।

বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথমে গঠিত হয়েছিল সৌখীন নাট্যশিল্পীদেরই দ্বারা। আমাদের নাট্যজগৎ বহুকাল পর্য্যন্ত দীপ্তিমান হয়েছিল তাঁদেরই বিশিষ্ট প্রতিভার আলোকে। কিন্তু "চিরস্থির নহে নীর হায় রে জীবন-নদে"। তাঁদের কাল পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "একে একে নিবিল দেউটি।" তাঁদের শিষ্য ও প্রশিষ্যের দল আরো কিছুকাল ধ'রে নাটকীয় কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু যে প্রতিভার দীপ নিবে গিয়েছে, তাঁরা পারলেন না তাকে আবার নতুন ক'রে জ্বালিয়ে তুলতে এবং বাহির থেকে কোন নবীন ও শক্তিধর শিল্পী এসেও তাঁদের দলে যোগদান করলেন না। তাই কুবিখ্যাত হয়ে উঠেছিল গিরীশোত্তর যুগের অভিনয়। সকলেই যখন বাংলা নাট্যজগতের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে চক্ষে দেখছে নীরব অন্ধকার, তখন অত্যন্ত অভাবিত ভাবেই আলোকবর্ত্তিকা বহন ক'রে আনলেন আবার আমাদের আধুনিক সৌখীন শিল্পিগণই—অতীতে ছিলেন তাঁরাই, বর্ত্তমানে আছেন তাঁরাই এবং ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন এখনো তাঁদের পদশব্দ আমরা শুনতে পাইনি।

প্রথম অধ্যায়

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব

এইবার সৌখীন নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা। কিন্তু গোড়াতেই একটি কথা মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ পেশাদার নাট্যশিল্পী নন। তবে তাঁর অনেক অবদান নিয়ে পেশাদার রঙ্গালয়ও উপকৃত হয়েছে। কেবল তাঁর নাটক ও সঙ্গীত নয়, অল্পবিস্তর মাত্রায় তাঁর অভিনয়-পদ্ধতিও স্থানলাভ করেছে আমাদের পেশাদার বা সাধারণ রঙ্গালয়ে।

নাট্যজগতের সঙ্গে প্রায় পাঁচ যুগ ধ'রে ছিল রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি সুদীর্ঘ জীবনে নাট্যচর্চ্চার যে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন, বাংলা দেশের সৌখীন বা পেশাদার আর কোন শিল্পীই তা লাভ করতে পারেন নি। যাঁকে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতর জন্মদাতা বলা হয়, সেই গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলতে পারি। এর একটা কারণও আছে। বাংলা দেশের প্রত্যেক প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী ও নাট্যকারই সত্তর বৎসর পার হবার আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন—কেবল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু ছাড়া।. কিন্তু তাঁরাও পরলোকে গিয়েছেন আশী পূর্ণ হবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় বাংলা দেশের নাট্যশিল্পীরা যথেষ্ট স্বল্পজীবী। য়ুরোপ-আমেরিকায় সত্তর বৎসর পার হয়েছেন এমন সব নাট্যশিল্পীর নামের ফর্দ্দ হবে দীর্ঘ। উপরন্তু সবচেয়ে খ্যাতিমানদের মধ্যে জার্ম্মাণীর গ্যেটে এবং ফ্রান্সের ভলতার ও হিউগো আশীর ওপারে গিয়ে অন্তিম শ্বাস ত্যাগ ক'রেছিলেন। টলষ্টয়ও নাটক রচনা করেছেন এবং তাঁর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চ'লে। ইবসেন ছিলেন আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত নাট্যকার, দীর্ঘজীবী হ'লেও তিনি আশী বৎসর পার হ'তে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর উত্তরসাধক জর্জ্জ বার্ণার্ড স পৃথিবীর মাটির উপরে দাঁড়িয়ে শতাব্দীকাল পূর্ণ করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং হয়তো তাঁর এই প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থাকত না, একশত বৎসরের কাছাকাছি এগিয়ে যদি তাঁকে দৈব-দুর্ঘটনায় পড়তে না হ'ত।

বলেছি, রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন ছিল প্রায় পাঁচযুগ ব্যাপী। কিন্তু আসলে তারও আগে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নাট্যজগতের দিকে। কারণ মাত্র তেরো বৎসর বয়সেই বাংলায় অনুবাদ ক'রে ফেলেছিলেন সমগ্র "ম্যাকবেথ" নাটকখানি। এবং ঐ বৎসরেই

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত "সরোজিনী" ও "স্বপ্নময়ী" নাটকের জন্যে রচিত হয় দুটি গান। তন্মধ্যে "জ্বল্ জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গানটি এতটা লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, তার বহুকাল পরেও আমাদের বাল্যকালে শোনা যেত সকলের মুখে মুখে। সেদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ জানত না যে, ও দুটি হচ্ছে কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনা।

রবীন্দ্রনাথ কেবল ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নন, তাঁর গ্রন্থাবলী ধারে ও ভারে কাটে সমভাবে। বাংলা দেশের যে কোন সাহিত্যিকের চেয়ে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রচনার সংখ্যা বেশী। কিন্তু সেই বিস্ময়কর বিরাট সাহিত্যশ্রমের কথাও ছেড়ে দিয়ে কেবল যদি নাট্যজগতে তাঁর দান-বৈচিত্র্যের কথাই ধরা হয়, তাহ'লেও তিনি যে এ দেশে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন. এ বিষয়েও কোনই সন্দেহ নেই। বরাবরই দেখা গিয়েছে, পৃথিবীর সব দেশেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিরা রঙ্গালয়ের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। প্রাচীন ভারতের কবি কালিদাসের কথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক য়ুরোপের নাট্যপ্রিয় কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখি গ্যেটে, ভলতার, হিউগো, বাইরণ, ডুমা, গোগোল, লর্ড লিটন, টলষ্টয়, ষ্ট্রিণ্ড্বার্গ, শেখভ, অস্কার ওয়াইল্ড, দান্নুনসিয়ো, আন্দ্রীভ ও গোর্কি প্রভৃতিকে—কত আর নাম করব? যাঁরা রঙ্গালয়ের উপযোগী নন তাঁদেরও ঝোঁক হয়েছে নাটক রচনার জন্যে—যেমন স্যামুয়েল জনসন, কিটস্, শেলী, কোলব্রিজ, জোলা, ব্যাল্জাক, দোদে, টেনিসন, সুইনবার্ণ ও ব্রাউনিং প্রভৃতি। এ দেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তই সর্ব্বাগ্রে নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তবে সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেন নি। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভা উদ্বোধিত হয় নাটকরচনার দ্বারাই। নাটক রচনা করবার ইচ্ছা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রেরও, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ করবার অবসর তিনি পান নি। যেখানে এমন সব সাহিত্যিকের প্রাণের টান থাকে নাট্যজগতের জন্যে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বব্যাপী প্রতিভাও যে নাট্যজগতে বিচরণ করবার প্রেরণা লাভ করবে, এটা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নয়।

এবং অন্যান্য বিভাগের মত এ বিভাগেও রবীন্দ্রনাথ কোন দিক দেখতেই বাকি রাখেন নি। শ্রেষ্ঠ প্রতিভার একটা মস্ত লক্ষণ হচ্ছে, যেখানেই সে হাত দেয়, দান করে অঞ্জলি ভ'রে। মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন বেশী দিন স্থায়ী হয় নি; কিন্তু নাট্য-জগতে প্রবেশ ক'রেই তিনি লিখে ফেলেছিলেন নানাশ্রেণীর নাটক, এমন কি প্রহসন পর্য্যন্ত। প্রতিভা হচ্ছে প্রপাতের মত, নির্ঝরিণীর মত ঝিরঝির ক'রে সে ঝরতে চায়

না। রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যেও এই বিশেষত্বের অভাব নেই। কিন্তু তাঁর সর্ব্বত্রগামী প্রতিভা সর্ব্ব বিভাগেই অজস্র দান ক'রে আমাদের মন এমন অভিভূত ক'রে রেখেছে যে, কোন একটিমাত্র বিভাগে দৃষ্টিকে আমরা সহজে সংহত করতে পারি না।

তিনি এক সময়ে রচনা করেছেন পূর্ব্বতন আদর্শের নাটক। আবার তারপর দেখি তাঁকে অতি-আধুনিক নাট্যকারদের জগতেও। গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যরচনার পদ্ধতি আগেও যেমন পরেও প্রায় তেমনই ছিল, আগে এবং পরে তাদের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখি সামান্যই। রবীন্দ্রনাথের লেখনী যুগোপযোগী নূতন নাটককেও প্রসব করেছে, আবার পুরাতনকেও ক'রে তুলেছে নূতন যুগের উপযোগী। যেমন "রাজা ও রাণী" পরিণত হয়েছে "তপতী" রূপে ; এবং তাঁর নাটকীয় রচনায় শ্রেণী বিভাগও কত! বিয়োগান্ত নাটক, মিলনান্ত নাটক, পৌরাণিক নাটক, গার্হস্থ্য নাটক, নাট্যকাব্য, হাস্যনাট্য, গীতিনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য, রূপকনাট্য ও প্রাকৃতিক নাট্য প্রভৃতি। রুশ নাট্যকার লিওনীদ আন্দ্রীভ যাকে "প্যানসাইকি" বা আত্মাশ্রয়ী নাটক বলেছেন, বাংলা দেশে সেই শ্রেণীর নাটকের পর নাটক রচনা করেছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথই। তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটকও দিয়েছেন, আবার দিয়েছেন উচ্চতর শ্রেণীর রঙ্গালয়ে সূক্ষ্মতর অভিনয়ের উপযোগী নাটকও। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সমালোচনা আমরা করব না, দুই-একটি ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে অতঃপর আমরা কেবল দেখবার চেষ্টা করব, নাট্যজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বহুব্যাপক প্রতিভাকে।

সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ তরুণবয়স থেকে প্রাচীনবয়স পর্য্যন্ত নাটকের পর নাটক রচনা করেছেন এবং নিজেও ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন বহু নাট্যানুষ্ঠানেই। একাধারে তিনি ছিলেন নাট্যকার, নট ও নাট্যাচার্য্য। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে বিশিষ্ট নাট্যকলাবিদ হয়েও তিনি কোনদিনই বাংলাদেশের সাধারণ বা বৈতনিক রঙ্গালয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন নি।

পৃথিবীর আর একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ছিলেন জার্ম্মাণীর অদ্বিতীয় কবি গ্যেটে। তিনি স্বদেশী সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করে-ছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের যাজক সমাজ ছিলেন রঙ্গালয়ের উপরে খড়গহস্ত। কিন্তু তা সত্বেও আইরিশ কবি ইয়েটস সেখানকার সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করতে ভীত হন নি। রুশিয়ারও বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক-ধুরন্ধররাও (পুসকিন, লারমণ্টভ, অ্যালেক্সি টলষ্টয়, লিও টলষ্টয়, শেখভ, আন্দ্রীভ ও গোর্কি প্রভৃতি) ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ম্মী। কিন্তু ও-সব দেশের অভিনেত্রীরা ভদ্রমহিলার সম্মান

থেকে বঞ্চিত নন, তাই ওখানকার সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংস্রব রাখলে কারুকে জাতিচ্যুত জীব ব'লে ঘৃণা করা হ'ত না—এদেশে যা করা হয়। সেকালের বাংলাদেশে পতিতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত রঙ্গালয়ে কর্ম্মী হবার জন্যে সাহস প্রকাশ ক'রেছিলেন মাত্র দুইজন কবি—মাইকেল মধুসূদন ও রাজকৃষ্ণ রায়। কবি মনোমোহন বসু, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিখ্যাত "মহিলা" কাব্যপ্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতির দ্বারা রচিত নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেখানে তাঁরাও ব্যক্তি-গতভাবে হাজির হয়ে হাতে-নাতে কোন কাজই করেন নি।

বাংলাদেশে তখন সাহিত্যসমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিও যে নাট্যকলানুরাগী ছিলেন, এমন প্রমাণের অভাব নেই। যখন এখানে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং গিরীশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি সবে যোগ দিয়েছেন অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ে, তখনই বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সাহিত্যিকরা চুঁচূড়ায় সৌখীন নাট্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের একটি উক্তি থেকে বোঝা যায়, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন প্রধান অনুষ্ঠাতা। তারপর সাধারণ রঙ্গালয় জন্মলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) এখানে আরম্ভ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের নাট্য-রূপদানের রেওয়াজ। ধরতে গেলে বাংলা রঙ্গালয়কে তখন বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রধানতঃ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা। দীনবন্ধু এখন পুরাতন হয়ে গিয়েছেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রেওয়াজ আজও লুপ্ত হয়নি, কারণ একালেও দেখতে পাচ্ছি সাধারণ রঙ্গালয়ে ও ছবির পর্দ্দায় তাঁর একাধিক উপন্যাসের নূতন নূতন নাট্যরূপ ও চিত্ররূপ। পরিণত বয়সেও বঙ্কিমচন্দ্রের ঝোঁক ছিল নাটকের দিকে; কারণ প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কাছে তিনি এই মর্ম্মে ব'লেছিলেন যে—থিয়েটারে আমার উপন্যাসগুলির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকছে না; ইচ্ছা আছে নিজের উপন্যাসকে আমি নিজেই নাটকে পরিণত করব। কিন্তু অকালমৃত্যু বা অন্য যে কারণের জন্যেই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন নি এবং পারলেও তিনি যে সাধারণ রঙ্গালয়ের আসরে এসে প্রধান বা অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তারূপে যোগদান করতেন, এ কথা মনে করবার কারণ নেই।

অগ্রবর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্য যা করেন নি এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার ও ঠাকুর-বাড়ীর সৌখীন সম্প্রদায়ের নাট্যাচার্য্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথও যা করতে চান নি, একই পরিস্থিতির মধ্যে লালিতপালিত হয়ে তদীয় অনুজ ও নাট্যকলাচর্চ্চায় শিষ্যস্থানীয় রবীন্দ্র-নাথ যে সেই কাজ করতে অগ্রসর হবেন, এতটা আশা করা সমীচীন নয়। তবে তাঁর অগ্রবর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্য ও অগ্রজ যা করেন নি, সে কাজ করতে রবীন্দ্রনাথ পশ্চাদ্বর্ত্তী

হন নি। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হয়েও তিনি ছিলেন না ছুতমার্গের যাত্রী। কোন রঙ্গালয় পতিতাদের দ্বারা অধ্যুষিত হ'লেই যে অস্পৃশ্য হয়ে পড়ে, নিশ্চয়ই তাঁর এমন ধারণা ছিল না। একথা বোধ করি অনেকেই জানেন না যে, বিডন ষ্ট্রীটের সাধারণ রঙ্গালয়ে বাড়ীর মেয়ে-পুরুষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করতে ইতস্ততঃ করেন নি।

ষ্টার থিয়েটার তখন ছিল বিডন ষ্ট্রীটে। সেই রঙ্গালয়ই যথাক্রমে এমারেল্ড থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনূর থিয়েটার, মনোমোহন থিয়েটার ও মনোমোহন নাট্যমন্দির নামধারণ করবার পর "ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের" কবলে প'ড়ে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঐখানেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজকে অর্থসাহায্য করবার জন্যে টিকিট বেচে (সেই সর্ব্বপ্রথম) "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয় দেখান। বাল্মীকি ও সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ও অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা দেবী। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছাব্বিশ বৎসর। কিন্তু সহরের উত্তরাঞ্চলে সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্র-সম্প্রদায়ের অভিনয় সেই প্রথম এবং সেই শেষ। এর একমাত্র কারণ হ'তে পারে এই: তারপর থেকে প্রত্যেক বাংলা রঙ্গালয়ে অসংখ্য নাটক-নাটিকায় দেখা যেত ব্রাহ্মদের ও আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে লক্ষ্য ক'রে অত্যন্ত ইতর ভাষায় গালাগালি ও রঙ্গব্যঙ্গ, এইজন্যেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই কাছে তা হয়ে উঠেছিল অগম্য স্থান। পরে মধ্য-কলকাতার আলফ্রেড থিয়েটারেও দেখা গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যানুষ্ঠান। সেখানেও পতিতারা অভিনয় করত বটে, কিন্তু তথাকথিত কুরুচিপূর্ণ ও প্রায়-অশ্লীল ব্যঙ্গনাটকের অভিনয় দেখানো হ'ত না এবং সেই কারণেই সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্ব্বিচারে সেখানে আসন গ্রহণ করতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হ'তেন না।

জার্ম্মাণ কবি গ্যেটে এবং আইরিশ কবি ইয়েটস্-এর মত রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সরাসরি ভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ের আসরে আসীন হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি: এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ব্বেই। কিন্তু কথাটা নিয়ে আরো একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন নাটক অপেক্ষাকৃত লোকপ্রিয় হ'লেও, তার মুখাপেক্ষী হয়ে তিনি যে একখানি নাটকও রচনা করেননি, সে কথা সকলেই জানেন। এই কারণে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয় সম্বন্ধে বহুল আলোচনা ক'রে যাঁরা তালেবর হ'তে চান, তাঁদের অনেকেই আমাদের নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের চিরস্মরণীয় অবদানকে কতকটা কোণঠাসা ক'রে রাখবার চেষ্টা করেছেন ব'লে মনে হয়। সত্য বটে, নাট্যকলাদক্ষ রবীন্দ্রনাথ সৌখীনদের সমাজ ছেড়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের

আসরে হাজিরা দিতে রাজি হননি। কিন্তু তার ফলে আমরা কি আর একদিক দিয়ে লাভবান হইনি?

ইংরেজীতে অভিনেয় নাটককে বলে Play এবং সাধারণ নাটকের নাম Drama এবং এই দুই শ্রেণীর রচনাকারের নাম যথাক্রমে Playwright ও Dramatist। প্রথমোক্ত লেখক রঙ্গালয়ের সুবিধা-অসুবিধা ও চাহিদার কথা মনে রেখে পালা রচনা করেন। এই শ্রেণীর নাট্যকারদের সম্বন্ধে স্বয়ং গিরীশচন্দ্র বলেছেন: "সাধারণ রঙ্গমঞ্চে—ব্যবসায়ের খাতিরে—রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী দেখে নাটক রচনা করতে হয়। * * * নাট্যকারের শুধু কল্পনায় বিভোর হয়ে নাটক লিখলে হবে না—রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের study করা চাই। রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা পরিচ্ছদ দৃশ্যপট আর লোকের রুচি দেখে নাটক রচনা করতে হয়।" শেষোক্ত লেখক সম্পূর্ণরূপে নিরঙ্কুশ। নাটক রচনার সময়ে তিনি নিজের কল্পনারাজ্যেই বিচরণ করেন, রঙ্গালয়ের কোন তাগিদই আমলে আনেন না। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর নাট্যকার হচ্ছেন গিরীশচন্দ্র এবং একথা তিনি নিজের মুখেই স্বীকার ক'রে গিয়েছেন: "সত্যি বলছি আমার dramatist হবার কোনও কালে ambition ছিল না। * * * ষ্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিললো না, তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হ'ল।" রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন শেষোক্ত শ্রেণীর নাট্যকার। তাঁদের দু'জনকে যথাক্রমে Playwright ও Dramatist ব'লে ডাকা যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের পার্থক্য বোঝাবার জন্যে বাংলায় আলাদা নাম নেই। তাই ঐ দুই শ্রেণীর নাটকলেখককেই এক নাট্যকার নামেই ডাকতে হয়।

বাংলাভাষার অধিকাংশ নাটকই হচ্ছে "প্লে"। এখানে যাঁরা নিছক "ড্রামা" রচনার জন্যে উৎসাহপ্রকাশ করেছেন তাঁদের সংখ্যা অঙ্গুলাগ্রে গণনীয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেশে যখন বাংলা থিয়েটারের অস্তিত্বই ছিল না, তখন তারাচাঁদ শিকদার, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ লেখকগণ কয়েকখানি ড্রামা রচনার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে সে সব চেষ্টা সফল হয়নি। ঐ যুগের নাটকীয় চেষ্টার মধ্যে কতকটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নন্দকুমার রায়ের "অভিজ্ঞান শকুন্তলা"; প্রকাশিত হবার পরে তা সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের দ্বারা মঞ্চস্থও হয়েছিল। কিন্তু সেখানি সৌখীন রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক হ'লেও মৌলিক রচনা নয়, অনুবাদ মাত্র।

তারপরে বাংলাদেশে সুরু হয় সৌখীন নাট্যাভিনয়ের মহোৎসব। লেখনী ধারণ করলেন যথাক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বসু প্রভৃতি। কিন্তু ওঁদের মধ্যে একমাত্র দীনবন্ধু মিত্র ছাড়া আর সকলেই

Playwright ছিলেন। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক হচ্ছে "নীলদর্পণ"। পুস্তকাকারে তার প্রকাশকাল হচ্ছে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ। সাধারণ বা অসাধারণ কোন নাট্যশালাতেই অভিনীত হবার জন্যে তা লিখিত হয়নি। প্রায় এক যুগ পরে "নীলদর্পণ" নিয়েই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলিত হয়। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকও কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাবার জন্যে রচিত হয়নি। সেগুলি প্রথম প্রকাশিত ও রচিত হয়েছিল পাঠ্য পুস্তকের মত, তারপর গৃহীত ও অভিনীত হয়েছিল বিভিন্ন নাট্যশালায়। সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশে যাঁদের লিখিত মৌলিক নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে Dramatist ব'লে অভিনন্দন লাভ করতে পারেন দীনবন্ধু মিত্রই। কোনদিনই তিনি গিরিশচন্দ্রের বা আর কারুর মত দায়ে প'ড়ে বা বিশেষ নাট্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা উপরুদ্ধ হয়ে নাটক রচনা করেননি। আমাদের নাট্যসমালোচকরা তাবৎ বাঙালী নাট্যকারদের নিয়ে মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করেছেন প্রভূত পরিমাণেই, কিন্তু দীনবন্ধুর এই বিশেষত্বের দিকে কারুরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। হয়তো তার কারণেরও অভাব নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ Playwright ও Dramatist-এর মধ্যগত পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন না। এবং এই অভিযোগ যে অমূলক নয়, কিছু দিন আগে জনৈক নামজাদা নাট্যসমালোচক কাগজে-কলমে প্রমাণিত করতেও বাকি রাখেন নি। কোন সভায় নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার আলোচনাপ্রসঙ্গে গিরীশচন্দ্রকে Playwright ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ গিরীশচন্দ্রকে খাটো করা হয়েছে ভেবে সমালোচক-মহাশয়ের দ্বিতীয় রিপু অতিশয় প্রবল হয়ে ওঠে এবং যৎপরোনাস্তি গালিগালাজ দিয়ে প্রতিবাদ করেন। অথচ বাংলার আধুনিক নাট্যসাহিত্যের জন্ম যে দেশের অনুপ্রেরণায় সেই ইংলণ্ডেও সেকেলে সেক্সপিয়রকে এবং একেলে বার্ণার্ড স-কে Playwright ব'লে বর্ণনা করলে চায়ের পেয়ালায় ওঠে না তুমুল তরঙ্গ।

উপরোক্ত পটভূমিকার সামনে স্থাপন ক'রেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে হবে। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ"-এর পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম ড্রামা "রাজা ও রাণী"—মাঝে কেটে গিয়েছে দুই যুগেরও বেশী কাল। দীনবন্ধুর পর আর একজন Dramatist-কে লাভ করবার জন্যে বাঙালীকে এতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল! কিছু দিন বাদে "রাজা ও রাণী" প্রথমে সৌখীন ও পরে সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন নাট্যসম্প্রদায়ের মুখ তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথ নাটকখানি রচনা করেননি।

বলেছি, দীনবন্ধুর পর রবীন্দ্রনাথের ড্রামাকে লাভ করবার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল দুই যুগেরও বেশী কাল। তার কারণ কবিরা যেমন প্রেরণা এলেই

আর কিছুর তোয়াক্কা না রেখে কবিতা রচনায় নিযুক্ত হন, সাধারণ নাট্যকারদের মনে বোধ করি তেমন ইচ্ছা জাগ্রত হয় না। নাটক রচনা করলে তা অভিনীত হবার সুযোগ না থাকলে রুদ্ধ হয় তাঁদের লেখনীর গতি। অভিনীত হবার সম্ভাবনা ছিল ব'লেই বিশেষ বিশেষ নাট্যসম্প্রদায়ের জন্যে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন দত্ত ও মনোমোহন বসু প্রমুখ লেখকগণ। এই জন্যেই তাঁরা Playwright আখ্যা লাভ করতে পারেন।

কিন্তু দীনবন্ধু যে কোন নাট্যসম্প্রদায়ের তাগিদে লেখনী ধারণ করেছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথও কোন রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি সাহিত্যিক। সাহিত্যরসিকরা উপভোগ করবেন ব'লেই তিনি অন্যান্য রচনার—কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের মত "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জন" প্রভৃতি নাটকও রচনা করেছিলেন। রঙ্গমঞ্চের উপযোগী কলাকৌশল নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তাঁর ছিল না। কারণ কবি হচ্ছেন নিরঙ্কুশ, তাই তাঁর রচনাকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী হ'তে হয় না, তাঁর রচনার উপযোগী হ'তে হয় রঙ্গমঞ্চকেই।

Drama ও Playর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এইখানেই। একটু ভালো ক'রে ভাবলেই বোঝা যায়, এক হিসাবে Dramatist-এর চেয়ে Playwright-এর কর্ত্তব্য হচ্ছে কঠিনতর। গিরীশচন্দ্র বলেছেন "Playwright শুধু কল্পনায় বিভোর হয়ে নাটক লিখলে হবে না,—রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীদের study করা চাই—রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা পরিচ্ছদ দৃশ্যপট—আর লোকের রুচি দেখে নাটক রচনা করতে হয়। এই সব ঠিক ঠিক হ'লে তবে নাটক ষ্টেজে জমবে।" যা খুসি তাই লিখে যাওয়া সোজা। কিন্তু কাব্য হিসাবে তা মর্য্যাদা পেলেও রঙ্গমঞ্চের উপরে তাকে নগণ্য ব'লেই মনে করা হবে। আবার আর এক দিক দিয়ে দেখি, যে সব মঞ্চ-নাটক রীতিমত বিখ্যাত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যসমাজে তার প্রবেশাধিকার নেই। যেমন, অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জুন" ও যোগেশচন্দ্রের "সীতা" প্রভৃতি। আবার যাঁরা কেবল পাঠক (এবং তাঁরাই হচ্ছেন দলে ভারি), মঞ্চ-নাটক যে তাঁদের পরিপূর্ণ আনন্দ দান করতে পারে না, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এমন কি গিরীশচন্দ্রেরও নাটকাবলী মঞ্চের উপরে যতটা জমে, পাঠ করবার সময়ে তাদের গুণ ততটা বোঝা যায় না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

নিজের রচনার এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে স্বয়ং গিরীশচন্দ্রও অচেতন ছিলেন না। তিনি বলেছেন: "ব্যবসায় কৃতকার্য্য না হ'লে আমার হাত-পা বাঁধা। * * বেশীর ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে, গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়।" তাঁর

এ কথার উপরে আর কথা নেই। তাঁকে আক্ষেপ করতেও শুনি, তাঁর মাথার ভিতরে যা আছে, দেশের লোকের উদাসীনতার জন্যে ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তা দান ক'রে যেতে পারলেন না। শিল্পীর পক্ষে এ যে কত বড় মর্ম্মবেদনা, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না।

যিনি Dramatist অর্থাৎ যিনি মঞ্চ-নাটকের কারবারী নন, এ সব দুঃখ তাঁকে ভোগ করতে হয় না। রবীন্দ্রনাথকে কেউ কোন দিন আক্ষেপ করতে শোনে নি যে, মনের কথা রচনায় প্রকাশ করবার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। তার ফলে সাধারণ রঙ্গালয় তাঁকে মন খুলে অভিনন্দন দিতে না চাইলেও পাঠকরা পরিপূর্ণভাবে লাভ করেছে তাঁর প্রতিভার অপূর্ব্ব প্রসাদ। তাঁর নাটকাবলীর পাত্রপাত্রীদের আমরা উজ্জ্বল ভাবে দেখতে পাই আমাদের মানস-নাট্যশালায়, সেখানে গ্যালারী হাততালি ও শিস দিয়ে গোলমাল করে না, শুনতে পাই এমন সব সাহিত্যরসপূর্ণ বিচিত্র ভাষণ, মুহুর্মুহুঃ অনুভব করি সর্ব্বব্যাপিনী কল্পনার এমন অনাহত লীলা যে চিত্ত অভিভূত হয়ে যায় বিস্ময়ে এবং ঐশ্বর্য্যে। খতিয়ান করলে বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ মঞ্চ-নাট্যকার হন নি ব'লে আর এক দিক দিয়ে আমরা হয়েছি যথেষ্ট লাভবান। মঞ্চ-নাটকের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা ভাবুকের মনকে সঙ্কুচিত না ক'রে তিনি তাকে বিছিয়ে দিয়েছেন জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে, ত্রিভুবনে।

রবীন্দ্রনাথ কবি, কাব্য তাঁর ধর্ম্ম। তাই কেবল কাব্যে নয়, গদ্যেও তিনি যা কিছু রচনা করেছেন তার সর্ব্বত্রই আছে কাব্যরসের উৎসব। সেই কারণে নাটক রচনার সময়েও তিনি নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারেন নি—মঞ্চনাট্যকারকে পদে পদে যা করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে আগেই আমরা আইরিশ কবি ইয়েটসের কথা উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও "নোবেল প্রাইজ" লাভ করেছিলেন এবং ওদেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়সাধন ক'রে দেবার সময়েও তিনি ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোগী। গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে জাতীয় রঙ্গালয় ছিল না। ইয়েটস্ স্বদেশের এই অভাব দূর করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হন। তিনি কেবল কবি নন, রবীন্দ্রনাথের মত কবিত্বপূর্ণ নাটকও রচনা করতেন। রঙ্গালয়েও তিনি চাইতেন সাহিত্যরস, তাই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যে রঙ্গালয় স্থাপন করলেন তার নাম দিলেন "আইরিশ সাহিত্যিক রঙ্গালয়"। কেবল আমাদের রবীন্দ্রনাথের উপরে নয়, ইয়েটসেরও উপরে পড়েছিল বেলজিয়ান কবি-নাট্যকার মেটারলিঙ্কের প্রভাব, তাই তিনি রঙ্গালয়কেও ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন কবির স্বর্গ। কিন্তু তাঁর বন্ধুবান্ধবরা হলেন প্রতিবন্ধক এবং কিছুকাল পরে রঙ্গালয়ের নতুন নামকরণ হ'ল "অ্যাবি থিয়েটার"। জনসাধারণের আদর্শের সঙ্গে

কবির আদর্শ কোন দিনই খাপ খায় না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সাধারণ রঙ্গালয়কে সুদূরে পরিহার ক'রে চলেছেন, তাই গিরীশচন্দ্র ও ইয়েটসের মত তাঁকেও আশাভঙ্গের মনস্তাপ সহ্য করতে হয় নি ; নিজের নাটকীয় রচনায় সার্থক ক'রে তুলতে পেরেছিলেন কবির স্বপ্নকে।

নাটক অভিনীত না হ'লে মঞ্চনাট্যকার যে নিজের রচনা ব্যর্থ হ'ল ব'লে দুঃখিত হন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না। ঔপন্যাসিক তাঁর রচনাকে কেবল পাঠোপযোগী করবার জন্যেই চেষ্টিত হন। কিন্তু মঞ্চনাট্যকারের দৃষ্টি থাকে রচনাকে অভিনয়োপযোগী ক'রে তোলবার জন্যে ; তাই নাটকের সংলাপ রচনার সময়ে তিনি যতটা সম্ভব সাধারণ কথোপকথনের ভাষার দিকেই দৃষ্টি রাখতে চান এবং সেইজন্যেই কথিত না হ'য়ে পঠিত হ'লে অধিকাংশ মঞ্চনাটকই পাঠককে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না, উপরন্তু সেই কারণেই পাঠ্য পুস্তক হিসাবে উপন্যাসের চেয়ে মঞ্চ-নাটকের চাহিদা হয় কম। বাজারে অনেক মঞ্চনাটকের কাটতি আছে যথেষ্ট, কিন্তু মঞ্চস্থ না হ'লে সেটা সম্ভবপর হ'ত না। বইয়ের দোকানে খোঁজ নিলে দেখবেন, গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মত প্রখ্যাত নাট্যকারদেরও যে সব নাটক মঞ্চে ভালো জমেনি, সেগুলির চাহিদাও হয়েছে অল্প।

আবার একথাও সত্য যে, সাধারণ নাট্যকার বা Dramatistও, নিজের রচনাকে মঞ্চের উপরে দেখতে পেলে আনন্দ লাভ করেন। রচনার সময়ে তিনি মঞ্চের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেন না বটে, কিন্তু তা অভিনীত হ'লেও হ'তে পারে, মনের মধ্যে এমন বিশ্বাস না থাকলে তিনি নিজের রচনাকে নাটকের আকার দান করতেন না। দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কোন নাট্যসম্প্রদায়েরই মুখ না তাকিয়ে "সধবার একাদশী" রচনা করেন এবং মুদ্রিত পুস্তকের আকারে বাজারে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেই নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্যে যখন গিরীশ-অর্দ্ধেন্দু প্রমুখ সৌখীন অভিনেতারা প্রস্তুত হন, তখন নাট্যকারের সঙ্গে তাঁদের কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল ব'লে প্রমাণ নেই। এমন কি নাট্যাভিনয়ের প্রথম তিন রাত্রেও বোধ হয় নাট্যকারকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। কারণ দীনবন্ধু নিজের নাটকের প্রথম অভিনয় দেখবার সুযোগ পান চতুর্থ রাত্রে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমীর দিন)। আগেই বলেছি, "সধবার একাদশী" নাটকাকারে রচিত হ'লেও মঞ্চের জন্যে লিখিত হয় নি এবং তা যে অভিনীত হ'তে পারে, সম্ভবতঃ নাট্যকারের মনে এমন ধারণাও ছিল না, কারণ গিরীশচন্দ্রকে ডেকে দীনবন্ধু বলেছিলেন : "তুমি না থাকলে এ নাটকের অভিনয় হ'ত না।" সুতরাং নিজের নাটকের এমন সফল অভিনয় দেখে দীনবন্ধু যে

যারপরনাই খুসি হয়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর সব চেয়ে ভালো লেগেছিল গিরীশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়। গিরীশচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন, "নিমচাঁদ লেখা হয়েছিল তোমার জন্যেই।" এই অভিনয়ের পর নাট্যকার ও প্রধান নট দুজনেই উপলব্ধি করলেন একটি বিশেষ সত্য কথা। দীনবন্ধু বুঝতে পারলেন, মঞ্চে তাঁর নাটকেরও অভিনয় সম্ভবপর ; এবং গিরীশচন্দ্রও বুঝতে পারলেন, তিনি একজন সার্থক অভিনেতা। গিরীশচন্দ্র পরলোকগমনের পর "বেঙ্গলী" পত্রিকা মত প্রকাশ করেছিল : About forty-five years ago Girish Chandra appeared in the inimitable role of Nimchand in Dinobandhu's "Shadhabar Ekadasi" and when he awoke next morning he found himself an actor." এ কথা বড়ই যথার্থ।

দীনবন্ধুর "লীলাবতী" নাটক রচিত হয়েছিল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। তখনও দীনবন্ধু জানতেন না যে, তাঁর কোন নাটক মঞ্চনাট্যে পরিণত হ'তে পারে। "সধবার একাদশী"র অভিনয় দেখেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁর সেই সন্দেহ দূর হয়। গিরীশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশ-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "সধবার একাদশীর অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া দীনবন্ধুবাবু উক্ত সম্প্রদায়কে অতঃপর "লীলাবতী" অভিনয় করিতে বলেন। গিরিশবাবুর প্রস্তাবানুসারে সম্প্রদায় লীলাবতীর রিহারস্যাল দিতে আরম্ভ করিলেন।" কিন্তু সম্প্রদায়ের দক্ষতা সম্বন্ধে দীনবন্ধু আদৌ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কারণ গিরীশচন্দ্রের নিজের মুখেই প্রকাশ পেয়েছে : অর্দ্ধেন্দুশেখরকে তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি ব'লে দিয়েছিলেন, "তোমরা লীলাবতী"র অভিনয় করতে পারবে না।" ফলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জিদ আরো বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে (১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে) চুঁচুড়ায় একটি নাট্যসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথমে "লীলাবতী" মঞ্চস্থ করে। সেই সম্প্রদায়ের শিক্ষক ছিলেন সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। "লীলাবতী" মঞ্চের জন্যে লিখিত হয়নি, তাকে অভিনয়োপযোগী করবার জন্যে কিছু কিছু বাদ দিতে ও পরিবর্ত্তিত করতে হয় এবং সে ভার গ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। কিন্তু সে অভিনয়ও নাট্যকারকে খুব খুসি করতে পেরেছিল ব'লে মনে হয় না। তারপরেই গিরীশ-অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি চুঁচুড়ার দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে "লীলাবতী"কে মঞ্চস্থ করলেন। বাগবাজারের যে কয়জন খ্যাতিহীন নবীন যুবকের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে তিনি মনে মনে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, এখন তাঁদের অভাবিত দক্ষতা দেখে চমৎকৃত হয়ে দীনবন্ধু উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠলেন, "তোমাদের অভিনয়ের সঙ্গে যে চুঁচুড়ার দলের তুলনাই হয় না,—আমি পত্র লিখব—দুয়ো বঙ্কিম।" এখানে উল্লেখযোগ্য, গিরীশচন্দ্ররা অবলম্বন করেছিলেন হুবহু ভাবে লিখিত নাটককেই।

রঙ্গমঞ্চ ও সাধারণ নাটক নিয়ে এত কথা বললুম, ঐ দুই শ্রেণীর নাটকের পার্থক্য বোঝাবার জন্যে। এই তফাৎটুকু মনে রাখলেই আমাদের বক্তব্য সহজ হয়ে আসবে। রবীন্দ্রনাথও মঞ্চনাট্যকার ছিলেন না, তিনিও পাঠকদের মানস-নাট্যশালার উপযোগী সুখ-পাঠ্য নাটকই রচনা করতেন—যদিও যুগধর্মের মহিমায় দীনবন্ধু ও তাঁর নাটকাবলীর মধ্যে পৃথকত্ব ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে, মঞ্চনাটক রচনায় অভ্যস্ত না হ'লেও তাঁর নাটকাবলী যে অভিনয়ের উপযোগী নয় এটুকু রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই মনে করেন নি, তাই সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর কোন নাটক মঞ্চস্থ হবার আগেই তিনি নিজেই বারংবার স্বরচিত নাটকাবলীর অভিনয়ের আয়োজন করেন।

কবিত্ব যদি প্রভুত্ব লাভ করে, মঞ্চনাটকের পঞ্চত্ব লাভের পথ হয় প্রশস্ত। ভাবুকতার খাতিরেও এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। কবিত্বের মাধুর্যে ভরা কালিদাসের রচনাসম্ভার। কিন্তু জানতে হবে প্রথমতঃ, সাধারণ মঞ্চাভিনয়ের জন্যেই কি কালিদাস লেখনী ধারণ করেছিলেন? এবং দ্বিতীয়তঃ, সে যুগের ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল না কি অধিকতর অসাধারণ? তার পর ওঠে সেক্সপিয়ারের কথা। তিনিও সুযোগ পেলেই নাটকে কবিত্ব ছড়িয়ে যেতে ছাড়েন নি এবং বহু যুগের এপারে এসেও মানুষ তার প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ। কিন্তু এখানে ও-সব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে পুঁথির বাহুল্য হবে অত্যন্ত; অতএব কাজের সুবিধার জন্যে তাঁকে আমরা ব্যতিক্রম ব'লেই ধ'রে নিতে পারি।

ঠিক কোন্ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে না, বার্ণার্ড স পর্য্যন্ত মঞ্চনাটকে সাহিত্যরসের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন। সাদাসিধা কথ্য ভাষা মঞ্চনাটককে অধিকতর প্রাণময় ক'রে তোলে। বাংলাদেশে তার প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায় গিরীশচন্দ্রের নাটকগুলি দেখলে। গিরীশচন্দ্র ছিলেন কবি। নাটক লেখবার আগেও তিনি করতেন কবিতা রচনা। সুতরাং কাব্যরসের মাধ্যমে তিনি যে নাট্যরস পরিবেশন করতে পারতেন না, এতটা মনে করবার কারণ নেই। কিন্তু মঞ্চ-নাট্যজগতে প্রবেশ ক'রে কোথাও তিনি অসাময়িক কবিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করেন নি।

আধুনিক যুগে কবিত্বের ভিতর দিয়ে নাটকত্ব জাহির ক'রে সবচেয়ে বেশী নাম কিনেছেন বেলজিয়মের কবিনাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্ক। ইউরোপ-আমেরিকার বহু আধুনিক নাট্যকারের উপরে পড়েছে তাঁর অল্পবিস্তর প্রভাব। তাঁর কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়ে রুশিয়ার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিওনিদ আন্দ্রীভ "প্যান-সাইকি" বা আত্মাশ্রয়ী নাটকাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন। আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস্ একজন প্রখ্যাত কবি এবং মেটারলিঙ্কের প্রভাবমণ্ডলের ভিতরে গিয়ে তিনিও নাটক রচনার সময়ে কবিত্বরস পরিহার করতে পারেন নি। আগেই বলা হয়েছে, কবিত্বপূর্ণ নাটক অভিনয়ের জন্যে তিনি যে নাট্যশালা স্থাপন করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন "আইরিশ সাহিত্যিক রঙ্গালয়"। কিন্তু এ শ্রেণীর রঙ্গালয় সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয় বুঝে তাঁর সহকর্ম্মী বন্ধুরা ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন "আবি থিয়েটার"। সত্যকথা বলতে কি, মেটারলিঙ্ক, আন্দ্রীভ ও ইয়েটস্ প্রভৃতি যে শ্রেণীর নাটক রচনা ক'রে গিয়েছেন, তা সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযোগী নয়। ইউরোপে তাদের আদর হয়েছে প্রধানতঃ বাছা বাছা রসিকদের সভায়। ইউরোপের নাট্যপ্রিয় জনসাধারণের রুচি ও মানসিক অবস্থা আমাদের চেয়ে যে যথেষ্ট উন্নত, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই; সুতরাং কালাপানির ওপারেও যা সম্ভবপর হয়নি, এই গঙ্গানদীর দেশে তার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা না থাকাই স্বাভাবিক।

মেটারলিঙ্ক ও ইয়েটস্ও নোবেল প্রাইজের অধিকারী হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মত। কিন্তু কেবল সাহিত্যিক হিসাবে নয়, কবি হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হচ্ছে উচ্চতর শ্রেণীর। তাঁর নাট্য-রচনার সংখ্যাও ওঁদের দুজনের চেয়ে বেশী। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন সমালোচক নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে "Eastern equivalent of Maeterlinck" ব'লে মনে করেন। এই মতে উনোক্তি আছে ব'লে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানোদয়ের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একান্তভাবেই কাব্যসাধনা ক'রে গিয়েছেন—কবিতা ছিল তাঁর প্রাণবায়ুর মত। সুতরাং নাট্যরচনার সময়েও তিনি যে কবিতাকে ভুলতে পারেন নি, এর মধ্যে বিস্ময়ের অবকাশ নেই। প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে সর্ব্বত্রই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়েছে তাঁর কবিত্বস্রোত। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছেন তাঁরাই জানেন, বৈঠকী আলাপের সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথ্য ভাষাও প্রকাশ করত কতখানি কবিত্ব। সুতরাং তাঁকে "প্রাচ্যের মেটারলিঙ্ক" ব'লে পরিচিত করলে তাঁর গৌরববর্দ্ধন করা হয় না। আমরা বড় জোর বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের জীবনের উত্তরার্দ্ধে রচিত কোন কোন নাটকের মধ্যে দেখা যায় মেটারলিঙ্কের দ্বারা অনুসৃত পদ্ধতি। হ্যাঁ, কেবল পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ ও-সব নাটকের পরিকল্পনা, আদর্শ এবং পাত্র ও পাত্রীর উপরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুরই কিছুমাত্র দাবীদাওয়া নেই।

এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও দ্বিতীয় নাটক হচ্ছে "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জ্জন" (রচনাকাল যথাক্রমে ১২৯৬ ও ১২৯৭ সাল)। মেটারলিঙ্ক তখনও নাট্যজগতে

আত্মপ্রকাশ করেন নি, এমন কি কাব্যজগতেও নয়—যদিও বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এক বৎসরের ছোট ছিলেন। ঐ দুইখানি নাটকেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তারপরে নাটক রচনার সময়ে নিজের কবিত্বকে ক্রমে ক্রমে সংযত ও সংহত ক'রে আনলেও তিনি কাব্যের রসরূপকে কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। এই কারণেই তাঁর নাট্যরচনার মধ্যে মঞ্চনাটকের বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং এই কারণেই তাঁর অধিকাংশ নাটকই সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের উপযোগী হয় না। তাঁর এই শ্রেণীর কোন কোন নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে বটে, কিন্তু বাঙালী দর্শকদের পক্ষে তা হয়েছিল গুরুপাকের মত।

কিন্তু আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে বার বার অভিনীত হয়েছে "রাজা ও রাণী"। কারণ তার মধ্যে ছিল পুরাতন যুগের সহজ নাটকত্ব এবং মেলোড্রামাটিক ঘটনার ধারা, যার প্রভাবে গ্যালারির দর্শকরাও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্পদকেও বিপজ্জনক ব'লে মনে করে নি। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে "রাজা ও রাণী" পরিবর্ত্তিত হয়ে যখন "তপতী"র রূপধারণ করলে, তখন শিশিরকুমারের অতুলনীয় প্রতিভাও তাকে অকালমৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে নি। "বিসর্জ্জন"-এর মধ্যেও ছিল জনপ্রিয়তার প্রভূত উপাদান, কিন্তু তার প্রতিমা বিসর্জ্জনের দৃশ্য দেখে পাছে গোঁড়া হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে, সেই ভয়ে বাংলা রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ তাকে মঞ্চস্থ করতে অগ্রসর হন নি।

রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের চাহিদা বুঝে নাটক-রচনা করতেন না, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্দ্ধশতাব্দী আগে তিনি যখন "বঙ্গদর্শনে"র (নব পর্য্যায়) সম্পাদক তখনই লিখেছিলেন: "সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারো অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময়ে আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি—সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য্য খোলে না সে কাব্য কোন কবিকে যশস্বী করে নাই। * * * স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাদিকে খর্ব্ব করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে,—আমার যদি অভিনয় হয়ত হউক, না হয়ত অভিনয়ের পোড়া কপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই।"

যে নাটক বিশেষ ভাবে মঞ্চের মুখাপেক্ষী, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিরাগ ছিল এবং তাকে তিনি কোনদিনই প্রশংসা করতে পারতেন না। আমার বিশ্বাস, কবিবর ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার উৎপত্তি

ঐখানেই। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ যতদিন ইহলোকে বর্ত্তমান ছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন কোন শক্তিধরের আত্মপ্রকাশ দেখলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে কাগজে-কলমে অভিনন্দন দান করতেন। এটা ছিল যেন তাঁর অন্যতম সাহিত্যিক কর্ত্তব্য। একেবারে শেষ বয়সেও পরশুরাম বা শ্রীরাজশেখর বসুর আকস্মিক ও অভাবিত আবির্ভাব দেখে তিনি সাগ্রহে ও সানন্দে স্বেচ্ছায় ঐ কর্ত্তব্য পালন ক'রে গিয়েছিলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালও যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বারংবার পেয়েছিলেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসার পর প্রশংসা। তারপর তিনি দেখা দেন মঞ্চনাট্য-জগতে। বিভিন্ন পেশাদার রঙ্গালয়ের জন্যে রচনা করতে থাকেন নাটকের পর নাটক। জনসাধারণের মধ্যে সে সব নাটক প্রভূত উত্তেজনার সৃষ্টি করতে লাগল এবং দ্বিজেন্দ্রলালেরও লোকপ্রিয়তা উঠল চরমে। রবীন্দ্রনাথও যথাসময়ে নাট্যকারের কাছ থেকে সে সব নাটক উপহার লাভ ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে এল না কোনরকম সাড়াশব্দ। এই অস্বীকৃতি দ্বিজেন্দ্রলাল অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য বা অন্য কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি এতটা ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েছিলেন যে তৎকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে সৃষ্ট হয়েছিল এক অশোভন ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, এখানে সে প্রসঙ্গ অবান্তর।

রবীন্দ্রনাথ যে মঞ্চনাটককে উচ্চশ্রেণীর যোগ্য বা সাহিত্যের অন্তর্গত ব'লে মনে করতেন না, উপরি-উক্ত উদ্ধৃতির মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। তাঁর মতে, যে নাটক রঙ্গালয়ের মুখ চেয়ে নিজেকে নানাদিকে খর্ব্ব করে সে হচ্ছে উপহাসের যোগ্য; নিশ্চয়ই এই মতই তিনি আজীবন পোষণ ক'রে গিয়েছেন, কারণ বাংলা সাহিত্যে যিনি বিশেষরূপে উল্লেখ্য কোন রচনা দেখলেই প্রশংসা করবার সুযোগ ত্যাগ করেন নি, তাঁর সুবিপুল সন্দর্ভ সম্ভারের মধ্যে একখানিমাত্র মঞ্চনাটকের নাম বা প্রশস্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে তাঁর অনুদারতার নয়, তাঁর সাহিত্যিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মঞ্চের জন্যে নাট্যকার নিজেকে খাটো করবেন, যা দিতে পারতেন তা দিতে পারবেন না, এটা ছিল তাঁর পক্ষে অসহনীয়। আমাদের সেরা মঞ্চনাট্যকার গিরীশচন্দ্র এমনি "হাত পা বাঁধা" অবস্থায় সারা জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। এজন্যে তিনি যে মর্ম্মপীড়া ভোগ করতেন, মাঝে মাঝে তাঁর মৌখিক ভাষাতেও তা জাহির হয়ে পড়ত। তাঁর নিজের ভাষায়—"অমুকের সঙ্গে অমুকের love হ'ল—অমুকের জন্যে অমুকে মরেন—তিনি হয়তো ফিরে তাকান না—নায়িকা হয়তো বিপদে পড়লেন, নায়ক এসে উদ্ধার করলেন—এই তো সব স্থূল ঘটনা।" মঞ্চের সঙ্কীর্ণ ও নিম্নস্তরের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হয়ে গিরীশচন্দ্রকে ইচ্ছার

বিরুদ্ধেও এমনি সব স্থূল ঘটনা নিয়েই নাটক লিখতে হয়েছিল। কিন্তু মনে মনে তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন "শুধু internal facts and internal struggle" নিয়ে, কারণ তাঁর মত ছিল "internal actions এঁকে দেখানোই best literary art"। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, "দেশের লোকের apathyর জন্যে" (এও তাঁর নিজের ভাষা) শেষ পর্য্যন্ত গিরীশচন্দ্র মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার অবসর পান নি।

নাটকরচনা ছিল গিরীশচন্দ্রের পেশা এবং নিজেও ছিলেন তিনি পেশাদার রঙ্গালয়ের বৈতনিক শিল্পী। স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত কাজ করতে পারলে নিশ্চয়ই তিনি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আর তাঁর ঠাঁই হ'ত না মঞ্চনাট্যজগতে। রবীন্দ্রনাথ নাটক-রচনাকে কোনদিনই পেশায় পরিণত করতে চান নি, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীন ও সৌখীন শিল্পীর কর্ত্তব্য পালন ক'রে গিয়েছেন, তাই মঞ্চনাট্যকারের দুর্ভাগ্য থেকেও আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন। পেশাদার রঙ্গালয় হঠাৎ নিজের কোন্ খেয়ালে গ্রহণ করলে তাঁর "রাজা ও রাণী" এবং জনপ্রিয়তার মুকুট প'রে মঞ্চনাটক হিসাবেও তা সার্থক হয়ে উঠল। অন্য কোন নাট্যকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইখানেই হ'ত পরিতৃপ্ত। কিন্তু সে জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকে তুষ্ট ক'রতে পারলে না। তিনি বললেন—ও নাটক আমার প্রথম বয়সের রচনা, আসল ভাবটিই "রচনার দোষে পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে-অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয়।" জনপ্রিয়তার খাতিরে মঞ্চনাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল "সাজাহান" নাটককে দ্বিধা নয়, আরো এগিয়ে ত্রিধা বিভক্ত না ক'রে ছাড়েন নি। তাঁর "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকও ঐ শ্রেণীর ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। ফলে এতকাল পরেও ঐ দুইখানি নাটকের চাহিদা অসাধারণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মঞ্চনাট্যকার নন, তিনি হচ্ছেন সৌখীন সাহিত্যশিল্পী। প্রকৃত নাটকত্বের কাছে "রাজা ও রাণী"র জনপ্রিয়তাকে তিনি একান্ত তুচ্ছ মনে করলেন। অতএব জনপ্রিয়তার উপাদানগুলি নিষ্ঠুর হাতে বাদ দিয়ে তৈরি করলেন "তপতী" এবং তাকে সাদরে গ্রহণ ক'রে নাট্যযোদ্ধা শিশিরকুমার করলেন আত্মহত্যার মত কুকর্ম্ম, কারণ "তপতী" মঞ্চস্থ করবার পরেই তাঁর "নাট্যমন্দির" বন্ধ করলে দ্বার। অথচ "তপতী"র মত নাটকও যে বাংলা রঙ্গালয়ে সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হ'তে পারে, শিশিরকুমারের অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অনবদ্য প্রয়োগনিপুণতা সেটা প্রমাণিত করেছিল নিশ্চিত রূপেই। সাহিত্যিক নাটককে বাংলার

লোকসাধারণ যে আমল নিতে নারাজ, আর একবার তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল আর্ট থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশ" অভিনয়ে। প্রধান ছুটি ভূমিকা প্রায় সারা নাটকখানি দখল ক'রে আছে এবং শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও স্বর্গীয়া নীহারবালার অভিনয় হয়েছিল অতিশয় অনিন্দনীয়। আমাদের প্রেক্ষাগৃহ সে রস হজম করতে পারলে না। তবে বাংলা দেশে রসিকের দল ভারি না হ'লেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিরাশ করেন নি। তাই পেশাদার মঞ্চের কথা ভুলে মর্ম্মগ্রাহী রসিকদের জন্যে বার বার করতেন সৌখীন অভিনয়ের আয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয়

নট, নাট্যকলাবিদ্ ও দৃশ্যকাব্যকার রবীন্দ্রনাথকে আরো খুঁটিয়ে দেখবার আগে আর একটা জিনিষ না দেখলে চলবে না। বীজবপনের আগে জমি তৈরি থাকা দরকার। ঐতিহ্যহীন যে কোন পরিবারের মধ্যেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জন্ম সম্ভবপর ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চ্চার জন্যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। নতুন বাংলার প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্কই কেবল ঘনিষ্ঠ ছিল না, তখনকার সারস্বত সভা-সমিতিগুলিতেও তিনি সাগ্রহে যোগদান করতেন এবং তাঁর নিজেরও রচনাশক্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথও ছিলেন সুপরিচিত কবি, তাঁর মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ যখন প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন অবোধ শিশু। এই তো গেল নিছক সাহিত্যের দিক। নাট্যকলাচর্চ্চার দিক দিয়েও দেখি, রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হবার আগেই ঠাকুরবংশীয় শিল্পিগণ নাটক ও অভিনয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্মরণীয় আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আপন অগ্রবর্ত্তীদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্ম্মে স্বাদেশিকতার সকল বিষয়ে তাঁহাদের মনে একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল।"

আমরা আগেই যথাসময়ে দেখেছি, সাধারণ বা পেশাদার বাংলা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার এক যুগ আগে কলকাতা সহরে সৌখীন নাট্যাভিনয়ের মরসুম প'ড়ে গিয়েছিল। সেই সব অনুষ্ঠান দেখেই যে বাগবাজার পল্লীর কয়েকজন মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকের মনে নাট্যসম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়; ঐ সৌখীন সম্প্রদায়ই পরে পেশাদার হয়ে এখানে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করে। পূর্ব্বকথিত নাট্যাভিনয়ের মরসুমে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গালয় ছিল অন্যতম প্রধান অংশীদার। সেখানে উমেশচন্দ্র মিত্রের "বিধবা-বিবাহ", মাইকেল মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" ও "একেই কি বলে সভ্যতা", রামনারায়ণ তর্করত্নের "নব-নাটক" এবং গিরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "বাবু-বিলাস" প্রভৃতি পালা অভিনীত হয়েছিল। কলকাতার সম্ভ্রান্ত, কৃতবিদ্য ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের উপস্থিতিতে সার্থক হয়ে উঠত সেই সব অনুষ্ঠান। তখনকার দিনে এমন

অভিনয়োৎসব কেবল অভিনব নয়, অসাধারণও বটে। এবং সেই বিচিত্র নাট্যসমারোহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব থেকে কৈশোর পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের যে ভাবগ্রাহী চিত্ত পরে ললিতকলার ক্ষেত্রে সর্ব্বতোমুখ হয়ে উঠেছিল, সুকুমার বয়স থেকেই তা নাট্যজগতের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি।

আকর্ষণের আর একটা বড় কারণ ছিল। বোধ করি, নাট্যকলাচর্চ্চায় তখন ঠাকুরপরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই একজন অপূর্ব্ব শিল্পী, চিরকাল যিনি কেবল সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা নিয়েই নীরব সাধনা ক'রে ক্ষান্ত থাকেন নি, পরন্তু নাট্যকলাতেও যাঁর অকুণ্ঠ দানের পরিমাণ বড় অল্প নয়। বঙ্গদেশীয় নাট্যসমালোচকদের উচিত ছিল, তাঁর নাট্যনিপুণতা নিয়ে বিশদ, বিশিষ্ট ও বিস্তৃত আলোচনা করা। দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত তা হয় নি এবং আমাদের বর্ত্তমান ক্ষেত্র সে আলোচনার পক্ষে প্রশস্ত নয়। তবে সুযোগ পেলে তা করবার ইচ্ছা রইল, আপাততঃ কয়েকটি ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে রাখব, নইলে নাট্যকুশল রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার সুবিধা হবে না।

নাট্যজগতে অভিনেতারূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম দেখা পাওয়া যায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মগ্রহণের দুই বৎসর পূর্ব্বে। তিনি গ্রহণ করেছিলেন "বিধবা-বিবাহ" নাটকে পড়ুয়ার ভূমিকা, তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো বৎসর। তারপর তিনি মাইকেল মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" ও "একেই কি বলে সভ্যতা" পালায় যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা এবং সার্জ্জ্যান্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ; অভিনয়ের তারিখ জানি না, তবে অনুমানে বুঝি, তখন তাঁর প্রথম যৌবন। তারপর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণের "নব-নাটকে" তিনি সেজেছিলেন, নটী। তারপর দেখি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকাররূপে আবির্ভাব। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামে একখানি প্রহসন রচনা ও প্রকাশ করেন। তারই দুই মাস পরে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় আত্মপ্রকাশ করে এবং সেখানেই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রহসনখানি অভিনীত হয়। তারপর আরম্ভ হয় তাঁর নাটক-রচনার সাধনা—পরে পরে তাঁর লেখনী প্রসব করে অনেকগুলি নাটক, নাটিকা, কৌতুক-নাট্য বা প্রহসন, এখানে তাদের নামের ফর্দ্দ দাখিল ক'রে পুঁথি বাড়িয়ে কাজ নেই। তাঁর কয়েকখানি নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত ও জনসাধারণের মধ্যে সমাদৃত হয়েছিল। একসময়ে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকাররূপে প্রশস্তি লাভ করেছিলেন এবং নাট্যজগতে একদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আর সকলের অগ্রণী। বাংলাদেশে নাটকের ভিতর দিয়ে তিনিই প্রথম শোনান স্বাদেশিকতার বাণী। তাঁর প্রথম নাটক "পুরুবিক্রম"

(১৮৭৪ খৃঃ) থেকেই এই বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। গ্রীকদের বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীকে উত্তেজিত করবার জন্যে পুরু বলছেন—

"ওঠ জাগ! বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ;
হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "সরোজিনী" (১৮৭৬ খৃঃ) ও "স্বপ্নময়ী" (১৮৮২ খৃঃ) নাটকেও দেখা যায় ঐ বিশেষত্ব। তাঁর বহুকাল পরে আবার দেশাত্মবোধের সূত্র অবলম্বন করেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি মঞ্চনাট্যকারগণ। কেবল ঐ কারণে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সৌখীন নাট্যভিনয়কে ভুলতে পারেন নি। পারিবারিক নাট্যশালার জন্যে রচনা করলেন বাংলা ভাষার প্রথম গীতিনাট্য "মানময়ী" এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তার অভিনয়ে অনুজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজেও (ইন্দ্রের ভূমিকায়) দেখা দেন। এর পরেও তিনি সৌখীন অভিনয়ের জন্যে লেখনীচালনায় বিরত হন নি। অধিকন্তু সৌখীন নাট্যানুষ্ঠানের জন্যে বরাবরই তাঁর আগ্রহ সমান জাগ্রত ছিল। গত শতকের শেষ দশকে তাঁরই আগ্রহে ও উদ্যোগে যে "সঙ্গীত সমাজ" স্থাপিত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। নাট্যানুশীলনের জন্যে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিতেন তিনিই।

*

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে সৌখীন অভিনয়ের মহোৎসবের সময় খুব ঘটা ক'রে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের "নব-নাটক" অভিনীত হয়েছিল (১৮৬৭, ৫ই জানুয়ারী)। তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সতেরো-আঠারো বৎসরের তরুণ যুবক এবং রবীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসরের বেশী নয়। উক্ত অভিনয়ের সময়ে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। নাট্যমঞ্চটিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন: "ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকার বনের মতই বোধ হইত।"

দেখা যায়, দৃশ্যপটাদি বাস্তবানুগ করতে হবে, এই ধুয়া উঠেছিল বাংলা থিয়েটারের

গোড়া থেকেই। আর্য্য ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে মঞ্চাভিনয় ছিল বটে, কিন্তু দৃশ্যপটের অস্তিত্ব কি ছিল? কেউ বলেন, ছিল। অনেকেই বলেন, ছিল না। পাশ্চাত্য রঙ্গালয়েও প্রাচীন যুগে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হ'ত না। এমন কি ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও দৃশ্যপট নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না, কল্পনায় বিভিন্ন দৃশ্য দর্শন করবার ভার গ্রহণ করত দর্শকরা নিজেরাই। তারা তখন নাটক ও তার অভিনয় দেখেই পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করত—আজও যেমন করে যাত্রার আসরে বাঙালী দর্শকরা। পরে বাস্তবতার ওজুহাতেই দৃশ্যপটের উপসর্গ এসে জোটে বিলাতী নাট্যজগতে এবং তার দেখাদেখি কলকাতার প্রবাসী ইংরেজরাও দৃশ্যপট দিয়ে রঙ্গমঞ্চ সাজাতে সুরু ক'রে দেন। সে যুগের নব্য বাঙালীরা ইংরেজদের অনুকরণ করবার যে কোন সুযোগ পেলে ছাড়তেন না। তাঁরাও গা ভাসালেন গড্ডলিকাপ্রবাহে, কারণ এই নকল বাস্তবতার মধ্যে পেলেন নূতন চমৎকারিতার সন্ধান। ক্রমে মোহ এতটা বেড়ে উঠল যে, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যসংস্থানকে মনে করা হ'তে লাগল নাট্যানুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই প্রথার ঘোরতর বিরোধী। তাঁর এই বিরাগ কত দিনের তা আমরা জানি না, কিন্তু যখন তাঁর বয়স একচল্লিশ বৎসর, তখনই তাঁকে প্রকাশ্য ভাবে দৃশ্যপটের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করতে দেখি। সে কথা নিয়ে ভালো ক'রে আলোচনা করব যথাসময়েই।

তরুণ যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "নব-নাটক"-এ গ্রহণ করলেন নটীর ক্ষুদ্র ভূমিকা এবং অভিনয়ের মধ্যবর্ত্তী বিরামের সময়ে কন্‌সার্ট-ওয়ালাদের দলে ব'সে বাজালেন হারমোনিয়াম। ছয় বৎসরের রবীন্দ্রনাথ তেমন কোন সৌভাগ্য লাভ করতে পারলেন না, কারণ তখন সে শক্তি থেকেও তিনি ছিলেন বঞ্চিত। তবে সে অভিনয় যে তিনি দেখেছিলেন, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি কি কেবল দেখেই তুষ্ট হ'তে পেরেছিলেন? যাঁরা রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত ও অপরের রচিত জীবনীকথা ভালো ক'রে পাঠ করেছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মন ছুটত বয়সের আগে আগে। সুতরাং বড়দের ঐ নাটকীয় উৎসবের সময়ে তাঁরও মানসবিহঙ্গ যে পক্ষবিস্তার ক'রে উড়ে গিয়েছিল নাট্যগগনের দূর-দূরান্তরে, এমন অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না। অর্থাৎ তাঁর নাট্যপাঠের হাতে-খড়ি হয়েছিল সেই সময়েই, মনে মনে।

তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পেলেন অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষ-পুটের তলায় স্নেহসিক্ত আশ্রয়। বালক বয়সেই তাঁর নাটকীয় রচনার সূত্রপাত হয় এবং কিশোর বয়সেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে লিখিত একাধিক

নাটকে কয়েকটি গান রচনার ভার পেয়েছিলেন এবং সে সব গান যখন রীতিমত লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তখন যে তাঁর আত্মনির্ভরতা বেড়ে গিয়েছিল, এমন কথাও মনে করা যেতে পারে। ক্রমে রবীন্দ্রনাথ পা দিলেন ষোলো বৎসরে—শিশুত্বের অবহেলা, বালকত্বের ছেলেখেলা এবং কৈশোরের অনিশ্চয়তা পেরিয়ে তিনি প্রায় গোটা মানুষ হয়ে দাঁড়ালেন। এই সময়ে ঠাকুরবাড়ীর পারিবারিক নাট্যানুষ্ঠানের জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করলেন "এমন কর্ম্ম আর করব না" নামে একখানি হাস্যনাট্য—পরে পালাটি "অলীকবাবু" নামধারণ করে।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে মনে হচ্ছে একটা কথা। সেকালকার প্রতিভাশালী নাট্যকাররাও যখন ভারি ভারি গম্ভীর নাটক ফেঁদে বসতেন, তখন থিয়েটারি ঢঙে ব্যবহার করতেন যে সব অদ্ভুত ভাষা ও সেকেলে মামুলী ভাব, আধুনিক যুগে সে সব প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওঁরাই যখন আবার হালকা হাস্যনাট্যরচনার জন্যে লেখনী ধরতেন, তখন পরিবেশন করতেন এমন স্বাভাবিক ঘরোয়া ভাষা ও ভাব যে, আজকের রঙ্গালয়েও আছে তাদের উপযোগিতা। মাইকেল মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী নাটক" নাটকত্বে উৎকৃষ্ট হ'লেও তার সেকেলে ভাষা একালে বরদাস্ত হবে না, কিন্তু তাঁর "একেই কি বলে সভ্যতা" আধুনিক প্রেক্ষাগৃহকেও হাস্যরোলে মুখরিত ক'রে তুলতে পারে। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" আধুনিক অভিনয়ের যোগ্য নয়, কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর "সধবার একাদশী"কে আজও মঞ্চস্থ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। তাঁর "পুরুবিক্রম" ও "স্বপ্নময়ী" প্রভৃতি নাটক এখন আর নব্য বাবুদের পাতে দেওয়া চলবে না। কিন্তু নবযুগের বাংলা রঙ্গালয়েও অলীক বাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন।

খুব ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ নাকি বাড়ীর কুস্তির আখড়ার নরম বীর-মাটিতে বাখারি পুঁতে মঞ্চ বেঁধে অভিনয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সাধে বাদ সেধেছিলেন গুরুজনরা। এবারে কিন্তু তাঁর ষোলো বৎসর বয়সে সুযোগ এসে উপস্থিত হ'ল দ্বারদেশে। তাঁর গুরুজনদের অন্যতম জ্যোতিরিন্দ্রনাথই তাঁকে প্রদান করলেন অলীক বাবুর ভূমিকাটি। যদিও সর্ব্বসাধারণের সামনে অভিনয় হ'ল না, তবু এই দিনটি তাঁর জীবনে স্মরণীয়—কারণ অভিনেতার রূপসজ্জায় সেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। সেটা হ'ল গিয়ে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

কিন্তু এ সম্বন্ধে মতান্তরও আছে। "রবীন্দ্র-জীবনী" লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে "বিলাত যাইবার পূর্ব্বে" রবীন্দ্রনাথ "অলীকবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ

হন" কিন্তু ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে সংশ্লিষ্ট স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রকথা" পাঠে জানা যায়, ঘরোয়া নাট্যানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "মানময়ী" গীতিনাট্যাভিনয়ে মদনের ভূমিকায়। প্রভাতকুমার বলেন, রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে "মানময়ী"র ইন্দ্র সেজে দেখা দেন। কার কথা ঠিক? এও সম্ভব, পালাটি বিভিন্ন কুশীলবের দ্বারা একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল।

খগেন্দ্রনাথ বলেন "মানময়ী"-র ভূমিকালিপি ছিল এই রকম: মদন—রবীন্দ্রনাথ। ইন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ)। শচী—নীপময়ী (হেমেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী) এই অভিনয়েই নাকি ঠাকুরবাড়ীর মহিলার প্রথম আবির্ভাব।

খগেন্দ্রনাথ আর একটি চিত্তাকর্ষক খবর দিয়েছেন। ঠাকুরবাড়ীর ঘরোয়া নাট্যানুষ্ঠানে "বিবাহ-উৎসব" নামে আর একটি পালা অভিনীত হয়েছিল এবং সেই গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন একটি নারী-ভূমিকা! ঐ অভিনয়ের তারিখ ও ভূমিকার নাম পাওয়া যায় নি। কিন্তু নারী-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ! এ তথ্য অনেকেরই অজানা।

কবি রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করতে গেলে কতকগুলি গোড়ার কথা না বললেও চলে, কারণ কাব্যজগতের সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। কিন্তু নট-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গেলে, বাহুল্য মনে হ'লেও আনুষঙ্গিক কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা না ক'রে উপায় নেই, কারণ আমাদের নাট্যজগতের অতীতের—এমন কি বর্ত্তমানেরও পরিস্থিতি সম্বন্ধে লোক-সাধারণের স্পষ্ট ধারণা আছে ব'লে মনে হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের (১৮৫৬ খৃঃ) প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যদি আমাদের নিয়মিত নাট্যসাধনা আরম্ভ হয়েছে ব'লে ধরা যায়, তাহ'লে বলতে হবে বাংলা রঙ্গালয়ের বয়স প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ণ হ'তে চলল। অথচ এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাংলা নাট্যজগৎ ও নাট্যসাহিত্য নিয়ে যতটুকু আলোচনা হয়েছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করতে পারি না এবং সব চেয়ে অভাব দেখা যায় উচ্চশ্রেণীর নাট্য-সমালোচনার। তাই এখানে যাঁরা অভিনয়ের ভক্ত, তাঁদেরও মধ্যে নাট্যকলা সম্বন্ধে বিশদ ধারণা আছে এমন লোকের সংখ্যা খুবই অল্প।

অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিজেদের পারিবারিক রঙ্গালয়ে রঙ্গাবতরণ করেন, কিন্তু তাঁর তৎকালীন অভিনয়ের কোন বর্ণনা পাবার আর উপায় নেই। তবে তাঁর তখনকার অভিনয় হয়তো বিশেষরূপে স্মরণীয় হয় নি এবং তার দুটি কারণের কথা মনে হয়। প্রথমতঃ, তখন তিনি ছিলেন নাট্যকলার

শিক্ষার্থী মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সামনে উপযোগী আদর্শের অভাব ছিল। মানুষ হয় শেখে হাতে-নাতে, নয় শেখে দেখে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই বাংলা দেশে সৌখীন অভিনয়ের গৌরবের যুগ অতীত হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন শিশু ও বালক তখনও সহরে কয়েকটি প্রখ্যাত সৌখীন সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না এবং তাঁর কিশোর বয়সেই বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শিশু, বালক ও কিশোর বয়সের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের বাড়ীর কোন কোন অভিনয় ছাড়া আর কোন রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাই নি। সুতরাং বলতে পারি, প্রথম আত্মপ্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সম্বল ছিল অশিক্ষিতপটুত্ব। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কাছ থেকেও তিনি যে কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন, এটুকুও অনায়াসে অনুমান করা যায়। কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়।

তবে এইখানে খগেন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: "ঠাকুরবাড়ীর পারিবারিক অভিনয় মজলিসে একবার কবিকে খ্যাতনামা অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সহিত রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিতে হয়। মুস্তাফি মহাশয়ের অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের কারুকার্য্য এত সূক্ষ্ম ও প্রচুর ছিল যে, সহযোগী অভিনেতাদের পক্ষে নিজ ভূমিকায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ রাখা কঠিন হইত। আমরা কবির নিজমুখে শুনিয়াছি যে, অতটা ষ্টেজ-ফ্রি এক্টরের সহিত মঞ্চে নামিতে তাঁহাকে সদা সতর্ক থাকিতে হইত এবং তাহাতে তাঁহার নিজের অভিনয়-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত হইত।"

সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতম পুরোধা ও নাট্যগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কোনদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় ক'রেছিলেন, এত-বড় খবরটা নিয়ে আর কেউ কোনদিন আলোচনা করেন নি, এ বড় বিস্ময়ের কথা। কিন্তু এমন যোগাযোগ অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ব্বে অর্দ্ধেন্দুশেখর নানা সৌখীন অভিনয়ে যোগ দিয়ে রীতিমত খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর পারিবারিক অভিনয়েও তিনি অনায়াসেই যোগ দিতে পারতেন, কেননা ওঁদের সঙ্গে তাঁর ছিল কুটুম্বিতার সম্পর্ক। তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতুলপুত্র ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের ভগ্নীপতির কয়লাহাটার বাড়ীতেও অভিনয় ক'রে নাম কিনেছিলেন। দুঃখের বিষয়, কোন্ পালায় এই দুই নাট্য-প্রতিভার মিলন হয়েছিল খগেন্দ্রনাথ সে কথা জানান নি। তবে সে সময়ে অধিকতর খ্যাতিমান এবং বয়োজ্যেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখরের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ধারণা লাভ করেছিলেন কিনা সে বিষয়েও আজ জোর ক'রে কিছু বলা যায় না।

কিন্তু হাতে-নাতে না হোক্, দেখে শেখবার একটি দুর্লভ সুযোগ উপস্থিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ ঘরোয়া মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং তার পর বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসেই করেন বিলাতযাত্রা। সেখানে তিনি ছিলেন এক বৎসর পাঁচ মাস—অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত। হিন্দুদের বারাণসী ও মুসলমানদের মক্কার মত, ভারতীয় নাট্যজগতের আধুনিক বাসিন্দাদের কাছে বিলাতের স্থান অতিশয় উর্দ্ধে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মঞ্চাভিনয়ের হাতে-খড়ি হয়েছে ইংরেজদের কাছেই। রঙ্গমঞ্চ কেমন ক'রে সাজাতে হয়, সেখানে কেমন ক'রে কথা কইতে ও চলা-ফেরা করতে হয় এবং কেমন ক'রে মঞ্চের উপযোগী নাটক রচনা করতে হয়, এ-সব শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছি আমরা ইংরেজ গুরুর কাছ থেকেই।

ছাত্র যেখানে বুদ্ধিমান, সেখানে দেখে শেখারও মূল্য কম নয়। গিরীশচন্দ্র ঘোষকে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের জনক ব'লে বর্ণনা করা হয়। দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" পালায় নিমচাঁদের ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ ক'রেই গিরীশচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ব'লে অভিহিত হন। কিন্তু তাঁর এই অভিনয়শক্তির জন্ম কোথায়? তাঁর শিক্ষাগুরুর নাম পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে গিরীশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি হচ্ছে উল্লেখযোগ্য: "প্রতিভাশালিনী প্রৌঢ়া অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সহিত নানারূপ বিদেশীয় নাটক ও অভিনয় সমালোচনায় এবং সেই সঙ্গে প্রায়ই অভিনিবেশ সহ লুইস থিয়েটারের অভিনয় দর্শনে গিরীশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ক্রমশঃ স্ফুরিত হইতে থাকে। সেই প্রতিভার প্রথম বিকাশ—স্বীয় পল্লীতে 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকাভিনয়ে।"

কলকাতায় যে সব বিলাতী সম্প্রদায় অভিনয় করেছে, কিংবা যে সব ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায় অভিনয় দেখিয়ে গিয়েছে, সাধারণতঃ তাদের মধ্যে থাকত অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর নট-নটীরাই। কিন্তু তারাই বরাবর হয়ে এসেছে বাঙালী অভিনেতাগণের আদর্শ। তবে এখানে এ কথাটাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত শক্তি দেখিয়ে আমাদের গিরীশচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন শিল্পী নাট্যকলার প্রথম শ্রেণীতে উচ্চাসন অধিকার করেছেন বটে, কিন্তু সমষ্টিগত শক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, আমাদের কোন পেশাদার ও বিখ্যাত নাট্য-সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অভিনয়ও আজ পর্য্যন্ত কলকাতার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বিলাতী সম্প্রদায়ের উপরে টেক্কা মারতে পারেনি। এদেশী নটরা ব্যক্তিগত ভাবে বড় হয়ে উঠেছেন বিদেশী ছোট ছোট শিল্পীদের দেখেই।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। বাল্যকাল থেকেই তিনি

নাট্যকলার অনুরাগী, অতএব সেখানকার নাট্যজগতের সঙ্গে তিনি যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, এ কথাটা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষ ক'রে সেই সময়টিতে বিলাতী নাট্যজগতে চলছিল রীতিমত সমারোহের ব্যাপার। অতি-আধুনিক নাট্যকারদের অগ্রদূত ইব্‌সেন সে সময়ে লেখনীচালনা করছেন বটে, কিন্তু বিলাতী নাট্যজগতে তখন পর্য্যন্ত চলেছে এলিজাবেথীয় যুগের জের। পৃথিবীবিখ্যাত অভিনেতা স্যার হেনরি আর্ভিং তখন পূর্ণগৌরবে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ যে বৎসরে বিলাত যান, সেই বৎসরেই তিনি প্রখ্যাত লিসিয়াম থিয়েটারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বিলাতী নাট্যগগনে দীপ্যমান ছিলেন যে সব উজ্জ্বল তারকা, তাঁরা হচ্ছেন সার স্কোয়ার ব্যাঙ্করফ্‌ট্, স্যার চার্লস উইণ্ডহ্যাম, জে এল টুল, মিঃ ও মিসেস আলফ্রেড উইগনি, আর্থার সিসিল, জন ক্লেটন এবং এলেন টেরি ও ম্যাজ ক্রেণ্ডাল প্রভৃতি। স্যার উইলিয়ম গিলবার্ট ও স্যার আর্থার সলিভানের সহযোগিতায় প্রস্তুত বিখ্যাত গীতিনাট্যগুলিও সে সময়ে যারপরনাই লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই সব প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের নাট্যানুষ্ঠানে যোগ দেবার দুষ্প্রাপ্য সুযোগ পেয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবগ্রাহী চিত্ত যে নানা দিক দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। প্রথম বয়সেই দেখে শেখবার এমন সুবিধা পাননি বাংলা দেশের আর কোন নাট্যশিক্ষার্থী।

প্রায় দেড় বৎসরকাল বিলাতে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার দেশে ফিরে এলেন এবং এসেই দেখলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "মানময়ী" (?) গীতিনাট্য প্রস্তুত। তার জন্যে একটি গান ("আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি") লিখে অভিনয়ের দিন গ্রহণ করলেন মদনের ভূমিকা। বিলাতী অভিজ্ঞতার ফলে ইতিমধ্যে তাঁর অভিনয়ের শক্তি কতটা মার্জ্জিত ও উন্নত হয়ে উঠেছিল, সে কথা কেউ লিপিবদ্ধ ক'রে রাখে নি। এই অনুষ্ঠানেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সহ-অভিনেতা। কিন্তু তারপরেই তাঁর চিত্ত স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল এবং অনতিবিলম্বেই সেই সুযোগ তিনি লাভ করলেন। ঠিক এক বৎসর পরেই ঘরোয়া নাট্যশালার গণ্ডী পার হয়ে সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বসাধারণের সামনে দেখা দিলেন নট ও নাট্যকার রূপে। এই ঘটনার পর সুদীর্ঘ পঞ্চান্নো বৎসর কাল ধ'রে বারংবার গ্রহণ করেছেন তিনি স্বরচিত নাটকের বিভিন্ন ভূমিকা।

ব্যক্তিগত শক্তির দিক দিয়ে অভিনেতাকে দেখে তাঁর কথা নিয়ে বিশদ ও বিশেষ ভাবে আলোচনা করবার জন্যে বাঙালী সমালোচকরা কোনকালেই আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। সৌখীন নাট্যানুষ্ঠানের যুগে বাংলা দেশের অভিনয়ের গতি ছিল কোন্ দিকে,

সেকালের সংবাদপত্রের দুর্লভ নথি খুঁজলে সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারা যায় এবং স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সে সব আলোচনার কিয়দংশ জনসাধারণের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু তার সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় কেবল নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে সাধারণ খবরাখবর কিংবা কোন কোন অভিনেতা সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ মাত্র। পাঠ ক'রে আশ মেটে না, ব্যক্তিবিশেষের শক্তির যথার্থ নিরিখ পাই না।

যেখান থেকে এসেছে আমাদের থিয়েটারের আদর্শ, সেখানকার ধারা কিন্তু স্বতন্ত্র। সেক্সপিয়ার, বেন জনসন, বুামণ্ট, ফ্লেচার ও সাক্লিং প্রভৃতি এলিজাবেথীয় যুগের কবিরাও আপন আপন রচনায় সমসাময়িক কালের অভিনয়কে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু তৎকালীন সমালোচকরা অগ্রসর হয়েছিলেন অধিকতর। বিদ্যমান যুগের কোন ব্যক্তি যদি জানতে চান যে, তিন শত বৎসর আগে বিলাতী নাট্যজগতে প্রধান প্রধান অভিনেতা ছিলেন কারা এবং তাঁদের অভিনয়ের আদর্শই বা ছিল কোন্ শ্রেণীর তবে সে কৌতূহলও অতৃপ্ত থাকবে না। সমালোচকরা বিভিন্ন যুগের এক একজন অভিনেতাকে নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা করতেও বিরত হন নি। তার ফলে হয়েছে একটা মস্ত উপকার। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থপতির কাজ শিল্পীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায় না। সঙ্গীতবিদের রাগ-রাগিণীর মধ্যে তাঁরও ব্যক্তিত্ব অজর হয়ে বিদ্যমান থাকতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিনেতারা একান্ত নিঃসহায়। বাংলা দেশে গত-যুগের প্রধান অভিনেতা নিজেই বলেছেন: "দেহপট সনে নট সকলি হারায়"। কিন্তু বিলাতী অভিনেতারা চিরজীবী হয়ে আছেন তাঁদের সমসাময়িক সমালোচকদের হালখাতায়। তাঁদের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে আজও আমরা ব্যরবেজ, গ্যারিক, মিসেস সেডন্স, কেম্বল, এডমণ্ড কীন, ম্যাক্রেডী, আরভিং ও এলেন টেরি প্রভৃতিকে সজীব ভাবে অভিনয় করতে দেখি। অভিনেতারা স্বীকার করুন আর না করুন, সমালোচকদের চেয়ে বড় বন্ধু তাঁদের আর কেউ নেই। বার্ণার্ড স যখন নাট্য-সমালোচক ছিলেন তখন তিনিও এই সত্য কথাটা অভিনেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সম্পর্কে কবিবর মাইকেল মধুসূদনের একটি উক্তির কথা আগেই উল্লেখ করেছি এবং এখানেও আর একবার করছি। মধুসূদনের কবিরূপে আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বেই কলকাতায় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ও বেলগাছিয়া রঙ্গালয় প্রভৃতির সৌখীন অভিনয় অত্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল বিদ্বজ্জনসমাজে। সংবাদপত্রে ঐ সকল অভিনয় নিয়ে যে সব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির সংখ্যা অপ্রচুর নয়। তখন কেউ না কেউ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব'লে স্বীকৃত হয়েছিলেন এ বিষয়েও সন্দেহ

থাকতে পারে না। কিন্তু কে সেই গুণী ব্যক্তি? সাংবাদিক সমালোচকরা এই প্রশ্নের কোনই উত্তর দেন নি। কেবল মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের মঙ্গলাচরণ পাঠ ক'রে দৈবক্রমে এইমাত্র জানতে পারি যে, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তখনকার "বঙ্গদেশীয় নট-কুল-শিরোমণি" ও "দর্শন-কাব্য-বিশারদ"।

"কৃষ্ণকুমারী নাটক" রচিত হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। তার প্রায় বিশ বৎসর পরে অভিনীত হয় "বাল্মীকি-প্রতিভা"। "কৃষ্ণকুমারী" রচনা ও প্রকাশ কালে রবীন্দ্রনাথ ইহধামে ভূমিষ্ঠই হন নি, এবং "বাল্মীকি-প্রতিভা" নাট্যানুষ্ঠানের সময়ে তিনি কেবল নাট্যকারই নন, সেই সঙ্গে প্রধান অভিনেতাও। তখন বাংলা দেশে বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য সৌখীন নাট্যধারায় ভাঁটার টান সুরু হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে নাট্যোৎসব চলছে মহাসমারোহে এবং আসরে পরিপূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছেন গিরীশচন্দ্র (তখনও মৌলিক নাটক রচনা করেন নি), অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃত মিত্র, মহেন্দ্র বসু ও অমৃত বসু প্রভৃতি। সাময়িক পত্রের সমালোচকরা তখন অভিনেতাদের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সচেতন হয়ে উঠেছেন, কারণ ইতিমধ্যেই "সাধারণী" পত্রিকায় (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে) সম্ভবতঃ অক্ষয়চন্দ্র সরকারই গিরীশচন্দ্রের অভিনয় (রাম ও মেঘনাদের যুগ্ম ভূমিকায়) নিয়ে আলোচনা ক'রে বলেছিলেন: "বঙ্গের গিরীশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না।"

তরুণ রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করলেন বটে, কিন্তু তৎকালে এমন কোন সমালোচক ছিলেন না, যিনি সে অভিনয়ের ছবিকে লেখার রেখায় ধ'রে রাখতে পারেন। এদিক দিয়ে গিরীশচন্দ্র তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান। কারণ নাট্যজীবনের প্রথম অভিনয়রাত্রি থেকেই তিনি সমালোচকদের অভিনন্দনলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তখন থেকেই আমরা তাঁর দ্বারা অভিনয়গুণে প্রখ্যাত ভূমিকাগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'তে পেরেছি। তবে অন্যান্য নানা কারণে জানা যায়, সর্ব্বসাধারণের সামনে সকল দিক দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছিল নট-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম আবির্ভাব। সেদিনের প্রেক্ষাগৃহ কেবল ঘরোয়া বৈঠকের আত্মীয়সভার দ্বারা অধিকৃত হ'ল না, সেখানে দেখা গেল সহরের সম্ভ্রান্ত এবং জ্ঞানী ও গুণী সমাজের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তিকে—দৃষ্টান্তস্বরূপ নাম করা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বোধ হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাটিকাখানি যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তি লাভ করতে পেরেছিল তার প্রমাণ, তা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব পত্রিকা "বঙ্গদর্শনে"। বিচারপতি স্যার গুরুদাসকে সবাই সাহিত্যরসিক ব'লেই

জানে, কিন্তু তিনি যে কখনো অক্ষর গুণে কবিতা-রচনা করবার জন্যে উৎসাহিত হয়েছিলেন, সে খবর পাওয়া যায় "রবীন্দ্রজীবনী"র মধ্যেই। নট-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাঁকে এতটা উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলেছিল যে, তিনি মনের আবেগে সদ্য সদ্য একটি পদ্য (বা গান) রচনা না ক'রে থাকতে পারেন নি।

উক্ত পদ্যের দুটি পংক্তি এই :

"উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্ব্বার।"

সদ্যোদ্ভিন্নযৌবন রবীন্দ্রনাথের পরমসুন্দর দেহ যে নয়নানন্দদায়ক ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই ; তার উপরে তাঁর রচনাপটুতা ও নাট্যনিপুণতা দেখেও দর্শকরা যে অভাবিত বিস্ময় অনুভব করেছিলেন, এ কথাটাও সহজে বোঝা যায় ; এইটেই প্রকাশ পেয়েছে স্যার গুরুদাসের কবিতায়। কিন্তু তা ছাড়াও এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। সেই কাঁচা বয়সেই রচনাসৌকর্য্যের জন্যে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের এবং বাইরের কারুর কারুর কাছ থেকে তিনি নিশ্চয়ই উচিতমত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। কিন্তু গুরুদাসের অভিনন্দনে আছে তার চেয়ে বেশী আরো কিছু। এ হচ্ছে রীতিমত ভবিষ্যদ্বাণী—এর আগে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট ও সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করতে আর কেউ পারেন নি।

মোট কথা, নট-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ সব দিক দিয়েই সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। "বাল্মীকি-প্রতিভা"র বারংবার অভিনয় তার লোকপ্রিয়তাও প্রমাণিত করে। বিশেষত: ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পুনরভিনয় হচ্ছে একটি উল্লেখনীয় ঘটনা। "রবীন্দ্রজীবনী"র লেখক বলেছেন : "আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য টাকা তুলিবার প্রয়োজন হইলে ষ্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা হয় ; আমাদের মনে হয় পাবলিক রঙ্গমঞ্চে কবির অভিনয়ও এই প্রথম।" কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রনাথকে যে ঠাকুর-বাড়ীর বাইরে এনে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেয় আমাদের পাবলিক থিয়েটারই, এটাও মনে রাখবার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যজীবনের ক্রমবিকাশ

পেশাদার রঙ্গালয়েই (বিডন ষ্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারে) রবীন্দ্রনাথ সাধারণ জনতার সঙ্গে প্রথম সংযোগ স্থাপন করেন বটে, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সৎকার্য্যে সাহায্য করা; কারণ টিকিট বেচে যত টাকা ওঠে তা দান করা হয়েছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজের তহবিলে। এইভাবে একই রকম উদ্দেশ্যে তিনি বার বার টাকা তুলেছিলেন শেষ-জীবন পর্য্যন্ত। বরাবরই তিনি ছিলেন সৌখীন নাট্যশিল্পী এবং তাঁর এই নাট্যজীবনের দীর্ঘতার তুলনা গোটা ভারত খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

বাংলা দেশে আর কোন সৌখীন বা পেশাদার নাট্যশিল্পীর সাধনা রবীন্দ্রনাথের মত ব্যাপক হ'তে পারে নি। এ বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলে দেখা যায়, কলকাতার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রথম বাঙালী প্রবর্ত্তক নট-নাট্যকার কালী-প্রসন্ন সিংহের জীবনকাল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত (১৮৪১—১৮৭০ খৃঃ) বা ত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সুরু হয়ে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই শেষ হয়েছিল। তার পর বৎসরেই তিনি একখানি সংস্কৃত নাটক ("মালতী-মাধব") অনুবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু সেখানি অভিনীত হয়েছিল কিনা জানি না। স্বল্পস্থায়ী বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ লুপ্ত হবার কয়েক বৎসর পরে কালীপ্রসন্ন শোভাবাজার রাজবাড়ীর নাট্য-সম্প্রদায়ে যোগ দেন, তবে সেখানে নাট্যকার বা অভিনেতা রূপে কোন অংশই গ্রহণ করেন নি। তারপর উঠতে পারে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়ার নাট্যশালার কথা। সেখানে প্রথম যবনিকা ওঠে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে। কিন্তু তার কার্য্যকাল চার বৎসর পূর্ণ হ'তে না হ'তেই রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পড়েন অকালমৃত্যুর মুখে এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালা উঠে যায়। এইভাবে নিষ্ঠুর অকালমৃত্যুর আবির্ভাবে গোড়াপত্তনের যুগেই দুই দুইজন মুখ্য নেতার অকুণ্ঠ দান থেকে বাংলা নাট্যকলা বঞ্চিত হয়।

তারপর এক্ষেত্রে দেখা দেন পাথুরিয়াঘাটার বাবু (পরে মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কিন্তু নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেও তিনি নট ছিলেন না, মাঝে মাঝে নাটক রচনা করতেন। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার কার্য্যকাল ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তারপর যতীন্দ্রমোহন দীর্ঘকাল ইহলোকে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু

নাট্যকার বা অভিনয়ের উদ্যোক্তা রূপে আর কখনো দেখা দেন নি; সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নাট্যকলা ছিল না তাঁর জীবনের ব্রত। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন ওঁদেরই সমসাময়িক এবং কি অভিনয়ে, কি নাটকরচনায় ও কি নব নব নাট্যানুষ্ঠানে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল রীতিমত স্মরণীয়। কিন্তু দীর্ঘজীবী হয়েও জীবনের উত্তরার্দ্ধে তিনি অভিনয়ের ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

এই সঙ্গে এখানে বাংলা দেশে পেশাদার অভিনেতাদেরও কথা তোলা যেতে পারে। অধিকাংশ বৈতনিক নট সৌখীন শিল্পীদের নিজেদের পর্য্যায়ে স্থান দিতে রাজি হন না, সৌখীনদের যেন নীচু চোখেই দেখতে চান। কিন্তু "অ্যাম্যাচার" বললেই যে কাঁচা শিল্পী বুঝতে হবে, সময় বিশেষে এটা হচ্ছে একান্ত বাজে যুক্তি। এমন অনেক পেশাদার অভিনেতাকে দেখেছি, যাঁরা কোন চলনসই সৌখীন সম্প্রদায়েরও মর্য্যাদাবৃদ্ধি করতে পারেন না। আবার এমন সব সৌখীন অভিনেতাও দেখা গিয়েছে, পেশাদার রঙ্গালয়ে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাঁরা লাভ করেছেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর সম্মান। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে এই শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন গিরীশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি।

তারপর গিরীশোত্তর যুগের কথা স্মরণ করুন। অজ্ঞাতনামা সৌখীনদের দল থেকে এসে শিশিরকুমার যোগ দিলেন বিজ্ঞাপন-বিখ্যাত পেশাদারদের দলে। একদিনেই তিনি এলেন, তিনি দেখলেন, তিনি জয় করলেন। তারপরেই বেধে গেল এক বিস্ময়কর বিপ্লব। বিনা পয়সায় অভিনয় দেখবার সুযোগ পাওয়া যেত ব'লে জনসাধারণ যে সৌখীন অভিনেতাদের যেন কোনরকমে সহ্য করত মাত্র, পেশাদারদের দলে তাঁদেরই লাভ করবার জন্যে সকলেই দস্তুরমত ব্যগ্র হয়ে উঠল। ম্যাডানদের কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার ও ষ্টার থিয়েটারের পরিচালকরা দিকে দিকে চর পাঠাতে লাগলেন যে প্রকারেই হোক সৌখীন অভিনেতাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে। তারই ফলে পেশাদার রঙ্গালয়ে ক্রমে ক্রমে রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির আগমন। এবং সেই সাময়িক হিড়িকের সুযোগ নিয়ে কতিপয় চুনোপুঁটিও ভিড়ে গিয়েছিলেন রুই-কাৎলার দলে। কিন্তু শেষোক্তদের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, সফরীর লম্ফঝম্প দেখে শেষ পর্য্যন্ত কেউ রুই মাছের ঘাই ব'লে ভ্রম করতে রাজি হয় নি।

অনেক পেশাদার নট যেমন সৌখীনদের সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা পোষণ করেন, কোন কোন কারণে পেশাদার নট (ও নাট্যাভিনয়) সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরও তেমনি একটি নিজস্ব ধারণা ছিল। ১৩৩৪ সালে একবার রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁর মুখে রঙ্গালয়ের

প্রসঙ্গ শ্রবণ ক'রেছিলুম। তিনি বলেছিলেন: "সাধারণ রঙ্গালয়ের শিল্পীরা দিনের পর দিন ধ'রে দীর্ঘকাল একই নাটকে একই ভূমিকায় নামতে বাধ্য হন। মানুষ কলের পুতুল নয়, প্রকৃত শিল্পীর প্রাণ এই একঘেয়ে জীবনের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।" রবীন্দ্রনাথ আরো কিছু কিছু মত প্রকাশ করেছিলেন, পরে তা নিয়ে আলোচনা করব যথাসময়ে।

এইবার আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। বাংলা দেশের প্রাথমিক ও অবৈতনিক নাট্যশিল্পীদের নাট্যজীবন দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নি, এটুকু আমরা দেখেছি। অতঃপর এখানকার পেশাদার রঙ্গালয়ের কয়েকজন প্রবীণ শিল্পীর নাট্যজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। সর্ব্বপ্রথমে গিরীশচন্দ্রের কথা। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন মঞ্চাবতরণ করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন শিশু বা বালক। তাঁর শেষ অভিনয় হয় ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ঐ বৎসরেই, আটষট্টি বৎসর বয়সে। অর্দ্ধেন্দুশেখর ষাট বৎসর পূর্ণ না হ'তেই পরলোক গমন করেছিলেন (১৩১৫ সালে) এবং গিরীশচন্দ্রের চেয়েও তিনি ছিলেন বয়সে ছোট। অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু ও দানীবাবুর নাট্যজীবনও হয়েছিল গিরীশচন্দ্রের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। একমাত্র অমৃতলাল বসুর (জন্ম ১২৬০ সাল) নাট্যজীবনই ওঁদের সকলের চেয়ে দীর্ঘ হয়েছিল (১২৭৯ থেকে ১৩৩৬ সাল পর্য্যন্ত)।

কিন্তু পেশাদার রঙ্গালয়ের পূর্ব্বোক্ত শিল্পীদেরও চেয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন হয়েছিল দীর্ঘতর। তাঁর প্রথম ও শেষ অভিনয়ের তারিখ হচ্ছে যথাক্রমে ১৮৭৭ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তারপরেও কয়েক বৎসর ধ'রে প্রায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নূতন নূতন পালা রচনা ও নৃত্যগীতাভিনয়ের ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী রূপে তিনি সকলের বিস্মিত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে আছেন বটে, কিন্তু নাট্যকলা-চর্চ্চার ক্ষেত্রেও এদেশে আর কোন কর্ম্মী তাঁর মত দীর্ঘকাল ধ'রে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বারে বারে সাড়া দিয়েছেন বৈচিত্র্যের ডাকে—আর্ট ও সাহিত্যের বিরাট জগতে প্রবেশ ক'রে বিচরণ করেছেন তিনি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এবং সেখান থেকে তাঁর ভাবগ্রাহী চিত্ত অজস্র পরিমাণে যে সব অমূল্য নিধি চয়ন করেছে, তাহা নিজের রত্নপ্রসবিনী লেখনীর মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে। কিন্তু ওরই মধ্যে একটি সত্য অত্যন্ত জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে। নাট্যকলার অনুরক্ত ছিলেন তিনি শৈশব থেকেই এবং আজীবন তাকে ভুলতে পারেন নি। তিনি বাংলা দেশের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক —বঙ্কিম-যুগ থেকে অতি-আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত রচনা করেছেন বহু কথাগ্রন্থ। বাংলা

ভাষায় প্রথম বাস্তব উপন্যাস তাঁরই লেখনীপ্রসূত। এ বিভাগে তাঁর দক্ষতা ছিল যে অতুলনীয়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই; কিন্তু তবু মনে হয়, নিজের মনের প্রেরণা থেকে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই জন্মলাভ করেনি, তারা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকার জোর তাগিদে।

কিন্তু নাট্যসাহিত্যের দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রায় দুর্নিবার। গদ্যে ও পদ্যে যখন যে শ্রেণীর রচনাই তাকে পেয়ে বসেছে, তখনই থেকে থেকে অন্যান্য বিষয়বস্তু পরিহার ক'রে তিনি বারংবার ফিরে এসেছেন নাটক নাটিকার কাছে। নাট্য রচনার ঝোঁক ছিল তাঁর মজ্জাগত, এজন্যে কারুকে কোনদিন অনুরোধ করতে হয় নি। তাঁর ছিল যথার্থ নাট্যকারের প্রাণ, নাট্যসাধনা ছিল যেন তাঁর অন্যতম জীবনব্রত। কোন আখ্যান-বস্তু অবলম্বন ক'রে উপন্যাস ও গল্প রচনা করলেও তাঁর মন যেন পরিতৃপ্ত হ'ত না, পরবর্ত্তীকালে তাকে নাট্যরূপ না দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন নি। প্রথম যৌবনে বিশ বৎসর বয়সে রচনা ক'রেছিলেন, তাঁর প্রথম উপন্যাস "বউঠাকুরাণীর হাট" (তারও আগে "করুণা" উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে রচনাটি সমাপ্ত হয় নি)। তারও দীর্ঘকাল পরে ঐ উপন্যাস থেকে ক্ষেপে ক্ষেপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, "প্রায়শ্চিত্ত", "মুক্তধারা" ও "পরিত্রাণ" নাটক। "বালক" পত্রিকার জন্যে তিনি রচনা করেছিলেন "রাজর্ষি" উপন্যাস। পরে তা পরিণত হয় "বিসর্জ্জন" নাটকে। তাঁর আরো কোন কোন গল্প—এমন কি কবিতাও পরে লাভ করেছিল নাটকের আকার। এই সব দৃষ্টান্ত দেখে এবং অন্যান্য কারণে অনুমান করা চলে যে, উপন্যাসের চেয়ে নাটকের দিকেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের টান ছিল বেশী।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রেম হচ্ছে, কবিতা। গল্প-উপন্যাসই লিখুন আর নাটক-প্রহসনই লিখুন,—এমন কি গদ্য নিবন্ধ লেখবার সময়েও কখনো তিনি ভুলতে পারে নি কাব্যসুন্দরীকে। লিখতে বসলেই কাব্যরসে অভিষিক্ত হয়ে উঠত তাঁর যে-কোন রচনা। তাই সর্ব্বপ্রথমে কবিতার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁর নাট্যসাধনা। তারই প্রথম ফল হচ্ছে "বাল্মীকি-প্রতিভা"। কিন্তু সে নাটক কেবল সঙ্গীতের সমষ্টি। তারপরেই তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম নাট্যকাব্য "রুদ্রচণ্ড"। যদিও পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিজের তরুণ বয়সে রচিত এই নাট্যকাব্যখানিকে অকিঞ্চিৎকর ব'লেই মনে করতেন, তবে আর এক দিক দিয়ে রচনাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করতে পারি। বাঙালীকে যথার্থ নাট্যকাব্য উপহার দেন সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথই। পরে "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জ্জন" প্রভৃতি যে সব অপূর্ব্ব ও অনবদ্য রচনা নিখিল গৌড়জনকে

আনন্দরসে আপ্লুত ক'রে তুলেছিল, এই "রুদ্রচণ্ড" থেকেই তার সূত্রপাত। প্রায় এই সময়েই রচিত হয়েছিল "বউ ঠাকুরাণীর হাট" এবং বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথের হাত তখনো পাকে নি। তবু পরিণত বয়সেও ঐ রচনার গল্পাংশ নিয়ে তিনখানি নাটকের খসড়া তৈরি করবার লোভ তিনি সামলাতে পারেন নি। কিন্তু "রুদ্রচণ্ড"-এর মধ্যে তেমন কোন লোভনীয় বস্তুর সন্ধান না পেয়ে তিনি বরাবরই তার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। আমরা কিন্তু তাঁর প্রথম নাট্যকাব্য ব'লেই "রুদ্রচণ্ড"-এর কথা মনে ক'রে রাখতে চাই।

ঐ বয়সেই তিনি রচনা করেন "ভগ্নহৃদয়", তাঁর মতে যা হচ্ছে "নাটকাকারে কাব্য"। এর মধ্যেও প্রধানতঃ কাব্যকেই অবলম্বন ক'রেও তিনি নাটকের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে পারেন নি, কারণ নাটক রচনার সুযোগ না পেয়েও কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন নাটকের আকারে এবং এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, সে সময়ে নাটকের দিকেও তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল কতখানি! কিন্তু এতটা নাট্যপ্রীতি বোধ করি কবিতা দেবীর সহ্য হ'ল না, কারণ তারপরেই কিছু দিনের জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসলেন এবং সেই সময়েই কবি রচনা করেন "সন্ধ্যাসঙ্গীত"—রবীন্দ্রনাথ যাকে নিজের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতাপুস্তক ব'লে মনে করতেন।

তারপর কাব্যসাধনা করতে করতেই আবার এল নাট্যসাধনার সুযোগ। সে হচ্ছে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর। বাড়ীতে জ্ঞানী ও গুণীদের সভা বসবে এবং সেই উপলক্ষে হ'ল নূতন কোন নাট্যাভিনয়ের প্রস্তাব। রবীন্দ্রনাথ "বাল্মীকি-প্রতিভা"র আদর্শে রচনা করলেন "কালমৃগয়া" নামে সঙ্গীতময়ী নাটিকা। বাড়ীর সুপ্রশস্ত ত্রিতলের ছাদে সাজানো হ'ল রঙ্গমঞ্চ। রবীন্দ্রনাথ (অন্ধমুনি) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (দশরথ) পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন এবং অভিনয় দর্শন করলেন বহু সাহিত্যিক, পত্রিকা-সম্পাদক এবং অন্যান্য মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ। সে অভিনয় তৎকালীন রসিকসমাজ এবং সংবাদপত্রের প্রশংসা লাভ ক'রেছিল। তারপর আবার বইল খানিকটা নাট্যলোকের বাতাস—পরে পরে রচিত হ'ল "প্রকৃতির প্রতিশোধ" ও "নলিনী"। প্রথমোক্ত রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।" দ্বিতীয় রচনাটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক, তা ছাড়া তার সম্বন্ধে উল্লেখ্য আর কিছু নেই। তারপর কিছুকালের জন্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাধনায় ছেদ পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটিকা "নলিনী" রচিত হয় ১২৯১ সালে। অভিনয়ের

জন্যেই নাটিকাখানি লিখিত হয় বটে, কিন্তু পারিবারিক বিপদ-আপদের জন্যে তা আর পাদপ্রদীপের আলো দেখবার অবসর পায় নি। এবং পরেও এই রচনাটিকে মঞ্চের উপরে উপস্থিত করা হয়নি, কারণ নাট্যকারের মনে হয়েছিল যে, নাটক হিসাবে তার মূল্য বেশী নয়। তাঁর এই ধারণা সত্য কিনা, এখানে সে আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু তারপর বেশ কিছুকালের জন্যে রবীন্দ্রনাথ নাট্যজগতের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং একনিষ্ঠ হয়ে কবিতাদেবীর সাধনায় নিযুক্ত হন।

রবীন্দ্রনাথ যে শক্তিধর উদীয়মান কবি, ইতিমধ্যেই সে কথা সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল যে, তিনি হচ্ছেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের একজন অনন্যসাধারণ কবি। তাঁর কাব্যপ্রতিভায় সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়; সমগ্র সাহিত্যজগৎ। এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত "শৈশব সঙ্গীত", "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী", "কড়ি ও কোমল", "মানসী" ও "সোনার তরী" প্রভৃতি অমূল্য কবিতাপুস্তক। তাঁর রচনাশক্তি যদি ঐখানেই নিঃশেষিত হয়ে যেত, তা'হলেও তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমর হয়ে থাকতে পারতেন।

কিন্তু কিছুকাল নিছক কবিতার চর্চ্চা ক'রে ঐ সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ আবার নাট্যজগতে ফিরে না এসে পারলেন না এবং ফিরে যখন এলেন, তখন তাঁর নাট্যপ্রতিভাও হয়েছে রীতিমত পরিপুষ্ট। ১২৯৫ সাল থেকে ১২৯৯ সালের মধ্যে তাঁর এই প্রখ্যাত নাট্য রচনাগুলি প্রকাশিত হয়—"মায়ার খেলা", "রাজা ও রাণী", "বিসর্জ্জন" "চিত্রাঙ্গদা" ও "গোড়ায় গলদ"। অতঃপর আমরা একে একে এই নাটকগুলির কথা নিয়ে আলোচনা করব।

*

রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে কবিতাকে নিয়েই মেতেছিলেন, এমন সময়ে এক বিদুষী মহিলার অনুরোধ এড়াতে না পেরে আবার নাট্যজগতের জন্যে লেখনী ধারণ করতে বাধ্য হ'লেন। মেয়েদের অভিনয়ের উপযোগী ক'রে একটি পালা লিখে দিলেন, নাম তার "মায়ার খেলা"। কবির মতে সেখানি হচ্ছে, "নাট্যের সূত্রে গানের মালা"। স্বর্ণ কুমারী দেবীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহিলাসভা "সখী সমিতির" চেষ্টায় ১২৯৫ সালে বেথুন স্কুলে সেই নাটিকাখানি যখন প্রথম অভিনীত হয়, আমি তখন প্রায় মাতৃক্রোড়—অর্থাৎ সাত আট বৎসরের বালক। কিন্তু তার বহুকাল পরে কবির ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর উদ্যোগে এম্পায়ার থিয়েটারে "মায়ার খেলা"র পুনরভিনয় হয় এবং সে আসরে উপস্থিত হবার সুযোগ আমি পেয়েছিলুম। সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কেবল গীতকার ও সুরকার, কারণ প্রয়োগশিল্প ও অভিনয়ের ভার গ্রহণ করেছিলেন কেবল

মহিলারাই। বেশ মনে আছে, সব দিক দিয়েই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সার্থক হয়ে উঠেছিল। স্মরণ হচ্ছে, তার আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে বোধ করি গিরীশচন্দ্রেরই রচিত নাট্যের সূত্রে গাঁথা আর একটি গানের মালা দেখেছিলুম, কিন্তু "মায়ার খেলা"র সেই নাট্যাভিনয়ের কাছে তার স্মৃতি সকল দিক দিয়েই পরিম্লান হয়ে গিয়েছিল। "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় নট-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাধীন আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ব'লে ঐ গীতিনাট্যখানি নিরতিশয় বিখ্যাত হয়ে আছে বটে, কিন্তু রচনার দিক দিয়ে "মায়ার খেলা" অধিকতর উন্নত ও সংস্কৃত। "বাল্মীকি-প্রতিভা"র মধ্যে আছে কবি বিহারীলালের প্রভাব; কিন্তু "মায়ার খেলা"র মধ্যে দেখি স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথকেই। উপরন্তু "বাল্মীকি-প্রতিভা"র চেয়ে "মায়ার খেলা"র গানগুলির মধ্যেও পাওয়া যায় সুরকারের সমধিক নিপুণতার পরিচয়। অদ্যাবধি নাট্যের সূত্রে গাঁথা গানের মালা হিসাবে "মায়ার খেলা" অদ্বিতীয় হয়ে আছে আমাদের নাট্যজগতে।

রবীন্দ্রনাথ একমনে বিচরণ করছিলেন কাব্যকুঞ্জবনে, "মায়ার খেলা"র নাট্যাভিনয় আবার তাঁর চিত্তে জাগিয়ে তুললে বোধ করি রঙমহলের স্বপ্নকে। বীণাপাণির কমলকাননে আসীন হয়েই শুনতে পেলেন তিনি নটরাজের ডম্বরুধ্বনি। কয়েক মাসের মধ্যেই রচনা করলেন এমন এক নাটক, যার মধ্যে কাব্যরসের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে নাট্যরসের ধারা। পালাটির নাম দিলেন "রাজা ও রাণী"। এর আগে এমন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বৃহৎ নাটক আর তিনি রচনা করেননি। রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল আটাশ বৎসর। কিন্তু আটাশে পড়বার আগেই রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল, তাঁর পক্ষে আর নতুন কিছু করবার আশা নেই, কারণ একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "সাতাশ বৎসরে মানুষকে এক রকম ঠাহর করা যায়—বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েচে।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী জীবনই প্রমাণিত করেছিল তাঁর এ ধারণা কতখানি ভ্রান্ত!

"রাজা ও রাণী"ই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক, যা সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে নাট্যকার রূপে তাঁর নামকে অত্যধিক জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তার এই জনপ্রিয়তার একটা কারণ বুঝতে বিলম্ব হয় না। তিনি যে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ, তা ছিল এলিজাবেথীয় যুগধর্ম্মী। "রাজা ও রাণী" রচনার সময়েও তিনি সেই যুগধর্ম্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারেননি। বাংলা রঙ্গালয় আজও এলিজাবেথীয় যুগধর্ম্মের মধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে, সুতরাং তখনকার কথা বলাই বাহুল্য। এই কারণেই "রাজা ও রাণী" হয়েছিল বাংলার লোকসাধারণের মনের মত।

কাব্যের সঙ্গে নাট্যকে মিলিয়ে দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরীক্ষা করেন ১২৯১

সালে, "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামে রচনায়। কয়েক বৎসর পরে (১২৯৬ সাল) রচিত "রাজা ও রাণী"তে হয়েছে সেই পরীক্ষারই পরিণতি। প্রথম পরীক্ষা আংশিকভাবে সফল হয়েছিল, কারণ "প্রকৃতির প্রতিশোধ" পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়: কিন্তু "রাজা ও রাণী" সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। এর মধ্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। এই রচনাটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন সুর জুড়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কাব্যরসের দিক দিয়ে চমৎকার হ'লেও নাটকত্বের দিক দিয়ে "রাজা ও রাণী" নিখুঁত রচনা নয় এবং বাংলা সাহিত্যের যে যুগে ঐ রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সে যুগটাও বোধ করি নিখুঁত নাটক রচনার অনুকূল ছিল না। আমাদের নাট্যসাহিত্য আজও বিশেষভাবে নিজের সাবালকত্ব প্রমাণিত করতে পারে না এবং সে যুগটাকে তার শৈশবকাল বললেও অত্যুক্তি হবে না। "রাজা ও রাণী"র এই অপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বহুকাল পূর্ব্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তার দ্বিতীয় সংস্করণেই যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের আশ্রয় নেন। নিজের প্রকাশিত বিবিধ রচনাকে রবীন্দ্রনাথ যেমন বারংবার পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করেছেন, পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিক তা করেছেন ব'লে জানি না। উপরন্তু "রাজা ও রাণী" যতবার আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের আর কোন রচনাই তা হয় নি, এমন কি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরেও পরিণত বয়সে কঠোর সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাকে প্রায় ঢেলে সেজেছিলেন বললেও চলে। গিরীশচন্দ্র স্বলিখিত নাটক পরিবর্ত্তিত করতে চাইতেন না, কারণ তাঁর মত ছিল, নাটক বদলাতে গেলেই তা নূতন নাটক হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর এই মত সব জায়গায় খাটে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু বার বার পরিবর্ত্তনের ফলে "রাজা ও রাণী" যে সত্য সত্যই প্রায় নূতন নাটকে পরিণত হয়েছিল, "তপতী"র দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। "রাজা ও রাণী" জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু জনতার মধ্যে "তপতীর" সমজদার খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। মনগড়া কথা নয়, পরীক্ষিত সত্য।

"রাজা ও রাণী" সম্বন্ধে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছিলেন: "কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যুদ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয়।" সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের দর্শকরা সূতিকাগারের বাইরে এসেও মস্তিষ্কচালনা করতে নারাজ, তাই কুমার ও অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের নির্ব্বাসিত করেছে ব'লে "তপতী"কেও তারা হরিজনের মত ত্যাগ

করেছিল। এখানে যে সব নাট্যের বিষয় অবান্তর পাত্রপাত্রীদের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং দ্বিধা—এমন কি ত্রিধা-বিভক্ত, তারাই হয় ঘন ঘন করতালির দ্বারা অভিনন্দিত। জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে "সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত" ও "আলমগীর" প্রভৃতি।

রচনার কিছুদিন পরেই (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে) ঠাকুরদের পারিবারিক রঙ্গালয়ে "রাজা ও রাণী" যখন অভিনীত হয়, আমি তখন মাতৃস্তন্য ছাড়া পৃথিবীর আর সব রস থেকেই বঞ্চিত। "রবীন্দ্রজীবনী"তে প্রকাশ: "রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেবের, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (নাট্যকারের দ্বিতীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী) সুমিত্রার এবং মৃণালিনী দেবী (নাট্যকারের সহধর্ম্মিণী) নারায়ণীর ভূমিকায় নামেন। মৃণালিনী দেবী ইতিপূর্ব্বে বা অতঃপরে কখনো অভিনয় করেন নাই; নারায়ণীর ভূমিকা তিনি নাকি অপূর্ব্ব সফলতার সহিত করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া'য় বলিয়াছেন যে, থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীরা কোনক্রমে পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ির অভিনয় দেখিয়া যায় এবং কয়েকদিন পরে এমারেল্ডে যে অভিনয় হয় (১৮৮৯, নভেম্বর ৩০) তাহাতে অভিনেত্রীরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অভিনয়ের ঢং আশ্চর্য্যরূপে অনুকরণ করিয়াছিল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পোশাকপরিচ্ছদ, গলার স্বর, বলিবার ভঙ্গি প্রভৃতি যে ভাবে অনুকৃত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।" সেই নাট্যানুষ্ঠানের আরো দুইজন অভিনেতার নাম জানা যায়: চিত্রশিল্পে যশস্বী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বাংলা কথ্যভাষার পুরোধা প্রমথ চৌধুরী —তিনি সেজেছিলেন কুমার সেন।

ঠাকুরদের সে অভিনয়ের অবলম্বন ছিল প্রথম সংস্করণের "রাজা ও রাণী"। সুতরাং সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ যে তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জনপ্রিয়তার প্রভূত উপাদান, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। এবং সে ধারণাও সত্যে পরিণত হয়েছিল, কারণ সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকরা রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম নাটককে সাদরে গ্রহণ করেছিল। আমার বাল্যকালে শুনেছি "রাজা ও রাণী"র গানগুলি ঘরে-বাইরে বৈঠকে বৈঠকে ও পথে-ঘাটে স্ত্রীপুরুষের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হচ্ছে। সেই অভিনয়ের কুশীলব ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের বিখ্যাত শিল্পীরা—যথা মতিলাল সুর (বিক্রমদেব), মহেন্দ্রলাল বসু (কুমারসেন), হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য (দেবদত্ত), 'গুলফম' হরিমতী (রাণী) ও "বিষাদ"-এর নাম-ভূমিকায় বিখ্যাত কুসুমকুমারী (ইলা) প্রভৃতি। খুব সম্ভব তখনকার সে অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে আমিও "রাজা ও রাণী"র অভিনয় দেখেছিলুম। কিন্তু সে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা!

নাট্যকার যে মনে-প্রাণে কবি, "রাজা ও রাণী" তা প্রমাণিত করে পদে পদে। প্রধানতঃ কবিতায় রচিত ব'লেই যে এই নাটকখানি কাব্যধর্ম্মী হয়ে উঠেছে, তা নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী নাটক "বিসর্জ্জন"ও ঐ শ্রেণীর রচনা, কিন্তু নাট্যকার সেখানে ভাবপ্রবণতার চেয়ে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে চরিত্রচিত্রণের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছেন অধিকতর। কেবল ভাবপ্রবণতা নয়, "রাজা ও রাণী"র স্থানে স্থানে কেউ যদি ভাবোন্মাদের দৃষ্টান্তও আবিষ্কার করেন, তাহ'লেও আমরা বিস্মিত হব না। অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবপ্রবণ হ'লে কবির ক্ষতি হয় না, কিন্তু নাট্যকার তা হ'তে পারেন না, কারণ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে দেখতে হয় বিশ্বসংসারকে। বাংলা সাহিত্যে এমন একটা যুগ গিয়েছিল যে সময়ে পাঠকরা অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা বা ভাবোন্মাদের দ্বারা অভিভূত না হয়ে পারত না। "রাজা ও রাণী" সেই যুগেই রচিত এবং তার লোকপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণও হচ্ছে ঐ ভাবপ্রবণতাই। এবং ঐ একই কারণে সেই সময়ে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা রচিত আরো নানাশ্রেণীর কয়েকটি রচনা লাভ করেছিল প্রভূত প্রশস্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখিত "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"-এর নামোল্লেখ করা যায়। আজ তার ক্রেতা যদি থাকে, তবে তাদের সংখ্যা হবে নগণ্য, কিন্তু একসময়ে তা বিক্রীত হয়েছিল 'উত্তপ্ত পিষ্টকে'র মত।

কিন্তু গত শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে "রাজা ও রাণী"কে স্থানচ্যুত ক'রে "তপতী" যদি আসর দখল করবার জন্যে চেষ্টিত হ'ত, তবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনাটি নিশ্চয়ই সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে প্রবেশ করবার সুযোগ লাভ করত না। প্রথম সংস্করণের "রাজা ও রাণী"র মধ্যে দেখা যায়, "কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা" কেবল "নাট্যের বিষয়টি"কে "ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত"ই ক'রে তোলেনি, উপরন্তু এমন একাধিক জনতা-দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, যা গ্যালারির দর্শক ও নিম্নতর শ্রেণীর পাঠকদেরও মধ্যে প্রচুর উপভোগের খোরাক পরিবেশন করতে পারে। আমরাও বাল্যকালে তার মধ্যে যথেষ্ট তামাসার সন্ধান পেয়েছি। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়েও এই সব দৃশ্য গৃহীত হয়ে প্রেক্ষাগৃহকে যে হাস্যকোলাহলে মুখরিত ক'রে তুলেছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং সত্য কথা বলতে কি, দেবদত্ত, ত্রিবেদী, নারায়ণী ও অন্যান্য নাগরিকদের কৌতুকাভিনয় দেখলে যে আজও আমরা মজা পাব না বা উপভোগ করব না, এমন কথা কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। "তপতী"র মধ্যে ঐ সব দৃশ্য নেই ব'লে অভিযোগ ক'রে নিজের অরসিকতা বা হেটো মনোবৃত্তি জাহির করতে চাই না, কিন্তু আধুনিক বাংলা রঙ্গালয়ে হাস্যরসের যে রকম দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তাতে ঐ সব জনতা-দৃশ্য আবার দেখবার জন্যে মনে মনে লোভও হয় বৈকি।

প্রথমেই সাধারণ রঙ্গালয়ের "রাজা ও রাণী" নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, যদিও বাল্যবয়সেই পুস্তকাকারে তা পাঠ এবং তৎকালে বহুল প্রচারিত তার কতক-গান রীতিমত কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেছিলুম। আগেই বলেছি, "রাজা ও রাণী"র গানগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ে গীত হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত। এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প শোনা আছে। রবীন্দ্রনাথ একদিন পথ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পান, চিৎপুর রোডের কোন্ দ্বিতল কক্ষ থেকে কে এক গায়কপুঙ্গব হারমোনিয়াম ও তবলা সহযোগে এইভাবে ''রাজা ও রাণী"র এই গানটি গাইছে—

"শখী, ঐ বুঝি বাঁশী বাজে,
বন্ মাঝে কি মন্ মাঝে।"

নিজের গানের গাইবার ঢং ও কথার উচ্চারণ শুনে রবীন্দ্রনাথের মন নাকি সচকিত ও শিহরিত হয়ে উঠেছিল।

তিন যুগেরও আগে ভবানীপুরের এক সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের আসরে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে আমি "রাজা ও রাণী"র প্রথম অভিনয় দেখবার সুযোগ পাই। অভিনেতারা সবাই ছিলেন শিক্ষিত পুরুষ, তাঁদের মধ্যে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও স্বর্গীয় ধরণী রায় পরে যথাক্রমে মঞ্চে ও চিত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। শঙ্করের ভূমিকায় ধরণী রায়ের নাট্যনিপুণতার কথা আজও আমি ভুলতে পারি নি। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ষ্টার থিয়েটারে দেখেছিলুম, "রাজা ও রাণী"র ভূমিকায় ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিক্রমদেব), ক্ষেত্রনাথ মিত্র (কুমারসেন) ও সুশীলাবালা (ইলা) প্রমুখ খ্যাতনামা নট-নটীগণ। তাঁরা সবাই আজ পরলোকে। একমাত্র সুশীলাবালা ছাড়া আর কারুর অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়নি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট অভিনয় করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সাতষট্টি বৎসর বয়সে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের ভবনে "তপতী"র বিক্রমদেবের ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। নানা কারণে সে অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন যাঁদের কাছে সুপরিচিত তাঁরাই জানেন, কবির ভাবের নদীতে মাঝে মাঝে যখন এক এক ভাবের জোয়ার এসেছে, তখন তাঁর চিত্ত বেশ কিছুকালের জন্যে তার স্নিগ্ধতাতেই মুগ্ধ হয়ে একান্তভাবে উপভোগ করেছে অবগাহন-আনন্দ। তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখি কখনো কাব্যের, কখনো কথাসাহিত্যের, কখনো নানাবিষয়িনী প্রবন্ধমালার, কখনো সঙ্গীতের এবং কখনো বা নাট্য নৃত্য বা চিত্রের দিকে ; —আর্ট ও সাহিত্যের এমনি বিচিত্র রাগিণী জীবনবীণার তারে তারে বাজাতে বাজাতে

সানন্দে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি নিজের চরম পরিণামে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন এক জায়গায়, এক বাসায় বেশী দিন বাস করতে পারতেন না, "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া" ব'লে দিকে দিকে ঠাঁইনড়া হয়ে বেড়িয়েছেন, সেইরকম বৈচিত্র্যের মহিমায় বিচিত্রিত হ'তে চাইত তাঁর শিল্পীজীবনও। কিছুকাল নিছক সাহিত্যক্ষেত্রেই গদ্য ও পদ্য নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবার পর সখীসমিতির তাগিদে "মায়ার খেলা" রচনা ক'রেই আবার তাঁর নাটুকে হাত সক্রিয় হয়ে উঠল এবং তারপরেই রচনা করলেন তিনি তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক "রাজা ও রাণী"। পর বৎসরেই (১২৯৭ সাল) তাঁর লেখনী প্রসব করলে অপূর্ব্ব নাট্যকাব্য "বিসর্জ্জন"। এর জন্মের আগে কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে বা পদ্যে ছোট বা বড় অন্যান্য শ্রেণীর কোন রচনায় হাত দেননি বললেই চ'লে, বোধ করি অভিনব কোনকিছুর প্রস্তুতির জন্যে তাঁর পরিকল্পনা নিজেকে সংহৃত ক'রে রাখতে চেয়েছিল। তারই ফলে হয়তো বাংলার নাট্যসাহিত্য লাভ করেছে এই অতুলনীয় রত্ন।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি বিশেষরূপে স্মরণীয় হবার যোগ্য। কারণ এর পর তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত আর প্রকৃত নাটকরচনায় হস্তক্ষেপ করেননি, সাধারণ সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি তাঁকে প্রায় পরিপূর্ণভাবেই আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল (১২৯৭ থেকে ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত)। সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর পরে যখন "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক লেখেন, তখন তিনি অবলম্বন করেছিলেন দৃশ্যকাব্যরচনায় নূতন ধারা। "বিসর্জ্জন"-এর প্রায় এক বৎসর পরেই "চিত্রাঙ্গদা" রচিত হয় বটে, কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ নয়, খণ্ড নাট্যকাব্য। এবং ইতিমধ্যেই সঙ্গীতসমাজের তাগাদায় আত্মপ্রকাশ করে "গোড়ায় গলদ" (১২৯৯) ও "বৈকুণ্ঠের খাতা" (১৩০৩), তবে এ দুখানি প্রহসন। এর মধ্যেই (১৩০৭) "চিরকুমার সভা"ও রচিত হয় বটে, কিন্তু সরলা দেবী সম্পাদিত "ভারতী" পত্রিকায় আমরা প্রথম যৌবনে সাগ্রহে তার যে অভিনব রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম, তা সংলাপপ্রধান হ'লেও নাটক ছিল না। এই রচনাটিই পরে সাপ্তাহিক "হিতবাদী" কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ" নামে স্থান পায়। কিন্তু তা নাট্যরূপ গ্রহণ করেছিল বহুকাল পরে এবং সে সম্বন্ধেও আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

"রবীন্দ্রজীবনী" লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "কলিকাতায় পাবলিক থিয়েটারে অহীন্দ্র চৌধুরী বিখ্যাত অভিনেতা; তিনি ও তাঁহার দল কবির নাটক অভিনয়ের কথা ভাবিতেছেন। সেই সংবাদ পাইয়া কবি "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ"-এর নূতন নাটকীয় রূপদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৩৩১ সালের মধ্যে রচনা

শেষ হয়।” বোধ করি এই তথ্য নির্ভুল নয়। আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রভক্ত শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর আগ্রহাতিশয় দেখে কবি “চিরকুমার সভা”কে নাটকাকারে গেঁথে প্রথমে তাঁরই হাতে সমর্পণ করেন—তখন মনোমোহন নাট্যমন্দিরে “সীতা” চলেছে মহাসমারোহে। সেই সময়ে মৎসম্পাদিত “নাচঘর” পত্রিকায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রাংশ প্রকাশিত হয়েছিল: “শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি।” ঐ ‘দুই-একটা’ নাটকের মধ্যে একখানি হচ্ছে “চিরকুমার সভা”। কবির নিজের মুখে তার পাঠ শোনবার এবং তার পাণ্ডুলিপি স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে “চিরকুমার সভা”র মহলাও সুরু হয়। কিন্তু শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে ভালো গান গাইতে ও ভালো অভিনয় করতে পারেন, অক্ষয়ের ভূমিকার উপযোগী এমন অভিনেতা পাওয়া গেল না, কাজেই তখনকার মত মহলা বন্ধ হ'ল। সেই সুযোগে ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতা”র মত “চিরকুমার সভা” থেকেও শিশিরকুমারকে বঞ্চিত ক'রে (তাঁর অজ্ঞাতসারেই) হস্তগত করেন। এই সব থিয়েটারি কূটনীতি রবীন্দ্রনাথের জানবার কথা নয়; খুব সম্ভব তাঁকে বোঝানো হয়েছিল যে, শিশিরকুমার এই নাটিকা মঞ্চস্থ করতে প্রস্তুত নন। কিন্তু “চিরকুমার সভা”ও পড়ে প্রহসনের বা কৌতুক-নাটিকার পর্য্যায়ে। সুতরাং পুরাতন নাটকরচনারীতি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের শেষ নাটক হয়েছে “বিসর্জ্জন”ই।

নাট্যসাহিত্যে “বিসর্জ্জন” নাটকের স্থান কোথায়, এখানে তা দেখার দরকার আছে ব'লে মনে করি না; কারণ আগেই ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এটুকু আমার স্মরণ আছে, রবীন্দ্রনাথের “রাজা ও রাণী” (একাধিক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও) এবং “বিসর্জ্জন”, তাঁর উত্তরকালের যুগোপযোগী নাটকগুলি রচিত হবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, সাহিত্যরসিকদের চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল। সেকালে বাংলাদেশে নাটক বলতে বোঝাত প্রধানত: থিয়েটারি পালাগুলিই। সে-শ্রেণীর কয়েকটি পালা থিয়েটারে দস্তুরমত জ'মে উঠেছিল, কিন্তু অধিকাংশই ছিল যে রচনা হিসাবে নিম্নশ্রেণীর এবং অপাঠ্য, একথা প্রমাণিত করবার জন্যে বাক্যব্যয় না করলেও চলবে। এবং নিছক মঞ্চনাটক হিসাবে যেগুলি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিল, সাহিত্যরসের সঙ্গে তাদেরও সম্পর্ক ছিল অল্পই। কিন্তু “রাজা ও রাণী” এবং “বিসর্জ্জন” সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করবার উপায় নেই। যে কোন সাহিত্যরসিক ঐ দুইখানি নাটক পাঠের সময়ে লাভ করবেন উচ্চশ্রেণীর

কাব্যপাঠের আনন্দ। যাঁরা "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জ্জন"-এর মঞ্চাভিনয় দেখেন নি, তাঁদের কাছেও ঐ দুইখানি নাটক হ'তে পারে পরম উপভোগ্য বস্তু। একসময়ে বাংলাদেশে সাহিত্যিক নাটক বললে সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ত "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জ্জন"-এরই কথা।

"রাজা ও রাণী"কে ঢেলে সেজে নাট্যকার তৈরি ক'রেছিলেন "তপতী"কে, তবেই সে নূতন যুগের উপযোগী হয়ে উঠতে পেরেছিল। "বিসর্জ্জন" নাটকও পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন থেকে নিস্তার পায় নি। কিন্তু "রাজা ও রাণী"র মত "বিসর্জ্জন"ও পরে প্রায় একখানি নূতন নাটক হয়ে দাঁড়ায়নি, ওর মূল সুরটি শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকেই গিয়েছে। তার আখ্যানবস্তু আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয় নাট্যকারের পূর্ব্বরচিত উপন্যাস "রাজর্ষি"র ভিতর থেকেই। এখানেও রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়; তাঁর আরো কয়েকখানি নাটকের জন্ম হয়েছে এইভাবেই।

ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের ইচ্ছা হয়েছিল নূতন কোন নাট্যাভিনয়ে যোগ দেবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ নাকি তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যেই "বিসর্জ্জন" নাটক-রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন পার্ক ষ্ট্রীটে একখানি প্রকাণ্ড বাসা-বাড়ীতে বাস করতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সেইখানে "বিসর্জ্জন"-এর প্রথম অভিনয় হয়। তারপর সঙ্গীত সমাজেও ঐ নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল এবং রঘুপতি ও জয়সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র বসু-মল্লিক। এ-সব অভিনয় উপভোগ করবার বয়স ও সৌভাগ্য আমার হয় নি, তবে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের একখানি অভিনয়-চিত্র দেখেছি বটে; এবং লোকপরম্পরায় শ্রবণ করেছি, রবীন্দ্রনাথের অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটক যে লোকপ্রিয় হ'তে পারে, সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে "রাজা ও রাণী"ই সে কথা প্রমাণিত করেছিল। ঐ নাটকে (পরে নাট্যকারের দ্বারা পরিত্যক্ত) কুমারসেনের করুণ ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় ক'রে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট মহেন্দ্রলাল বসু জনসাধারণের কাছ থেকে "ট্রাজেডিয়ান" উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা সত্ত্বেও "বিসর্জ্জন"-এর দিকে হাত বাড়াতে পারেন নি। একাধিক ব্যক্তির মুখে তার কারণও শুনেছিলুম। "বিসর্জ্জন"-এর শেষের দিকে একটি দৃশ্যে আছে, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ রঘুপতি কালীপ্রতিমাকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করছেন। এ দৃশ্য বাদ দেওয়াও চলে না এবং থাকলেও সাধারণ রঙ্গালয়ের শ্রেণীবিশেষের দর্শকরা ক্ষেপে উঠে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারত। ফলে পেশাদার রঙ্গালয়ে

"বিসর্জ্জন"-এর প্রবেশ হয়েছিল নিষিদ্ধ। নট-নাট্যকার অমৃতলাল বসুর মুখেও আমি এই কথা সত্য ব'লে শুনেছিলুম। কিন্তু কেবল ঠাকুরবাড়ী ও সঙ্গীত সমাজ নয়, আগেকার কোন কোন সৌখীন সম্প্রদায়ও "বিসর্জ্জন"কে মঞ্চস্থ করতে সঙ্কুচিত হ'তেন না। প্রখ্যাত অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের পরিবারের লোকেরা "বিসর্জ্জন" অভিনয়ের একটি আয়োজন করেছিলেন এবং কিশোর বয়সে সেখানেই আমি সর্ব্বপ্রথমে মঞ্চের উপরে রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। কিন্তু তার কথা সৌখীন অভিনয়ের প্রসঙ্গে আগেই বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

"বিসর্জ্জন" নাট্যাভিনয়ে স্বয়ং কবিকে না দেখবার খেদ যেদিন আমার মিটে গেল, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বাষট্টি বৎসর। সেটা হচ্ছে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। "বিসর্জ্জন" মঞ্চস্থ হ'ল এম্পায়ার থিয়েটারে এবং নাট্যমঞ্চে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ (জয়সিংহ), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (গোবিন্দমাণিক্য), দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রঘুপতি) ও শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (নক্ষত্রমাণিক্য) প্রভৃতি। নারী-ভূমিকাগুলিও গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুরবাড়ীর মহিলারাই। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ হচ্ছে, বোধ করি এই নাট্যানুষ্ঠানেই শ্রীমতী সাহানা দেবী বিনা সঙ্গতে কয়েকটি গান গেয়ে নূতনত্ব সৃষ্টি করেন।

বাষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে তরুণ যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় মানাবে কি-না, সে সম্বন্ধে প্রভূত সন্দেহ নিয়েই অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। কিন্তু গিয়ে দেখলুম, আমাদের সন্দেহ অমূলক। চলনে, কথনে, দেহে ও ভাবভঙ্গিতে জয়সিংহ ভূমিকার অভিনেতা যে যুবক নন, এ সত্য ধরা পড়ল না একবারও। নিজের পক্ক ও দীর্ঘ শ্মশ্রু পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে গোপন রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর অঙ্গবিন্যাস, স্বরবিন্যাস ও আবৃত্তিকৌশল অমর হয়ে থাকবে আমার স্মৃতির মধ্যে—তিনি ছিলেন একেবারেই অননুকরণীয়। গগনেন্দ্রনাথকে দেখে মনে হয়েছিল সেকালের একজন সত্যকার রাজাকেই দেখলুম। রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি ও বিপুল দেহই কেবল মানানসই হয় নি, তাঁর অভিনয়ও বেশ উৎরে গিয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে, "বিসর্জ্জন"-এর পরেই রবীন্দ্রনাথের লেখনী নাটকরচনার পুরাতন ধারা পরিত্যাগ করে। কেবল তাই নয়, এর পর প্রায় আঠারো বৎসর কাল তিনি আর কোন গম্ভীর নাটকে হাত দেন নি। "বিসর্জ্জন"-এর কিছুকাল পরে রচিত "চিত্রাঙ্গদা" খণ্ডনাট্য মাত্র। ঐ ছোট রচনাটি কবিত্বের দিক দিয়ে অসাধারণ এবং তার চরিত্রচিত্রণও চমৎকার। ঠাকুর-পরিবারের শিল্পীরা সাধারণ নাটক হিসাবে "চিত্রাঙ্গদা"কে কোন দিন মঞ্চস্থ করেন নি। তবে শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক

যুগে তা নৃত্যনাট্যরূপে অভিনীত হয়েছিল বটে। পুরাতন যুগের সাধারণ রঙ্গালয়ে (এমারেল্ড থিয়েটারে) নাকি "চিত্রাঙ্গদা" খোলা হয়েছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন তথ্য আমার জানা নেই। নবযুগেও এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়ে দুই রাত্রির জন্যে "চিত্রাঙ্গদা"কে মঞ্চস্থ করেন প্রখ্যাত নট রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সেই নাট্যাভিনয়ে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন নাট্যবোদ্ধা ও ওস্তাদ সাহিত্যশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে রাধিকানন্দ ও শ্রীমতী সুশীলা। সে অভিনয় বেশ উৎরে গিয়েছিল এবং দ্বিজেন্দ্রলালের আন্দোলনের পরেও আধুনিক দর্শকরা তার মধ্যে তথাকথিত দুর্নীতির জীবাণু আবিষ্কার করতে পারেন নি।

কিন্তু পূর্ব্বকথিত আঠারো বৎসরব্যাপী গম্ভীর নাটকের অজন্মার দিনেও রবীন্দ্রনাথের অশ্রান্ত লেখনী নাট্যজগৎকে একেবারে ভুলে থাকতে পারে নি। এর মধ্যে সাহিত্য-রসিকদের জন্যে তিনি যেমন রচনা করেছেন রাশি রাশি কবিতা ও প্রবন্ধ এবং ছোটগল্প ও উপন্যাস, নাট্যরসিকদের জন্যেও উপহার দিয়েছেন কৌতুকরসের পালা "গোড়ায় গলদ", "বৈকুণ্ঠের খাতা" এবং নাট্য রচনা "চিরকুমার সভা"। তার উপরে নাট্যজগতের মধ্যে তাঁর কর্ম্মোৎসাহ আর এক দিক দিয়েও আত্মপ্রকাশ করেছিল। এত কাল ধ'রে তিনি নিজেদের পারিবারিক নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যেই শিল্পী ও নির্দ্দেশক রূপে যোগদান ক'রে আসছিলেন। কিন্তু এইবারে কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত নাট্য-বৈঠক 'সঙ্গীত সমাজ'-এরও অন্যতম প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হয়ে উঠলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত। মাইকেল মধুসূদন যে কেবল আধুনিক বাংলা দেশের প্রথম কবি নন, প্রথম নাট্যকারও ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করবার সময়ে তিনি যে সব সৌখীন সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাদের কোনটিও নারী নিয়ে অভিনয় করত না, কারণ এইটেই ছিল তখনকার দেশাচার। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম এবং সে-সব সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল না মাইকেল মধুসূদনের উপরে। নারীর ভূমিকায় পুরুষদের দেখে মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হয়েও তাই তিনি প্রতিবাদ করতে পারতেন না। এই দেশাচারের দ্বারা চালিত হয়ে আমাদের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটারও সম্প্রদায়ে নারীদের স্থান দিতে ভরসা করে নি। তারপর বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ নাটকের জন্যে মধুসূদনের দ্বারস্থ হ'তেই তিনি এই অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে মুখ খোলবার সুযোগ পেলেন। এ সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু বলেন: "মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী

লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন, 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খোল, আমি তোমাদের জন্ম নাটক রচনা করিয়া দিব। স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না।' কিন্তু সে যুগে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীরূপে ভদ্রমহিলার উপস্থিতি কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না, কাজেই গণিকাদের গ্রহণ ক'রে, ঐ সমস্যার সমাধান করা হল। তার ফলে রীতিমত আন্দোলন ও ধিক্কারের অভাব হয় নি, কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের মত প্রতিভাধরকে দলে পেয়ে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ সে সব বিরুদ্ধতাকে কিছুমাত্র আমলে আনেন নি।

কিন্তু সে যুগেই ঠাকুর-পরিবারের নাট্য-পরিচালকরা মহিলাদের নিয়েই নারী-ভূমিকার কাজ চালাতেন এবং খুব সম্ভব এদিকের অগ্রনেতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথই। পারিবারিক রঙ্গালয়, অভিনয় করেন পরিবারেরই ছেলে-মেয়েরা। দৃশ্যটা মনের মত না হ'লেও সমাজপতিদের অভিযোগ করবার উপায় ছিল না। এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছিল তরুণ রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন। এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে নাট্যপরিচালনা করবার সময়ে তিনি কোন দিনই নারী-ভূমিকার জন্যে পুরুষের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। কেবল সঙ্গীত সমাজে কাজ করবার সময়েই রবীন্দ্রনাথকে আর পাঁচজনের মতে বাধ্য হয়ে সায় দিতে দেখি, কারণ সঙ্গীত সমাজের রক্ষণশীল অভিজাত সম্প্রদায় নারী নিয়ে অভিনয়ের বিরোধী ছিলেন। সম্ভবতঃ অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) মুখ চেয়েই তিনি এই অস্বাভাবিকতা সহ্য করেছিলেন প্রায় দশ বৎসরকাল। বাইরের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এমন দীর্ঘকাল ধ'রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন নি, এটাও লক্ষ্য করবার মত।

নারী-ভূমিকায় পুরুষের আবির্ভাব যে অভিনয়ের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে, এ সম্বন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতামতের কথা না তুললেও চলে, কারণ যাঁরা এ দেশে নারীবর্জিত নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরাও এ কথা জানতেন এবং মানতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের প্রথম যুগের অন্যতম প্রবীণ নাট্যকার মনোমোহন বসুর কথা উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি বলছেন: "এমন এক শ্রেণীও আছেন, যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, রঙ্গভূমিতে সত্যকার স্ত্রী অভিনেত্রী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অভিনয়ার্হ অংশগুলি কোনোমতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনীত হইতে পারে না। এ কথা আমরা আংশিকরূপে স্বীকার করি।"

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় বিদেশী লেবেডেফ সাহেব সর্ব্বপ্রথম বাংলা থিয়েটারেই

নটীদের ভূমিকায় গ্রহণ করেছিলেন নারীদের। তার বহুকাল পরে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ) বাঙালীর দ্বারা প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়ে—অর্থাৎ নবীনচন্দ্র বসুর ভবনে "বিদ্যাসুন্দর" পালাতেও স্ত্রী-ভূমিকায় দেখা যায় স্ত্রীলোকদেরই। তারপর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অন্যত্র "নন্দবিদায়" নাট্যাভিনয়েও ঐ প্রথাই অনুসৃত হয়েছিল। ঐ সব অভিনয় যে রসিকদের পরিতুষ্ট করেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অভিনয় করেছিলেন শ্রেণীবিশেষের নারীরা,—সমাজ যাঁদের জানে অচ্ছুত-কন্যা ব'লে। তবে স্বাভাবিকতার ভক্তদের এই প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল দেশাচার তথা জনমতের বিরুদ্ধতায়।

নাট্য-সম্প্রদায়ে ভদ্রমহিলাদের আবির্ভাবের সুযোগ থাকলে পূর্ব্বকথিত অস্বাভাবিকতার পথ বন্ধ হ'ত বটে, কিন্তু দেশাচার তথা জনমত ছিল তারও বিরোধী। উভয় ক্ষেত্রেই কার্য্যকর হয়েছিল একইরকম যুক্তি। পতিতাদের রঙ্গমঞ্চে স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ মনোমোহন বসুর ভাষায়: "ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ...... শত বর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এ দেশে নাটকাভিনয়রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তিসাধক ধর্ম্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃ সমাজ অবলম্বন না করেন।" যেমন ভদ্র যুবকদের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্যে নাট্যমঞ্চে ঐ শ্রেণীর নারীদের আবির্ভাব বাঞ্ছনীয় ছিল না, তেমনি সেকালের অসূর্য্যম্পশ্যা ভদ্রমহিলাদেরও পবিত্রতারক্ষার জন্যে কেউ প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে দর্শন করতে চায় নি।

ভদ্রমহিলারা রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলে কি অঘটন ঘটতে পারে, মনোমোহন বসু সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি, বলা বাহুল্য ভেবেই। ঢালের অন্য পিঠ ছিল তাঁর চোখের আড়ালে, তাই এই ব'লেই এক কথায় সেরেছিলেন; "এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রী রূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব।" এটা হচ্ছে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কথা। কিন্তু তারপর পুরো আট বৎসর কাটতে না কাটতেই তিনি যা "এককালেই অসম্ভব" ভেবেছিলেন, তাইই হ'ল সম্ভবপর—স্বরচিত "বাল্মীকি প্রতিভা"র নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর সঙ্গে সকলের সামনে

করলেন রঙ্গাবতরণ। নাট্য-সম্প্রদায় পারিবারিক বটে, কিন্তু প্রেক্ষাগারে হয় নি আত্মীয়সভার অধিষ্ঠান। অসংখ্য বাহিরের দর্শককে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে ছিলেন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি—তাঁদের কারুর মুখেই শোনা যায় নি প্রতিবাদ। এমন কি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোকও সেই অভিনয় দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে কবিতায় লিখে ফেললেন—

"উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হ'ল হেরো।"

মনোমোহন বসু তখনও বাহালতবিয়তে ইহলোকেই বিদ্যমান, কিন্তু এই ব্যাপারটা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতভম্ব কিংবা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছিলেন, তার কোন লিপিবদ্ধ প্রমাণ আছে কি না আমরা জানি না।

নাট্যশালা পারিবারিক হ'লেও "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয় হয়েছিল প্রকাশ্য ভাবেই, সুতরাং অনায়াসেই বলা চলে যে, বাংলা দেশে মহিলা অভিনেত্রীদের পথ খুলে দেন সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভা দেবীই এবং এজন্যে এই বিভাগে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর ঐ আবির্ভাবকে বিভিন্ন মতাবলম্বীরা বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করবেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরে নিজের জীবনকালের মধ্যে বহুবার নিজের পরিবারের এবং পরিবার-বহির্ভূত মেয়েদের নিয়ে সর্ব্বসাধারণের সামনে অভিনয়ের পর অভিনয়ের আয়োজন করেছেন এবং তারই ফলে আজ নাট্যজগতে বঙ্গমহিলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

মনোমোহন বসু এবং আরো অনেকে প্রবল আপত্তি ও আন্দোলন করলেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিকতার অনুরাগীদের ঠেকাতে পারলেন না, বাংলা দেশের প্রত্যেক পেশাদার রঙ্গালয়েই শ্রেণীবিশেষের নারীদের নটীরূপে গ্রহণ করার রীতিই প্রচলিত হয়ে গেল। মাঝে একবার রুচিবাগীশদের মন রাখবার জন্যে কবি রাজকৃষ্ণ রায় নারী-ভূমিকায় বালকদের নামিয়ে পেশাদার রঙ্গালয় চালাবার চেষ্টা করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, রুচিবাগীশদের গগনভেদী কোলাহল করবার শক্তি আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাঁরা উচিত মত দলে ভারি হয়ে টিকিট কিনে নিজেদের উপযোগী একটিমাত্র রঙ্গালয়কেও বাঁচাতে পারলেন না—মাঝখান থেকে ভাগ্যহীন রাজকৃষ্ণ রায় হলেন সর্ব্বস্বান্ত।

আগেই বলেছি, সঙ্গীত সমাজের নাট্যসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকেরা ছিলেন রক্ষণশীল, পুরাতন ঐতিহ্যকে অবহেলা করবার শক্তি তাঁদের ছিল না। ঠাকুর-পরিবারের নাট্য-

সম্প্রদায়ের সাফল্য দেখেও তাঁরা নূতন কিছু করবার চেষ্টা করলেন না, সৌখীন বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের আদর্শই তাঁদের কাছে হল গ্রহণযোগ্য। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির মত তাঁরাও অভিজাতবংশীয়, অতএব তাঁদের চলা পথেই তাঁরা করলেন পদার্পণ। অধিকাংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝেই রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না ক'রে তাঁদের দলে যোগদান করলেন এবং তাঁর প্রবল নাট্যানুরাগই যে এই কার্য্যে তাঁকে ব্রতী করেছিল, এটুকুও আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাঁর নিজের মত একটুও বদলায় নি।

আগেই বলা হয়েছে, সঙ্গীত সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন প্রায় দশ বৎসর কাল এবং সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কীয় আর কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এমন দীর্ঘকাল ধরে তিনি নিজেকে বোধ হয় যুক্ত রাখতে পারেন নি। এথেকে অনুমান করা যায়, সঙ্গীত সমাজের আবহ তাঁর মনের অনুকূল ছিল। প্রবীণ লেখক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ চলতি বৎসরের মাসিক বসুমতার তিন সংখ্যায় সঙ্গীত সমাজ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়ে সঙ্গীত-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। "রাধামাধববাবুকে (রাধামাধব কর) 'সঙ্গীত সমাজে' আচার্য্য ("নাট্যাচার্য্য") করিবার জন্যই জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ও রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে (তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রখ্যাত লেখক) সঙ্গে আনিয়াছিলেন। রাধামাধব আগন্তুকদিগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই; কিন্তু কখন সঙ্গীত সমাজে অভিনয় করেন নাই—অভিনেতাদিগকে যেমন গায়কদিগকে তেমনই শিক্ষা দিতেন।"

রাধামাধব কর ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার আর. জি. করের অনুজ এবং সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের একজন সুপরিচিত গায়ক অভিনেতা। জনসাধারণের কাছে তাঁর ডাকনাম ছিল মাধু কর। তাঁর দ্বারা গৃহীত ভূমিকার সংখ্যা বেশী না হলেও কোন কোন ভূমিকায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন—যেমন "বসন্ত রায়ে"র গীতিবহুল নাম-ভূমিকায়। যখন তিনি বয়সে প্রাচীন, তখন আমি তাঁকে একবার রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখেছিলুম। মিনার্ভা থিয়েটারে "চন্দ্রশেখরে"র পুনরভিনয় হয়। চন্দ্রশেখর, ফষ্টর, প্রতাপ ও শৈবলিনীর ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, রাধামাধব, দানীবাবু ও তারাসুন্দরী। কিন্তু রাধামাধবের অভিনয়ে আমি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের সন্ধান পাই নি, খুব সম্ভব তার কারণ ছিল তাঁর বার্দ্ধক্য।

আমার মনে হয়, সঙ্গীত সমাজের যে সব পালার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর কারুর কোন সম্পর্ক নেই, তাদেরই মহলার সময়ে রাধামাধব নাট্যাচার্য্যের কর্ত্তব্য পালন করতেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী ও নিজের লিখিত নাটকাবলীর মহলায় শিক্ষা-দান করতেন রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং। কারণ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী"তে প্রকাশ: "সঙ্গীত সমাজের অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ পরিশ্রম করিতেন তাহার সামান্য আভাস আমরা পাই তাঁহার স্ত্রীকে লিখিত পত্র হইতে। সভ্যশ্রেণীভুক্ত বিলাতফেরতদের অনেকে বাংলা ভাষা সহজভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; রবীন্দ্রনাথ দ্বিপ্রহরে কখনো বা তাঁহাদের বাটীতে গিয়া কখনো বা সমাজভবনে আসিয়া তাঁহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন; আবার সন্ধ্যার পর মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভূমিকা পাঠের আবৃত্তি গ্রহণ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি-আদি শিক্ষা দিতেন। এক-একদিন রিহার্সালে রাত্রি দেড়টা দুইটা বাজিয়া যাইত তখন সঙ্কীর্ণ গলিপথ ধরিয়া হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেন।" অন্যত্র দেখি, তিনি "স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পুনর্বসন্ত' নামে গীতিনাট্যে রিহার্সালে কোমরে চাদর বাঁধিয়া হাততালি বাজাইয়া সখিদের নাচ দেখাইয়া দেন।"

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেছেন: "সঙ্গীত সমাজের সদস্যগণ অর্থাভাবে তখন অন্যান্য রঙ্গালয়ে যাহা করা সম্ভব হইত না, তাহা করিতে পারিতেন। যেমন 'মেঘনাদবধ' নাটকের অভিনয়ে প্রমীলার লঙ্কাগমনের দৃশ্যে প্রমীলার অশ্ব ব্যবহার। ...আবার 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ে জগৎসিংহ (হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল) তাঁহার পিতৃব্য দুনিয়ারাম শীলের প্রসিদ্ধ 'হেকটর' শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে উপনীত হইয়াছিলেন।" বিলাতে গম্ভীর নাট্যাভিনয়ে মঞ্চের উপরে জীবন্ত অশ্ব বা অন্য কোন পশু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিলাতী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও বাংলা রঙ্গালয়ের ঘোড়া-বাতিকটা আধুনিক নয়। সঙ্গীত সমাজের অস্তিত্ব যখন বিলুপ্ত হয় নি, তখনই আমরা ক্লাসিক থিয়েটারের "ভ্রমর" পালার বিজ্ঞাপনে দেখতুম—"অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল!" এবং কোহিনুর থিয়েটারের এক অভিনয়ে একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীকেও অশ্বপৃষ্ঠে দেখেছিলুম ব'লে স্মরণ হচ্ছে। কিন্তু এ সব তো হচ্ছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথা। বাংলা রঙ্গালয়কে গোড়া থেকেই ঘোড়া-রোগে ধরেছিল! সাধারণ বাংলা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরেই (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে) বিখ্যাত ছাতুবাবুর দৌহিত্র এবং বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও অভিনেতা শরৎচন্দ্র ঘোষও "দুর্গেশনন্দিনী" নাট্যাভিনয়ে জগৎসিংহের

ভূমিকায় ঘোড়ায় চেপে রঙ্গমঞ্চের উপরে এসে হাজির হতেন। সুতরাং অনায়াসেই বলা চলে যে, বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণেই সঙ্গীত সমাজে ঘোড়ার আমদানি হয়েছিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে আর একটি তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছেন। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী একথা সকলেই জানেন। কিন্তু নাট্যজগতের সকল বিভাগেও তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর চৌকস শিল্পী। এমন সব বিখ্যাত অভিনেতা আছেন, যাঁদের খ্যাতি প্রধানতঃ শ্রেণীবিশেষের মার্কা-মারা ভূমিকার জন্যে। সে শ্রেণীর ভূমিকা না পেলেও তাঁরা হয়তো মন্দ অভিনয় করেন না, কিন্তু তা অনন্যসাধারণ ব'লে গণ্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন না। "বিসর্জ্জন" পালায় বৃদ্ধ বয়সে যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় তিনি যে বিস্ময়কর ও অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন, তার কথা আগেই বলেছি। আবার সঙ্গীত সমাজে পরিণত যৌবনে ঐ নাটকেরই রাজগুরু রঘুপতির রুদ্ররসপ্রধান ভূমিকায় অসামান্য নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি সকলকেই অভিভূত করতে পেরেছিলেন। কেবল সকলকে অভিভূত করা নয়, নিজেও হন নি কম অভিভূত! হেমেন্দ্রবাবু বলছেন: "তিনি 'বিসর্জ্জনে' রঘুপতির অভিনয়কালে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, খাঁড়া ব্যবহারকালে তাহা যে সত্য সত্যই তীক্ষ্ণধার তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; অভিনেতাদিগের মধ্যে আর একজন তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ধ্রুবকে তাড়াতাড়ি সরাইয়া না লইলে হয়ত একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিত।" কিন্তু কেবল রুদ্র ও করুণ রসের নয়, হাস্যরসাশ্রিত ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথের সমান অধিকার ছিল এবং সঙ্গীত সমাজেরই বিভিন্ন অভিনয়ে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন।

সাবেক কালের বাংলা নাট্যজগতে নিছক হাস্য বা কৌতুক রস ছিল দুষ্প্রাপ্য। সাধারণতঃ তখন নাট্যকারদের ধারণা ছিল ব্যঙ্গ না থাকলে রঙ্গরস দানা বাঁধে না। যে রচনাগুলি তখন প্রহসন বা কৌতুকনাট্য নামে সুপরিচিত ছিল, তাদের অধিকাংশের মধ্যেই পাওয়া যাবে ব্যক্তিবিশেষ বা ধর্ম্মবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য ক'রে ঠাট্টা-টিটকারি। এদেশে আধুনিকদের মধ্যে প্রথম প্রহসন বা হাস্যনাট্যে হাত দেন মাইকেল মধুসূদন। তিনিও ঐ লক্ষণ থেকে মুক্ত নন। তারপর বাংলা থিয়েটারের জন্যে রাশি রাশি তথাকথিত কৌতুকনাট্য রচিত হয়েছে এবং তাদের অনেকগুলিই ব্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীলতাকেও আশ্রয় দিতে ইতস্ততঃ করে নি। ঐ সব নাট্যের

বড়যিতারা দুই হাতে চাবুক নিয়ে একজোটে আক্রমণ করেছেন সনাতন ও নব্য-পন্থিগণকেও। বলা বাহুল্য, সামনে মাইকেল মধুসূদনকে আদর্শরূপে পেয়ে তাঁরাও আর হাস্যরসসৃষ্টির জন্যে নূতন পথ কেটে নেবার চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু সেকালেও যে ঠাকুরবাড়ীর রুচি ও সংস্কৃতি ছিল উন্নততর, বাংলা নাট্যজগতে তার প্রথম প্রমাণ দেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি "অলিকবাবু" প্রভৃতি এমন কতকগুলি প্রহসন বা কৌতুকনাট্য রচনা করেন, যাদের মধ্যে না ছিল কুরুচি বা অশ্লীলতা, না ছিল সমাজ বা ধর্ম্মবিশেষকে আক্রমণ, না ছিল ব্যক্তিগত ঠাট্টা-টিটকারি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিছক হাস্যরস সৃষ্টি এবং আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে শুদ্ধ আনন্দ বিতরণ করা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐ শ্রেণীর একাধিক রচনা সাধারণ রঙ্গালয়েও প্রদর্শিত ও উপভোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও তাঁর রীতি অনুসৃত হয় নি। এমন কি খাঁটি হাস্যরস সৃষ্টি করবার শক্তি ছিল যাঁর অসাধারণ, সেই রসরাজ অমৃতলাল বসুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন গড্ডলিকা-প্রবাহে। গিরিশচন্দ্র একজন চৌকস নাট্যকার, হাস্য ও করুণ প্রভৃতি সব রসেরই নির্ঝর ছিল তাঁর লেখনী। কিন্তু সামাজিক নিছক হাসির রচনা আছে তাঁর একটি-মাত্র—"ব্যায়সা কি ভ্যায়সা" এবং তাও মৌলিক নয়। এমন কি থিয়েটারী প্রতি-বেশের প্রভাব যাঁর উপরে পড়বার কথা নয়, সাহিত্যক্ষেত্র থেকে সমাগত সেই দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ও নিজেকে এখানে সংযত ক'রে রাখতে পারেন নি। হাস্যরসিক কবিরূপে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অসামান্য হয়ে আছেন। এবং রঙ্গালয়েও খাঁটি হাস্যরস পরিবেশন করবার শক্তি যে তাঁর কত বেশী ছিল, "বিরহ" ও "পুনর্জ্জন্ম" প্রভৃতি নাটিকাই তা প্রমাণিত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও গড্ডলিকা-প্রবাহের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটিকার আখ্যানবস্তু মৌলিক এবং অভিনব তার রচনা-ভঙ্গীর ও হাসির ভাষণ, কিন্তু সেই সঙ্গে তার মধ্যে আছে চলতি বাংলা প্রহসনে বহুনিন্দিত নব্য বাঙালীরই উপরে চোথা চোথা বাক্যবাণ। অবশ্য তাও আপত্তিকর নয়, বরং কৌতুককর। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তারপরও অগ্রসর হয়েছিলেন অধিকতর। "আনন্দ বিদায়" নামে প্রহসনে কুৎসিত ব্যক্তিগত আক্রমণ ক'রে তিনি মিশেছিলেন থিয়েটারী পালাকারদেরই দলে।

থিয়েটারী হাসির পালায় ব্যক্তিগত আক্রমণ ক্রমেই বেড়ে এতটা অসহনীয় হয়ে ওঠে যে, অবশেষে গভর্ণমেণ্ট "অভিনয় নিয়ন্ত্রণ-আইন" জারি করতে বাধ্য হন। তার ফলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস ও অধ্যক্ষ

অমৃতলাল বসুকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। তবু ঐ শ্রেণীর পালাকারদের চৈতন্যোদয় হয় নি ; কারণ তাঁরা তামাক খেতে ছাড়েন নি, তবে সে চেষ্টা করতেন নলচের আড়ালেই মুখ লুকিয়ে। আমাদের দর্শকদেরও রুচি ছিল তথৈবচ, সে সময়ে কৌতুকনাট্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ তাঁদের কাছে ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য। আবার ক্লাসিক থিয়েটারের যুগে এ ব্যাপারের অতিশয় বাড়াবাড়ি হয়েছিল, যদিও আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় নি তার ঢেউ। কিন্তু আইন জারি ক'রেও কোন অন্যায় বন্ধ করা যায় না—ফাঁসি যাবার ভয় থাকলেও খুনী খুন করে, জেলে যাবার ভয় থাকলেও চোরে চুরি করে। অন্যায়ের প্রতিকারের উপায় আছে জনসাধারণেরই হাতে। জনসাধারণের রুচি উন্নত হ'লে রঙ্গালয়ে কুরুচির প্রভাব থাকতেই পারে না। "আনন্দ-বিদায়" মঞ্চস্থ হয়েছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেই (১৯১২ খৃষ্টাব্দে) বাংলা রঙ্গালয়ের দর্শকদের মন যে তখন তৈরী হয়ে উঠেছে তার মস্ত প্রমাণ, প্রথম রাত্রেই তার অভিনয় তারা জোর করে বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। ব্যাপার দেখে তখনকার অন্যান্য থিয়েটারী পালাকাররাও দায়ে প'ড়ে সাধুর ভেক ধারণ ক'রে বসলেন এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে আমাদের থিয়েটারী পালায় কৌতুকের নামে নিষ্ঠুর ও অশোভন ব্যক্তিগত আক্রমণ ক্রমেই অধিকতর দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এই হিসাবে বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে "আনন্দ বিদায়" মঞ্চস্থ করবার দুশ্চেষ্টা একটা স্মরণীয় ঘটনা ব'লেই গণ্য হবে।

বাংলা রঙ্গালয়ে আগে আর এক শ্রেণীর অসামাজিক হাস্য-নাট্য অভিনীত হ'ত, যার মধ্যে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সমাজের উপরে আক্রমণ থাকত না বটে, কিন্তু রুচির দিক দিয়ে যা আদৌ সমর্থনযোগ্য ছিল না। এখানে বাহুল্যভয়ে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত থাকব। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মত কবি ও শিক্ষিত নাট্যকারও "সাবিত্রী"র মত ধর্ম্মমূলক নাটকে লোক হাসাবার জন্যে জননীকে নিয়েও নোংরা (অশ্লীলও বলা যায়) রঙ্গ করবার লোভ সামলাতে পারেন নি। সুতরাং আমাদের সাধারণ হাসির পালাকারদের অনেকেই যে আগে সুরুচির মর্য্যাদা রাখতে পারতেন না, একথা আর বেশী জোর দিয়ে না বললেও চলে। রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সেকালের আরো অনেক পালাকারের রচনা থেকে কুরুচির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আহরণ করা যেতে পারে। হয়তো আমাদের একেলে নাট্যকারদের রুচি অধিকতর উন্নত কিন্তু তা প্রমাণিত করা কঠিন, কারণ অতি-আধুনিক বাঙালী নাট্যকাররা হাসির পালা রচনা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন বললেও চলে।

রবীন্দ্রনাথও একজন চৌকস নাট্যকার, তাই কেবল গম্ভীর নাটক নয়, কয়েকটি হাস্যনাট্যও রচনা করেছেন। পূর্ব্বোক্ত পটভূমির উপরে রেখে আলোচনা করলেই তাঁর হাসির পালাগুলির উপরে সুবিচার করা হবে।

রসরচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব দেখি প্রথম থেকেই—এমন কি তাঁর কাঁচা বয়সে লেখা "বাল্মীকি প্রতিভা"তেও হাসিমস্করার অভাব নেই। রবীন্দ্ররচনার ভিতর থেকে কেবল হাস্যকৌতুকের অংশগুলি যদি বেছে নিয়ে আলাদা ক'রে রাখা যায়, তবে তাও হবে ওজনে দস্তুরমত ভারি। উপরন্তু দেশের ও দশের মাঝখানে কৌতুকী রূপে খ্যাতি যাঁদের অসামান্য, রসরচনার পরিমাণের দিক দিয়ে তাঁদের অনেকেও রবীন্দ্র-নাথের চেয়ে অগ্রগণ্য হ'তে পারবেন না। কেবল কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে বা চুটকি রচনায় নয়, রবীন্দ্রনাথের গম্ভীর নাটকগুলিরও মধ্যে হাস্যরসের প্রতি কখনো অবহেলা প্রকাশ করা হয় নি। এবং এইটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার একটি মস্ত লক্ষণ; কোন একটি বিষয় নিয়ে সে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকতে চায় না, সে খোঁজে সমগ্রতা বা পরিপূর্ণতা, সে হ'তে চায় সর্ব্বতোমুখ।

অল্পবয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের জন্যে নাটকীয় হাসির খোরাক যোগাবার চেষ্টা করেছেন। পাঠকদের জন্যে বললুম এই কারণে, বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চের কথা মনে রেখে তিনি বোধ হয় সেগুলি রচনা করেন নি। তাঁর এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, "ভারতী" ও "বালকে" প্রকাশিত কতকগুলি লেখা, যাদের সাধারণ নাম ছিল "হেঁয়ালি-নাট্য"। এগুলি ছাড়াও তিনি আরো কতকগুলি হাস্যকৌতুকপূর্ণ টুকরো নাট্যচিত্রে হাত দিয়েছেন। এ-সব চুটকি-সাহিত্যের অন্তর্গত হ'লেও বহু স্থলেই এদের লঘুত্বের মধ্যেও গুরুত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য কথোপকথনের ভিতর দিয়ে রচিত হ'লেই কোন-কিছু নাট্যপদবাচ্য হ'তে পারে না। কিন্তু ওগুলির মধ্যে আছে এতটা নাটকীয় রস বা ক্রিয়া যে, বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চের উপরে উপস্থাপিত করলেও ওরা দর্শকদের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে অক্ষম হবে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে যখন ওদের জন্ম হয়, তখন ওরা অভিনব ব'লেই পরিচিত হয়েছিল, কারণ তখন বাংলাদেশের আর কোন সাহিত্যিক ঠিক ঐ শ্রেণীর রচনায় হস্তার্পণ করেন নি। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম যুগেই কতকগুলি খণ্ড খণ্ড নাট্যচিত্র দেখানো হয়েছিল, যেমন—"বিলাতী বাবু, সাব্‌স্‌ক্রিপশ্যন বুক, প্রাইভেট থিয়েটারের গ্রীনরুম, মডেল স্কুল, মুস্তফী সাহেব-কা পাক্কা তামাশা, পরীস্থান" প্রভৃতি। তারা অল্পবিস্তর নাট্যরস পরিবেশন করত বটে, কিন্তু সাহিত্যরসের ধার বড়

ধারত না। তাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত চুটকি-নাট্যগুলির প্রধান পার্থক্য ছিল সেইখানেই।

১২৯৩ সালে রচিত টুক্‌রো টুক্‌রো হেঁয়ালি-নাট্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর কৌতুক-নাট্যগুলির পূর্ব্বাভাষ ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। ছোট ছোট লেখা, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় কতকটা অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু তার মধ্যে উচ্ছল হাস্যরস, শাণিত ব্যঙ্গবাণ, ভোগ্য আখ্যানবস্তু ও রম্য রচনা-কৌশলের অভাব নেই—বড় ছবি আঁকা যেন নখদর্পণে। এরই প্রায় সাত বৎসর পরে সঙ্গীত সমাজের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন, "গোড়ায় গলদ" প্রহসন। আগেই বলা হয়েছে, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ নেই, বাংলা নাট্য-জগতে এমন সব প্রহসন প্রথম রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথও অবলম্বন করেছিলেন তাঁর অগ্রজের প্রদর্শিত পথ। আগে তিনি যে সব হেঁয়ালি-নাট্য রচনা করেছিলেন সেগুলি ভিন্ন শ্রেণীর; কারণ তাদের মধ্যে ছিল নানাভাবে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আঘাত করবার চেষ্টা ও আগ্রহ। কিন্তু "গোড়ায় গলদে"র মধ্যে যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তা হচ্ছে, পাঠক ও দর্শকদের চিত্তকে কেবল অনাবিল হাস্যরসে স্নিগ্ধ করবার ইচ্ছা। প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও শ্লেষ প্রভৃতির দ্বারা আহত করবার শক্তি যে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্টই ছিল, তার নজীর কেবল হেঁয়ালী-নাট্যের মধ্যে নয়, তৎরচিত কোন কোন কবিতা এবং কয়েকটি নিবন্ধও তার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু "গোড়ায় গলদ" রচনাকালে তিনি এ শক্তি একেবারেই প্রয়োগ করেন নি। প্রেক্ষাগারে ব'সে লোকে প্রাণ খুলে হাসুক, দুঃখের দুর্ভোগ ভুলুক এবং নিশ্চিন্ত ভাবে অবসর যাপন করুক, এই ছিল নাট্যকারের একমাত্র ইচ্ছা।

"গোড়ায় গলদে"র রচনাকাল হচ্ছে ১২৯৯ সাল এবং তার প্রথম অভিনয় হয় সঙ্গীত সমাজেই। মহলার সময়ে সমাজের সম্রান্ত ও শিক্ষিত অভিনেতাদের নাট্যশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন নাট্যকার স্বয়ং। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে কোন প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। সমগ্র পালার সর্ব্বশেষে একটিমাত্র হাসির গান ছিল, তিনি কেবল সেইটি গাইবার জন্যে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখা দিতেন। এই নতুন ধরণের মার্জ্জিত ও নব্য সমাজের উপযোগী প্রহসনখানি যে সকলের উপভোগ্য হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু অভিনয়ের ভালো-মন্দের কথা বলতে পারব না, কারণ তখন আমি শিশু, সে অভিনয় দেখবার সুযোগ এবং বোঝবারও বয়স আমার হয় নি। বলা বাহুল্য নারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পুরুষরাই। তবে ওখানে যাঁরা নারীর

ভূমিকা গ্রহণ করতেন, পরে তাঁদের কারুর কারুর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের অভিনয় আমি দেখেছি। তাঁরা ছিলেন সুঅভিনেতা ও সুদর্শন।

১৩৩৫ সালে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ "গোড়ায় গলদ"কে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করেন এবং তার নূতন নামকরণ হয় "শেষরক্ষা"। সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্যে তার মধ্যে কয়েটি নূতন গান সংযোজিত হয়— যদিও সুকণ্ঠী গায়িকার অভাবে গানগুলির মর্য্যাদা যথার্থরূপে রক্ষিত হয় নি, তবে অভিনয়ের দিক দিয়ে পালাটি যার-পর-নাই উৎরে গিয়েছিল। "নাট্যমন্দিরে"র সেই অভিনয়ে শিশিরকুমার গ্রহণ করেন নাটকের মধ্যমণি চন্দ্রবাবুর ভূমিকা (সঙ্গীত সমাজের এই ভূমিকায় ছিলেন স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার শ্রীশচন্দ্র বসু)। অন্যান্য নটনটীর মধ্যে রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হীরালাল দত্ত, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, চারুশীলা, প্রভা ও কৃষ্ণভামিনীর নাম মনে পড়ছে—তাঁরাও আজ পরলোকগত। এই নাট্যাভিনয় চন্দ্রবাবু বা শিশিরকুমার একটি নূতনত্ব দেখিয়েছিলেন—যা তার আগে বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনো হয় নি। শেষ দৃশ্যে তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে প্রেক্ষাগারে নেমে এসে দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন।

রবীন্দ্রনাথ "গোড়ায় গলদ" রচনা করেন ১২৯৯ সালে। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই কৌতুকনাট্যের ও গল্পরচনার আসর ছেড়ে আবার ফিরে আসেন রোমাণ্টিক নাট্যকাব্যের ক্ষেত্রে এবং রচনা করেন "মালিনী" নাটিকা। এর আখ্যানবস্তুর উপরে বৌদ্ধ কথিকার ছায়া থাকলেও কবি নিজেই বলেছেন: "মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্ন-ঘটিত।" "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র মত "মালিনী"ও আকারে ছোট এবং পূর্ব্বোক্তের চেয়ে এর দৃশ্যের সংখ্যা আরো কম— মাত্র পাঁচটি। সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্রতার জন্যেই সাধারণ রঙ্গালয়ে এখানি গৃহীত হয় নি এবং এদেশের কোন সৌখান সম্প্রদায়েও এর অভিনয় হয়েছে কিনা, আমরা সে খবর রাখি না।

এই সময়েই এবং "গোড়ায় গলদ" রচনার চার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩০৩ সালে— হয়তো উপরোধে প'ড়েই—রবীন্দ্রনাথ "বৈকুণ্ঠের খাতা" নামে আবার একখানি কৌতুকনাটিকা রচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সঙ্গীত সমাজ নিয়ে মেতে আছেন এবং সমাজের নাট্যকুশলী সভ্যরা "গোড়ায় গলদে"র লোকপ্রিয়তা দেখে কবির আর একখানি হাস্যনাট্য মঞ্চস্থ করবার জন্যে উৎসুক হন ব'লে ঐখানেই "বৈকুণ্ঠের খাতা" প্রথম অভিনীত হয়। একটি বিশেষ কারণে সঙ্গীত-সমাজ বাংলা দেশের জন-

সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে। নট নাট্যকাররূপে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দক্ষতার কথা জানত কেবল ঠাকুরবাড়ীর পারিবারিক রঙ্গালয়ের দর্শকরাই, কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে নট-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভূমিকাসাধন ক'রে দেয় সঙ্গীত-সমাজই। উক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় পূর্ব্বেই তাঁর "রাজা ও রাণী" নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি যে একজন অসাধারণ অভিনেতা, বাইরের জনসাধারণের কাছে এ সত্য ছিল অজ্ঞাত। কেবল গভীর নাটকে ও অভিনয়ে নয়, হাস্যনাট্যে ও কৌতুকাভিনয়েও তাঁর কৃতিত্ব যে কতখানি, কবিকে ঠাকুরবাড়ীর বাইরে এনে সঙ্গীত সমাজই তা প্রমাণিত করে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে একটি-মাত্র সাহায্য-রজনীতে "বাল্মীকি প্রতিভা"য় রবীন্দ্রনাথের মঞ্চাবতরণের কথা এখানে না ধরলেও চলবে)।

রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম কৌতুকনাট্য মঞ্চস্থ করবার গৌরবও সঙ্গীত সমাজের। তাঁর একাধিক নাটক ও উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপ সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর স্বহস্তরচিত কোন কৌতুকনাটিকার দিকে ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি বহুকাল পর্য্যন্ত। অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম কৌতুকনাট্য পেশাদার থিয়েটারে দেখানো হয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। বিখ্যাত গল্পলেখক ও নাট্যকার স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ১৯২১ (কি ১৯২২) খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের "বশীকরণ" নামে হাস্যনাট্য মিনার্ভা-থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। পরে ষ্টার থিয়েটারেও ঐ নাটকখানির অভিনয় দেখায়, কিন্তু মিনার্ভাকে উৎরে যেতে পারে নি।

সঙ্গীত সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অলীকবাবু" নামে কৌতুকনাট্যের নাম-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের হাস্যাভিনয় দেখে স্বর্গীয় কবি প্রিয়নাথ সেন মত প্রকাশ করেছিলেন: "এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। * * * * * যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে।" রবীন্দ্রনাথ "বৈকুণ্ঠের খাতা"য় কেদারের ভূমিকাটিও গ্রহণ করেছিলেন এবং অবিনাশ সেজেছিলেন নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। ১৩০৩ সালের সে অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কারণ তখন আমি বালক। কিন্তু তার প্রায় দুই যুগ পরে নট রবীন্দ্রনাথকে কেদারের ভূমিকায় না দেখলেও জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভবনে "বিচিত্রা"

সভার আসরে ঠাকুরবাড়ীর শিল্পীদের দ্বারা "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। সেও এক অসাধারণ অনুষ্ঠান। দ্বিতলের হলঘরে বাঁধা একটি ছোটখাটো, কিন্তু অপূর্ব্ব রঙ্গমঞ্চ—তার সর্ব্বত্র পাওয়া যায় কলাদক্ষের হাতের স্পর্শ। নাট্যাভিনয়ের কুশীলবগণ হচ্ছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রভৃতি এবং প্রেক্ষকবৃন্দের মধ্যে বিরাজ করছেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ মানী, জ্ঞানী ও গুণীর দল। "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয় অতিশয় কৌতুকাবহ হবার সম্ভাবনা থাকলেও আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা আজ পর্য্যন্ত এদিকে আকৃষ্ট হন নি। বোধ করি এর একমাত্র হেতু হচ্ছে, নারীভূমিকার অভাব।

নারী-ভূমিকা নেই, অথচ নাটক-নাটিকার অভিনয় চলছে, আমাদের পেশাদার থিয়েটারের মালিকদের চোখে এটা বোধ হয় বিসদৃশ ব্যাপারের মত। অতীতে নারীবর্জ্জিত রঙ্গালয় চালাতে বাধ্য হয়েও তাঁরা দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করতেন—অর্থাৎ মঞ্চের উপরে টেনে আনতেন নারীর ছদ্মবেশে দাড়ি-গোঁফ-কামানো পুরুষদের। চোখ আর কান সে ফাঁকি সহজেই ধ'রে ফেললেও, অভিনয়ের নামে সেই নপুংসকসুলভ ন্যাকামি আমাদের সহ্য করতে হ'ত সুবোধ বালকের মত। সঙ্গীত সমাজের নারী-বর্জ্জিত নাট্য সম্প্রদায়ের উপযোগী ক'রেই নাকি "বৈকুণ্ঠের খাতা" বিরচিত হয়েছিল, হয়তো সেই কারণেই ঐ নাটিকায় নারীদের কিছুমাত্র আমল দেওয়া হয় নি।

প্রায় এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রখ্যাত রচনা "চিরকুমার সভা"র জন্ম হয়। "ভারতী" মাসিক পত্রিকায় কয়েকটি কিস্তিতে তা প্রকাশিত হয় অর্দ্ধ-নভেল ও অর্দ্ধ-নাটকের আকারে। কিশোর বয়সে পড়বার সময়ে এর রচনা-পদ্ধতিটির ভিতরে আমরা যথেষ্ট নূতনত্বের পরিচয় পেয়েছিলুম। কিন্তু এর মধ্যে উপন্যাসের চেয়ে নাটকের মালমশলাই বেশী আছে ব'লে প্রায় চব্বিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের জন্য রচনাটিকে পুরোপুরি নাটকের রূপ দেন এবং এই কাজে মাঝখানে থেকে দৌত্য করেছিলেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

"চিরকুমার সভা"কে নাট্যকার অভিনয়ের উপযোগী ক'রে তুললেন বটে শিশির সম্প্রদায়ের জন্যে, কিন্তু তা অভিনীত হ'ল ষ্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা। কারণের কথা আগেই বলা হয়েছে। পুরাতন যুগে আত্মপ্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নূতন যুগের সাহিত্যগুরু। কেবল কাব্যে ও উপন্যাসে নয়, নাট্যকলাতেও দান তাঁর অসাধারণ। বাংলা দেশের আধুনিক রঙ্গালয় নবযুগের উদ্বোধক ব'লে

কথিত হয়, অথচ যাঁর একাধিক নাটক বিভিন্ন দেশে পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চেও সসম্মানে স্থান পেয়েছে, তাঁর নূতন কোন রচনার সঙ্গে আধুনিক বাঙালী নাট্যরসিকরা পরিচিত নন, এটা ছিল একটা কলঙ্কের কথা। এই কলঙ্ক মোচন করবার সুযোগ গ্রহণ ক'রে আর্ট সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষ লাভ করলেন সকলের সাধুবাদ। কেবল ঐ হাসির নাটক নয়, তারপর রবীন্দ্রনাথের একাধিক গম্ভীর নাটক নিয়েও তাঁরা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু সে সব কথা হবে পরে যথাসময়ে।

পুরাতন যুগের বাংলা রঙ্গালয় যখনই সুযোগ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করতে ছাড়ে নি। "রাজা ও রাণী" প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) এমারেল্ড থিয়েটারে সাদরে অভিনীত হয়ে লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল। তাঁর "বিসর্জ্জন"ও নিশ্চয়ই সেই যুগেই পাদপ্রদীপের আলোকে দেখা দিত, কিন্তু যে অনিবার্য্য কারণে সেটা সম্ভবপর হয় নি, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযোগী আর কোন পঞ্চাঙ্ক নাটক রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রচিত একাধিক খণ্ডনাটিকা ("চিত্রাঙ্গদা" এবং "কচ ও দেবযানী") সেখানে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। উপরন্তু পেশাদার থিয়েটারের কর্ত্তারা তাঁর মৌলিক নাটকের অভাব পূরণ করবার জন্যে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখিয়েছিলেন "বউ ঠাকুরাণীর হাট" ও "চোখের বালি" উপন্যাসের নাট্যরূপ। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচিত গল্প অবলম্বনে কয়েকখানি নাটিকা লিখিত ও অভিনীত হয়েছিল। এবং শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাবের সময়েই গিরিশোত্তর যুগের মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা কৌতুকনাট্য "বশীকরণ"।

অবশ্য "বশীকরণ" অভিনয়ের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-নাট্যগুলি এবং সেইগুলিই তাদের আধুনিকতার জন্যে সমাদর লাভ করেছিল প্রতীচ্যের রসিকসমাজে। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-অমৃতলালের যুগে বাংলা রঙ্গালয় চলছে যখন পূর্ণ গৌরবে, রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখন এ-শ্রেণীর কোন নাটক প্রসব করে নি। তখনকার প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের যে এ ধরণের নাটকে সফল অভিনয় করবার শক্তি ছিল গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতিকে যাঁরা মঞ্চের উপরে দেখেছেন, এমন কথা তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না এবং আমি নিজেই এই স্বীকার না করার দলে। যে অতুলনীয় কণ্ঠস্বর প্রকাশ করত "প্রফুল্ল" নাটকের যোগেশ ভূমিকার কারুণ্য, তা সার্থক ক'রে তুলতে পারত যে কোন গুরুতম নাটককেও। কিন্তু উপযোগী অভিনেতা থাকলেও ঐ শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ের সময়ে তখনকার প্রেক্ষাগারে যে রীতিমত বিদ্রোহ সৃষ্ট হ'ত,

তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। যারা "ম্যাকবেথে"র মত মেলোড্রামাকেই আমল দেয় নি, "রাজা" "অচলায়তন" বা "ডাকঘর" প্রভৃতির অভিনয় দেখতে বাধ্য হ'লে নিশ্চয়ই তারা মারমুখো হয়ে উঠত।

গিরিশোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের নাট্যশিল্পীদের অধিকাংশই তখন এতটা অধঃপতিত যে, শিল্পী আখ্যালাভেরও যোগ্য ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের প্রতীকনাট্যে ভূমিকাগ্রহণ করবেন কি, নিম্নতম শ্রেণীর বাংলা নাটকেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করতে পারতেন না। এবং তখনকার প্রেক্ষাগারের অবস্থা ছিল গিরিশ-যুগেরও চেয়ে শোচনীয়, কারণ রসিকদের অধিকাংশই তাকে বয়কট করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর এল তথাকথিত নবযুগ। নাট্যমঞ্চে দেখা দিলেন সেরা সেরা কয়েকজন শিল্পী। প্রেক্ষাগারেও এমন সব দর্শকের সংখ্যা বেড়ে উঠল, যাঁদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রসবোধের উপরে নির্ভর করা যেতে পারে অনায়াসেই। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। কারণ সে সংখ্যাবৃদ্ধি যে সন্তোষজনক নয়।

ষ্টার থিয়েটারে "চিরকুমার সভা" মঞ্চস্থ করবার তোড়জোড় চলতে লাগল। এর আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের যে সব নাটক বা গল্পোপন্যাসের নাট্যরূপ দেখানো হয়েছিল, তার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর শিল্পীদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এবারের নাট্যানুষ্ঠানে দেখা গেল তার স্মরণীয় ব্যতিক্রম। "চিরকুমার সভা"র দৃশ্যপট ও মঞ্চসজ্জার এবং সঙ্গীতশিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন যথাক্রমে স্ববিভাগে অদ্বিতীয় চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা দেশের পেশাদার রঙ্গালয়ে এর আগে বা পরে এমন যোগাযোগ আর কখনো সম্ভবপর হয় নি। ফলে রঙ্গমঞ্চের উপরে সৃষ্ট হয়েছিল যে শিল্পীর স্বর্গ, "চিরকুমার সভা"র আধুনিক পুনরভিনয়েও পাওয়া যায় না আর তার সন্ধান। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ হবার আগেই ঘটল আর এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

অভিনয়ের উপযোগী ক'রে প্রস্তুত পাণ্ডুলিপির পাঠ শোনবার জন্যে আমন্ত্রণ এল নাট্যকারের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখে তাঁর একাধিক নাটকের পাঠ এর আগেই আমরা শ্রবণ করেছিলুম। কিন্তু এবারকার অনুষ্ঠান অধিকতর স্মরণীয় হবার কারণ, এই পাঠ হয়েছিল একাধারে আবৃত্তি ও অভিনয়ের মাঝামাঝি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর "বিচিত্রা" ক্লাব বা সভা ছিল অতিশয় বিখ্যাত বৈঠক। তার কথা অন্যত্র আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। এখানে পাঠকদের সুবিধার জন্যে

খুব সংক্ষেপে তার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা দরকার। "বিচিত্রা"র সম্পাদক ও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ এবং (বিনা দক্ষিণায়) সভ্য-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন সমগ্র কলকাতার শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী, গুণী ও মানী ব্যক্তিগণ। বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক প্রখ্যাত সাহিত্য-শিল্পীদের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা পাঠ ও সাহিত্যালোচনা তো হ'তই এবং সেই সঙ্গে থাকত থিয়েটার, যাত্রা, নাচ, গান ও বাজনা প্রভৃতির ব্যবস্থা।

"চিরকুমার সভা" পাঠের দিন সেখানে অন্যান্য সভ্যদের খবর পাঠানো হয় নি, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেবল ঠাকুরবাড়ীর এবং "ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদের কয়েকজন। তাঁদের প্রায় সকলেই আজ পরলোকগত। প্রকাণ্ড হলঘরের এক প্রান্তে বসল মজলিস এবং মাঝখানে আসীন হলেন পাণ্ডুলিপি হস্তে নাটের গুরু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। জনতার মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন কবিবরকে সেদিন পেয়েছিলুম একেবারে নিজেদের প্রাণের কাছাকাছি।

রবীন্দ্রনাথ পাঠ সুরু করলেন। হাস্যনাট্যের পাঠ, তাই তাঁর কণ্ঠস্বরও হয়ে উঠল উচিতমত চটুল এবং চোখে-মুখেও ফুটতে লাগল তরল ভাবের লীলা। মঞ্চের উপরে কখনো তাঁকে কৌতুকনাট্যাভিনয়ে দেখবার সুযোগ পাইনি, কিন্তু সেই পাঠের সময়েই যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাইতে বেশ বুঝতে পারলুম যে, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর হাস্যাভিনেতা। ভালো ক'রে ভাবাভিব্যক্তির জন্যে মাঝে মাঝে যথাস্থানে নিপুণ অঙ্গুলি-ইঙ্গিতেরও অভাব হ'ল না। পালায় অনেকগুলি গান ছিল, কিন্তু গানের কথা তিনি আবৃত্তি ক'রে শোনালেন না, নিজের স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে সুরে গেয়ে শুনিয়ে যেতে লাগলেন এবং পুরুষদের সংলাপে পুরুষালী ও মেয়েদের সংলাপে মেয়েলী ভাব ফোটাতেও কসুর করলেন না। একাই একাধিক হয়ে তিনি প্রকাশ ক'রে গেলেন প্রত্যেক কুশীলবের তাবৎ বিশেষত্ব এবং আমরাও চিত্রার্পিতের মত ব'সে চোখ-কান-মন দিয়ে উপভোগ করতে লাগলুম সেই বিচিত্র পাঠের বা অভিনয়ের অপূর্ব্বতা। বহু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার মুখে নাটকপাঠ শ্রবণ করেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পাঠ শুনে সত্য সত্যই মনে হয়েছে—"তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।" সেদিন রবীন্দ্রসকাশে লাভ করেছিলুম যে অবর্ণনীয় আনন্দ, সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগারে গিয়েও "চিরকুমার সভা" দেখে আমি আর তা পাই নি এবং পাবার আশাও করি নি।

নাট্যরসিকরা ষ্টার থিয়েটারের "চিরকুমার সভা"র অভিনয়কে অভিনন্দন দিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি। এ শ্রেণীর হাস্যনাট্য তার আগে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে আর কথনো অভিনীত হয় নি। বাংলাদেশে থিয়েটারি হাসির পালার ভাষা ও রচনারীতির উপরে যুগোপযোগী প্রভাব যে পড়ে নি, এ কথা সকলেই জানেন। কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকথানি হাস্যনাট্যে এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল। কিন্তু "আনন্দবিদায়ে" তিনিও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা"র ভাষা, লিখনভঙ্গি ও রুচি একেবারেই নবযুগের উপযোগী, যদিও তার অধিকাংশ রচিত হয়েছিল অর্দ্ধশতাব্দীরও আগে। এ থেকেই মনে হয়, যথার্থ শ্রেষ্ঠ লেথকরা রচনায় নিযুক্ত হন সমসাময়িক যুগের পরবর্ত্তীকালের দিকেই দৃষ্টি রেখে।

ষ্টার থিয়েটারে "চিরকুমার সভা"র অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী নাম কিনেছিলেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী (চন্দ্র), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রসিক), তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী (অক্ষয়) ও নীহারবালা (নীরবালা)। শেষোক্ত অভিনেত্রী সম্বন্ধে আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে আধুনিক রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যথার্থ মর্য্যাদা দেন সর্ব্বপ্রথমে তিনি এবং এটা যে সম্ভবপর হয়েছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাগুণেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। পরে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীও চন্দ্রবাবু ও রসিক দুই ভূমিকাতেই প্রভূত প্রশস্তি অর্জ্জন করেছেন।

কিন্তু "চিরকুমার সভা"র অভিনয় বাংলা নাট্যজগতের একটা স্মরণীয় ব্যাপার হ'লেও তা আনন্দ বিতরণ ক'রতে পেরেছিল কেবল নির্দ্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যেই। হাল্‌কা কৌতুকনাট্য হ'লেও তার সাহিত্য-রসপূর্ণ সংলাপ সাধারণ বাঙালী প্রেক্ষকদের পক্ষে হয়েছিল গুরুপাক, পঞ্চাশ বৎসর আগেকার বাংলা ভাষাও তাদের ধাতস্থ হয় নি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, ষ্টার থিয়েটারে কয়েক দিন অভিনয়ের পরেই "চিরকুমার সভা"র সঙ্গে আর একটি পালা জুড়ে দিতে হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

নাট্যজগতের নূতন পথে

নারী-ভূমিকাকে আমল না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকনাটিকা "বৈকুণ্ঠের খাতা" রচনা করেন ১৩০৩ সালে। এর সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই যা বলা হয়েছে, তার বেশী আর কিছু না বললেও চলবে। কিন্তু একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। "বৈকুণ্ঠের খাতা"ই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পুরাতন পর্য্যায়ের শেষ নাটক রচনা—যার আরম্ভ হয়েছিল ১২৮৭ সালে রচিত "বাল্মীকি-প্রতিভা" থেকে। কেবল তাই নয়, "বৈকুণ্ঠের খাতা"ই হচ্ছে রবীন্দ্র-রচিত উল্লেখযোগ্য শেষ হাস্যনাট্য।

"বাল্মীকি-প্রতিভা", "মায়ার খেলা", "রাজা ও রাণী", "বিসর্জ্জন", "গোড়ায় গলদ" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা" (অধিকতর ক্ষুদ্র নাটিকাগুলির নাম করলুম না) প্রভৃতি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নাট্য-জগতের পুরাতন আবেষ্টনের মধ্যেই আবদ্ধ। যদিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা অল্পবিস্তর পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়ে নাট্য জীবন সুরু ক'রে ক্রমে ক্রমে নিজের অগ্রজের প্রভাব-মণ্ডলের বাইরে গিয়ে তিনি উচ্চতর শ্রেণীর প্রতিভার সম্যক পরিচয় দিয়েছিলেন, তবু তাঁর নাটকীয় রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যাবে যে এলিজাবেথীয় যুগেরই ক্ষীণ বা স্পষ্ট প্রতিধ্বনি, একটু লক্ষ্য করলেই তার প্রমাণ পেতে বিলম্ব হয় না। পূর্ব্বোক্ত আবেষ্টনের মধ্যে থেকেই বাংলাদেশের মাইকেল মধুসূদন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্য্যন্ত প্রত্যেক নাট্যকারই নাটক রচনা ক'রে গিয়েছেন। তার বাইরেও যে নাটক রচনার কোন নূতন পদ্ধতি থাকতে পারে, তা নিয়ে কেউ আর মস্তিষ্ক চালনা দরকার মনে করেন নি।

কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখ করা উচিত। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রধান নাট্যকার যে গিরিশচন্দ্র, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। রঙ্গালয়ের মালিকরা তাঁকে "প্লে-রাইটে"র জীবন-যাপন করতে বাধ্য করেছিল, জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে নাটক লেখা ছাড়া তাঁর আর উপায় ছিল না। এর ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে, কারণ গিরিশচন্দ্রের মধ্যে ছিল উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর নাট্যপ্রতিভা। এইজন্যে শেষ বয়সে তাঁর মনে নূতন পদ্ধতিতে নাটক রচনা করবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। তাঁর "শঙ্করাচার্য্য" ও "তপোবল" নাটক রচিত বা অভিনীত

হয়েছিল যথাক্রমে ১৯১০ ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল, নাটক-রচনার পুরাতন পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতি নয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত প্রকাশ করেছেন, যথা: "যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য, বুদ্ধ, শঙ্কর, কুমারিল ভট্টের জীবনের বাইরে dramatic events কিছুই নেই বললে চলে। কিন্তু এঁদের ভিতরের জীবন full of dramatic actions. ...এই যে ভিতরের দ্বন্দ্ব internal dramatic actions—যা সামান্য স্থূলভাবে বাইরে প্রকাশ পায়, সেই—internal actions এঁকে দেখানোই best literary art. ...এখন দেখান হয় বাইরের ঘটনাকে prominent ক'রে মনের বিশ্লেষণ। তা নয়। Actions through mind—actions in internal life—actions—intense actions in deep meditation."

গিরিশচন্দ্র যখন ঐ মত জাহির করেন, তখন বেলজিয়মের কবি-নাট্যকার মেটারলিঙ্ক ফরাসী ভাষায় নূতন ধরণের নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন (তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাটক "ব্লু-বার্ড" প্রায় সেই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল)। কিন্তু গিরিশচন্দ্র যে নবপদ্ধতিতে রচিত মেটারলিঙ্কের প্রাথমিক রচনাগুলি পাঠ করবার সুযোগ পান নি, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নিজেরই গভীর ধ্যানধারণার ফলে তিনি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে "তপোবল" রচনার পরেই গিরিশচন্দ্রকে ইহধাম ত্যাগ করতে হয়েছিল, আপন মনোবাসনা পূর্ণ—অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়াপ্রধান নাটক রচনা—করবার অবকাশ তিনি পাননি।

"বৈকুণ্ঠের খাতা" লেখবার পরে রবীন্দ্রনাথ কেবল যে নাটক রচনার পুরাতন ধারা ত্যাগ করেছিলেন তা নয়, উপরন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্র থেকেও বিদায় গ্রহণ করেছিলেন দীর্ঘকালের জন্যে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধাদি রচনা, মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা এবং শান্তি নিকেতনের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ ও বিচিত্র কাজ নিয়ে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন প্রায় একযুগ পর্য্যন্ত। এর মধ্যে সঙ্গীত সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ক্রমে কমে এসে অবশেষে ১৩০৯ সালে একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। কেবল একদিক দিয়ে নাট্যজগতের সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ ছিল এবং তা হচ্ছে সঙ্গীত রচনা।

ইতিমধ্যে য়ুরোপীয় নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়েছে। মরিস মেটারলিঙ্কের প্রতিভা সেখানে আনলে এমন এক নূতন ধারা, যার সঙ্গে পূর্ব্বযুগের নাটকীয় আদর্শ কিছুতেই খাপ খায় না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে "ব্লু-বার্ড" প্রকাশিত হবার পর সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয় বিশেষভাবে। য়ুরোপীয় সাহিত্য ছিল রবীন্দ্রনাথের নখ-

দর্পণে, সুতরাং মেটারলিঙ্কের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর ভাবগ্রাহী চিত্তও যে জাগ্রত হয়েছিল, এ সত্যটুকু সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কেবল তিনি নন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় নাট্যকারগণ এই অভিনয় পদ্ধতির মধ্যে পেলেন প্রভূত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। রুষিয়ার অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার লিওনিড আন্দ্রীভও "প্যান্‌সাইকি" বা আত্মাশ্রয়ী নাটকের আন্দোলন তুলে প্রশ্ন করলেন, "Is action, in the accepted sense, of movements and visible achievements on the stage, neccessary to the theatre ?" এবং নিজেই তিনি উত্তর দিলেন, "না"। রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত মত অবলম্বন করলেন এবং তার ফলে তাঁরও নাটক রচনার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। ১৩১৫ সালে রচিত তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে আংশিক ভাবে ঐ পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত দেখা যায়।

কেবল যুগকালব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ এবং গল্পোপন্যাস রচনা বা সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা বা বিদ্যালয় পরিচালনা নয়, রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আরো নানাদিকে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ঘূর্ণি-হাওয়ার মধ্যেও তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না ক'রে পারেন নি। কিন্তু সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা এখানে অবান্তর। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ১৩০৩ সালে "বৈকুণ্ঠের খাতা" রচনার পর যে একযুগ কেটে যায়, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাট্যসাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছুমাত্র অবসর পান নি। তাঁর নাট্যজীবনে এসময়টা ছিল যেন দুর্ভিক্ষের যুগ, অথচ তিনি প্রথম প্রেমের সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন কবিতার মাধ্যমে নাট্যকলার সঙ্গেই এবং পরে এ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন প্রায় শেষ-জীবন পর্য্যন্ত।

তারপর ১৩১৫ সালে আবার তিনি সাড়া দেন নাট্যকলার আহ্বানে। একখানি নাটক রচনায় নিযুক্ত হলেন বটে, কিন্তু তাও সর্ব্বতোভাবে মৌলিক নাটক নয়। "বাল্মীকি-প্রতিভা" প্রভৃতি রচনার পরেই তিনি "বৌঠাকুরাণীর হাট" রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বৎসর। বলা বাহুল্য, তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল তৎকালীন কথাসাহিত্যেরই যুগধর্ম্ম। কিন্তু উপন্যাস হ'লেও সেই রচনার দিকে আকৃষ্ট হন তখনকার সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও, কারণ "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র মধ্যে বাংলা থিয়েটারের অধিকাংশ দর্শক যা ভালোবাসেন সেই মেলো-ড্রামাটিক নাটকীয় ক্রিয়ারও অভাব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ এই কারণেই আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে

অতিশয় লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল। নাট্যশালার কর্ম্মকর্ত্তাদের অনুমান যে বেঠিক নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন কেদারনাথ চৌধুরী "বৌঠাকুরাণীর হাট" অবলম্বনে "বসন্ত রায়" পালাটি ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে)। পালাটি লোকের এমন মনে ধরেছিল যে, তার কয়েকটি গান পথে পথে নানাজনের মুখে মুখে শোনা যেত বহুকাল পর্য্যন্ত। বাল্যকালে সে সব গান আমাদেরও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং পরে প্রথম বয়সে আমরা মিনার্ভা থিয়েটারে "বসন্ত রায়ে"র পুনরভিনয় দেখবারও সুযোগ পেয়েছি। ঐ "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র আখ্যানভাগ যে আজও আমাদের আনন্দদান করে—আধুনিক চলচ্চিত্রেও তার সার্থকতা দেখে অনায়াসে সেটা উপলব্ধি করা যায়।

নাট্যজগতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে রবীন্দ্রনাথ আবার "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র আখ্যানকেই কাঠামো ক'রে নূতন পালা বেঁধে তার নাম রাখলেন "প্রায়শ্চিত্ত" এবং তারপর আবার তাকে বদলে নাম দিলেন "পরিত্রাণ"। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টি নিয়ে এমনি ভাঙা-গড়ার খেলা খেলেছেন বারংবার—যেন প্রথম রূপকেই চরম রূপ বলে মেনে নিয়ে তিনি তৃপ্তি পেতেন না। এদিক দিয়েও তিনি বিশ্বসাহিত্যে একেবারেই অদ্বিতীয়। পুরাতন রচনা "বৌঠাকুরাণীর হাট" কেবল নূতন রূপ ও নূতন নাম ধারণই করলে না, তার মধ্যে দেখা দিলে নূতন চরিত্রও। এবং তা হচ্ছে ধনঞ্জয় বৈরাগী।

"বৌঠাকুরাণীর হাটে"র নাটকীয় আখ্যান সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হয়, কারণ তার মধ্যে ছিল পূর্ব্বকথিত এলিজাবেথায় যুগের নাট্যক্রিয়া। কিন্তু সুদীর্ঘ আটাশ বৎসর কাল পরে রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে যখন ধনঞ্জয় বৈরাগী আত্মপ্রকাশ করে, নাটকীয় ক্রিয়া ও আদর্শ সম্বন্ধে তখন তাঁর মতামত পরিবর্ত্তিত হয়ে অবলম্বন করেছে আধুনিক নাট্যজগতের নূতন ধারা। সুতরাং সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই গঠিত হয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র। এখানে আমরা রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের কথা উদ্ধার করছি: "এটি কবির নূতন সৃষ্টি।" অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে বাস্তব বা মানবভূমিক নাটকের সমাপ্তি ও আদর্শ বা রাহস্যিক নাটকের সূত্রপাত। এই আদর্শের দ্বারে দাঁড়াইয়া ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রতাপ বলিলেন, "বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভালো, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।" তাহার উত্তরে বৈরাগী বলে, "মহারাজ, রাজ্যটাও ত রাস্তা। চলতে পারলেই হলো। ওটাকে যে পথ ব'লে জানে সেই ত পথিক; আমরা কোথায়

লাগি ?" এই উক্তিতে নাটকের symbolic বা রূপক রূপটি প্রথম খুলিয়া গেল। বৈরাগীর এই উত্তরের মধ্যে উপনিষদের রাজর্ষিদের জীবনাদর্শ ফুটিয়াছে ; চিরন্তন ভারতের কথা এই সংসারটা পথ, রাজ্যটা পথ—গমনের স্থান—গম্যস্থান নহে। ধনঞ্জয় হইতেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী নাটকসমূহের ঠাকুরদা, গুরু, দাদাঠাকুর প্রভৃতি অপরূপ চরিত্রের উদ্ভব।

পূর্ব্বোক্ত নাটকের অজন্মার দিনে অভিনয় ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। কেবল ১৩০৭ সালে ত্রিপুরার মহারাজার অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে বিশেষ এক রাত্রির জন্যে "বিসর্জন" নাট্যাভিনয়ে রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৩১৭ সালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্ররা যখন "প্রায়শ্চিত্ত" নাটককে মঞ্চস্থ করেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন নি। কিন্তু তারপর ঐ নাটকের পুনরভিনয়ে সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হয়ে তিনি আবার রঙ্গমঞ্চের উপরেও প্রত্যাগমন ক'রে দেখা দেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর গীতিবহুল ভূমিকায়। কিন্তু তেমন দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সৌভাগ্য কলকাতার নাট্যরসিকদের হয় নি। তবে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে "প্রায়শ্চিত্তে"র সংস্কৃত রূপ "পরিত্রাণ"কে দেখা গিয়েছিল এবং গায়ক-নট তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করেছিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা। কিন্তু বাংলাদেশের যে জনসাধারণ "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র আখ্যানকে সাদরে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল, প্রতীক বা "সিম্বল" রূপে গ্রহণীয় ধনঞ্জয় বৈরাগীকে তারা আমলে আনতে পারে নি। "পরিত্রাণ" না জমবার আরো একটি কারণ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের "প্রপাগাণ্ডা" রূপে কল্পিত যে প্রতাপাদিত্যকে আমরা মঞ্চের উপরে দেখি, "পরিত্রাণে"র প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দী নিয়ে এসেছে নব নব পরিবর্ত্তনের বহুমুখী ধারা—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলা দেশেও। নাট্যসাহিত্যে নয়, কথা-সাহিত্যেও আমাদের এখানে প্রথম ও প্রধান পরিবর্ত্তকের আসন অধিকার করলেন রবীন্দ্রনাথই। নূতন শতাব্দীর নূতন প্রেরণায় তিনি কেবল নাট্যসাহিত্যেরই সাবেক রীতি পরিহার করলেন না, ভেঙে গড়লেন আমাদের কথাসাহিত্যকেও। গত শতাব্দীতে উঠতি বয়সে তিনি রচনা করেছিলেন "বৌঠাকুরাণীর-হাট" ও "রাজর্ষি"। ঐ দুইখানি উপন্যাস রচনার সময় তিনি বঙ্কিম-যুগের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি—যদিও ঐ দুটি রচনার স্বকীয় দান আছে ভূরি পরিমাণেই।

উপরন্তু ঐ দুটি রচনার মধ্যে এমন সম্ভাবনারও ইঙ্গিত ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে তার স্থান হবে পুরোবর্ত্তীদের সঙ্গেই। সেই ইঙ্গিত অবশেষে হয়ে উঠল সুস্পষ্ট। নূতন শতাব্দীতে দেখা গেল "চোখের বালি" নিয়ে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হ'ল "নষ্টনীড়", নৌকাডুবি" ও গোরা",—ওদের মধ্যে বঙ্কিম যুগের প্রভাব নেই কিছুমাত্র এবং ওরাই হচ্ছে বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রদূত। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র প্রমুখ প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই কথাসাহিত্যের ঐ ধারা অবলম্বন ক'রেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এই নূতন ধারার বিশেষত্ব নিয়ে এখানে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা করা যেতে পারত, কিন্তু মুখ্য বিষয়ের বহির্ভূত ব'লে সে লোভ সংবরণ করলুম।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখেছি, ১৩১৫ সালে "প্রায়শ্চিত্ত" রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা নাট্যসাহিত্যের নূতন ধারার সূত্রপাত করেছিলেন, যদিও পুরাতন "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র উপরে তার ভিত্তি ছিল ব'লে সে ধারা একান্তভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। কিন্তু ১৩১৭ সালে রচিত "রাজা"র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা গৃহীত নাটকের নূতন আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়ে উঠল। বলা যেতে পারে যে, এবারেও নাটকের কাহিনী একেবারে নূতন বা মৌলিক নয়, নাট্যকারের পরিকল্পনার সহায়ক হয়েছে বৌদ্ধজাতক, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! কারণ পরিকল্পক এখানে প্রাচীন আখ্যাটিকে 'ঢেলে সেজে' এমন ভাবে নিজের মনের মত ক'রে নিয়েছেন, ব'লে না দিলে তার মধ্য থেকে জাতকের গল্প আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। যা ছিল কেবল বৌদ্ধজাতকের একটি বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের কাহিনী, তা হয়ে উঠেছে সর্ব্বকালের বিশ্বমানবের উপযোগী। এবং এটা যে আমাদের মনগড়া কথা নয়, তার প্রমাণ হচ্ছে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশেরও নানা স্থানে যখন ঐ নাটকের অভিনয় হয়, তখন বিদেশী দর্শকরা তার ভিতরের রস উপলব্ধি করতে পারে।

কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ "চোখের বালি" প্রভৃতি উপন্যাস রচনার সময় বাইরের ঘটনার উপরে স্থান দিয়েছিলেন মানুষের মনকে। অতঃপর নাট্যকার রবীন্দ্রনাথও বহির্জগতের স্থূল ঘটনাগুলোকে আর প্রধান ক'রে দেখলেন না, নাটকীয় ক্রিয়ার জন্যে অবলম্বন করলেন মানুষের মনোজগৎকেই। "রাজা"র মূলকথা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তারপর সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর

অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তাতে পদে পদে বাধা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য্য, তাতেই আনন্দ।

কিন্তু "রাজা" নাটকের জন্যে বাংলা দেশের জনসাধারণ প্রস্তুত ছিল না। এখনো পর্য্যন্ত আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকরা মঞ্চের উপরে নাটকের স্থূল ঘটনাগুলোর ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই মত্ত হয়ে আছে, সুতরাং আজ থেকে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে রচিত "রাজা" নাটক পাঠ ক'রে তারা যে তার মধ্যে তথাকথিত নাটকত্ব খুঁজে পায় নি, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। উপরন্তু তাদের অনেকেই যে হতভম্ব হয়েছিল, এটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ওরই অল্প দিন আগে "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র আখ্যানবস্তুর ভিতরে প্রতীকরূপে গ্রহণীয় 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র অভাবিত ও আকস্মিক আবির্ভাবে তারা কতখানি সচকিত হয়েছিল তা বলতে পারি না, তবে ঐ নাটকের সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কাহিনীটি যে তাকে লোকসাধারণের ধারণার বাইরে যেতে দেয় নি, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু "রাজা" নাটক হয়েছিল একেবারেই ধারণাতীত। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি রবীন্দ্রনাথের অনেক গোঁড়া ভক্তও "রাজা" নাটকে কবির লেখনীর ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়েও তাকে অভিনেয় নাটক ব'লে মনে করতে পারেন নি। অবশ্য এ কথাও বলা বাহুল্য, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে যে আদর্শ অনুসারে অভিনয় হয়, তার মধ্যে "রাজা" নাটকের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু পেশাদার বাংলা রঙ্গালয়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই, কারণ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা পূর্ণমাত্রায় মনীষা ও সংস্কৃতির অধিকারী না হ'লে "রাজা"র মত নাট্যাভিনয়ে পেশার গোড়ায় ছাই পড়বারই সম্ভাবনা। যার চাহিদা নেই, তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার দুর্ব্বুদ্ধি পেশাদার মঞ্চমালিকের হবে কেন? রবীন্দ্রনাথ নিজে "রাজা"কে নূতন রূপে সাজিয়ে "অরূপরতন" নামে পরিচিত করেছিলেন (১৩২৬ সাল) এবং পরে নূতন কৌশলে তার অভিনয়ও দেখিয়েছিলেন শান্তি-নিকেতনে (১৩৩১ সাল)। তার নূতনত্বটা হচ্ছে এইখানে: নট-নটীরা করলেন মূক ভাবাভিনয় এবং তাদের মুখে ভাষা দেবার জন্যে নাটকের ব্যাক্যাংশ আবৃত্তি ক'রে গেলেন নাট্যকার স্বয়ং। ঐ অনুষ্ঠানের আর একটি উল্লেখ্য ব্যাপার হচ্ছে মূকাভিনয়ের

সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সেই সর্ব্বপ্রথমে নৃত্যাভিনয়ও দেখানো হয়েছিল। আমরা কিন্তু "অরূপরতন" অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের সুললিত কণ্ঠের অতুলনীয় আবৃত্তি শোনবার সুযোগ পাই নি, কারণ শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা কলকাতায় যখন নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন পরলোকে। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে ব'সে সেদিন কিন্তু আর একটি সত্য উপলব্ধি করেছিলুম। "রাজা" বা "অরূপরতন"কে প্রতীক-নাট্যরূপে যারা গ্রহণ করতে অক্ষম, সেই সাধারণ শ্রোতার দল তাকে স্থূলভাবে দেখলেও তার মধ্যে লাভ করতে পারেন প্রচুর উপভোগের খোরাক এবং প্রভূত নাটকীয় ক্রিয়ার খেলা। চন্দ্রের পিছনে সূর্য্যের অস্তিত্ব আছে না জেনেও শিশু যেমন জ্যোৎস্না দেখে খুসি হয়, এও হচ্ছে সেইরকম।

"অরূপরতনে"র (বা "রাজা"র) একটি অপূর্ব্বতার কথা বলেছি—অর্থাৎ কবির আবৃত্তির সঙ্গে নাটকের মূকাভিনয়। পরে (১৩৩৮ সাল) "রাজা"র ঐ কাহিনীরই ছায়াবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের "শাপমোচন" নাটিকাটিও রচিত হয় এবং সে ক্ষেত্রেও অবলম্বিত হয় পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিটি। এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার দরকার।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে বরাবরই দেখা গিয়েছে, উপন্যাসে, গল্পে, কবিতায়, নাটকে—এমন কি গানেও তিনি একটিমাত্র বাঁধাধরা অভ্যস্ত পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থেকে তুষ্ট হ'তে পারতেন না। তাঁর লেখা "বউঠাকুরাণীর হাট", "চোখের বালি" ও "শেষের কবিতা" উপন্যাস তিনখানি দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, যেন তিনজন লেখক পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঐগুলি রচনা করেছেন। তাঁর গোড়ার দিকে ও শেষের দিকে লেখা গল্পগুলিও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে লিখিত। কবিতাকে তিনি যে কত নূতন নূতন দিক থেকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন, এখানে তা নিয়ে আলোচনা অসম্ভব ও অবান্তর। নাটক-রচনার ও নাট্যাভিনয়ের সময়েও তাঁর চিত্ত সতত অন্বেষণ করত অভিনব আদর্শ ও প্রকাশ-ভঙ্গি। এমন কি গদ্যছন্দে গান রচনা করতেও তিনি বাকি রাখেন নি। জানি না এমনভাবে বৈচিত্র্যের সাধনা আর কোন কবি ও শিল্পী করতে পেরেছেন কি না। ললিত-কলার জগতে রবীন্দ্রনাথ অবলম্বন করেছিলেন প্রজাপতিরীতি—একরকম ফুলে তাঁর মন উঠত না, মধুচয়ন করতে তিনি ভালোবাসতেন ফুলে ফুলে গুনগুনিয়ে। এ আমাদের মনগড়া কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলছেন—"নানা কিছুকেই নিয়ে আছি—নানাভাবেই নানা দিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ঔৎসুক্য।" আর এক জায়গায় তিনি চমৎকার আত্মপরিচয় দিয়েছেন—"আমি বিচিত্রের দূত"।

নাট্যকার নিজের রচনা আবৃত্তি করছেন এবং সেই অনুসারে তার সঙ্গে ভাবাভিনয় ক'রে যাচ্ছেন নির্ব্বাক কুশীলবগণ, এমন ব্যাপার আমাদের দেশে একেবারেই নূতন। এখানে ভারতীয় নাট্যকলার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান আছে কি না বলতে পারি না, কিন্তু যতদূর জানি, ভারতীয়—এবং হয়তো বা প্রাচ্য-নাট্যজগতে এ ধরনের নাট্যানুষ্ঠান অভূতপূর্ব্ব। আমাদের প্রাচীন নৃত্যে দেখেছি, নর্ত্তক যখন নাচে তখন ভাষণের ভার নেয় গায়ক এবং এইভাবে পরস্পরের সাহায্যকারী দুটি আর্টকে একসঙ্গে উপভোগ করবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনকালে সংস্কৃত নাট্যানুষ্ঠানেও আবৃত্তিকারী ও অভিনয়কারী আপন আপন বিভাগে থেকে ভাবাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করবার চেষ্টা কি করতেন? কোন বিশেষজ্ঞের মুখে এ প্রশ্নের উত্তর পেলে উপকৃত হব।

কেবল সাধারণ ভাবাভিনয় নয়, শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানে আমরা আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ও দেখবার সুযোগ পেয়েছি, সেও একটা নতুন ব্যাপার এবং সেখানেও আবৃত্তির ভার গ্রহণ করেছেন স্বয়ং কবিবর। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রাচীন নৃত্য বা লোকনৃত্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং নানা কারণে এখানকার সেকেলে ও একেলে নৃত্যকলার সঙ্গে আছে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথের আসর ছাড়া আর কোথাও নৃত্য দেখবার সময়ে কবিতার আবৃত্তি শ্রবণ করিই নি। এদেশে বসে নানা শ্রেণীর বহু পাশ্চাত্ত্য নৃত্য দেখেছি এবং সেই সম্পর্কে বড় অল্প পুঁথিপত্রও পাঠ করি নি। কিন্তু কবির আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে আবার কাব্যার্থবোধক নৃত্যের লীলা চলতে পারে, এটা ছিল আমার কাছে অশ্রুতপূর্ব্ব কথা। অথচ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। নাচের প্রাণ তাল এবং কবিতার প্রাণ ছন্দ। তাল ও ছন্দ অভিন্ন—ছন্দঃপাত বলতেই বোঝায় তালভঙ্গ, কবিতা বা নাচের পক্ষে যা সমান নিন্দনীয়। কবিতা রচনার সময়ে যেমন ছন্দ রক্ষা করে চলতে হয়, কবিতা আবৃত্তির সময়েও ঠিক তাই না করলে চলে না। সুতরাং কাব্যের ছন্দ ও মাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে নৃত্য রচনা করলে সেটা মোটেই অসঙ্গত হবে না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কাছে সাধারণতঃ ধরা পড়ে না ব'লে সাধারণ ব্যাপারকেও অসাধারণ ব'লে মনে হয়। এইখানে সত্যদ্রষ্টা শিল্পী খুলে দেন আমাদের দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের আসরে আবৃত্তির সঙ্গে নাচ দেখে পরে আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি অল্প ভাবেও পরীক্ষা করতে ছাড়ি নি। ফলে

দেখা গিয়েছে, যে সব গীতিকার গানে কবিতার ছন্দ বজায় রাখেন, হুবহু তাঁদের ছন্দানুসারে নৃত্য রচনা করলেও সে-সব নাচের সময়ে তবলার তাল মোটেই কেটে যায় না।

ঠাকুরবাড়ীর অধুনালুপ্ত "বিচিত্রা" সভার এক অধিবেশনে একদিন সদ্য ইউরোপ প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ বললেন—এবারে বিলাতে গিয়ে তিনি একটি নূতন ব্যাপার দেখে এসেছেন। ব্যাপারটি হচ্ছে কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগিতা। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবিতারই মধ্যে থাকে সঙ্গীতের ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথও নিজে অনেক কবিতাকে সুর বসিয়ে গানের মত ব্যবহার করেছেন। এবং সকলেই জানেন, আবৃত্তির মধ্যেও থাকে সঙ্গীতাংশ। এবং কবিতা আবৃত্তির সময়েও যে যন্ত্রসঙ্গীতের যথাযথ ব্যবহার তাকে অধিকতর শ্রুতিমধুর ও ভাবাবিরাম ক'রে তোলে, রবীন্দ্রনাথের একটি অনুষ্ঠানে সে প্রমাণও পাওয়া গেল।

আবৃত্তির সঙ্গে মূকাভিনয়, নৃত্যাভিনয় ও যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগিতা যে উপভোগ্য, কথাটা বোঝা গেল। কিন্তু এ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে আবৃত্তিকারীর শক্তির উপরেই। যে-কোন কবিকে এসব আসরের মাঝখানে আবৃত্তি করবার জন্যে ছেড়ে দিলে অসময়ে সভাভঙ্গ হবারই সম্ভাবনা। আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রখ্যাত কবির আবৃত্তি শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু দুই-একজন ছাড়া তাঁদের কারুর আবৃত্তিই উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে হয় নি। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ কেবল অতুলনীয় ছিলেন না, উপরন্তু তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং মূকাভিনয়, নৃত্যাভিনয় ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারত তাঁর আবৃত্তিই। এই যে আমাদের সাধারণ নাট্যশালা, আবৃত্তি হচ্ছে যেখানকার শিল্পীদের সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ, সেখানেও পূর্ব্বোক্ত আসরে আসীন হবার যোগ্যতা আছে একমাত্র শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীরই।

"রাজা"র পর রবীন্দ্রনাথের লেখনী নিযুক্ত হয়েছিল নাটকের পর নাটক রচনায়। তার প্রমাণ "অচলায়তন", "ডাকঘর", "ফাল্গুনী", "মুক্তধারা", "গৃহপ্রবেশ", "শোধ-বোধ" ও "রক্তকরবী" প্রভৃতি। অধিকাংশই প্রতীকনাট্য, কবি-নাট্যকারের ভাবুক চিত্ত তখন যেন দর্শনসাধ্য প্রকৃতির ভিতর থেকে তার আন্তরিক গুপ্তকথাটি আবিষ্কার করবার জন্য অত্যধিক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর সাধারণ দৃষ্টি দেখে যা বোঝে, কবির অসাধারণ দৃষ্টি তার পিছনে দেখতে পায় অন্য কোন গভীরতর অর্থ।

"রাজা" নাটক এ শ্রেণীর প্রতীককে অনভ্যস্ত বাঙালী পাঠকদের বিস্মিত করেছিল, কিন্তু তাঁর পরের নাটক "অচলায়তন"ও (১৩১৮ সাল) প্রতীক ব্যবহৃত হ'লেও তার সূক্ষ্মতা ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প, তাই তার রচনাও হয়েছিল অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। মনে আছে, এই লেখাটি যখন "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন একশ্রেণীর লোক এর বিরুদ্ধে প্রচুর উষ্মা প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে একাধিক ধর্ম্মধ্বজীও ছিলেন। তাঁরা অভিযোগ তুললেন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের আঘাত করেছেন। এতদিন পরে সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনা ক'রে লাভ নেই। এখানে কেবল এইটুকুই উল্লেখ্য, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে এই নাটকের নাম হয় "গুরু" এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তা শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়। এর মহলার সময়ে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলেও নিজে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।

ঐ ১৩১৮ সালেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর অন্যতম পৃথিবীবিখ্যাত নাটক "ডাকঘর"। এই নাটকের জন্মকাহিনী রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রকাশ করেছেন: "হঠাৎ কি হল। রাত দুটো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। ·········কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত, অথচ চঞ্চল তাকে কোন রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয় আখ্যায়িকা।"

আলঙ্কারিকরা রীতিমত মাথা ঘামিয়ে, আগে থাকতে মাপজোখ করে ও আটঘাট বেঁধে নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতির সংজ্ঞা স্থির করেন। কিন্তু সত্যকার কলাবিদ্ তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য নন। স্মরণ হচ্ছে, ফরাসী কথাসাহিত্যিক মোপাসাঁ তাঁর একখানি উপন্যাসের ভূমিকায় এই সত্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বাংলাদেশে গত যুগের নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে আমরা প্রাচীনপন্থী বলে জানি। কিন্তু তিনিও বলেছিলেন: "আমার নূতন ভাবে নাটক লেখবার ইচ্ছা হয়েছে। সাধারণতঃ গল্পের প্লটে এই দাঁড়ায়,—অমুকের সঙ্গে অমুকের love হল—অমুকের জন্ত অমুকে মরেন—তিনি হয়তো ফিরে তাকান না—নায়িকা হয়তো বিপদে পড়লেন, নায়ক এসে উদ্ধার করলেন—এই তো সব স্থূল ঘটনা। ······যে জিনিসটা সবাই তুচ্ছ করে উদাসীন থাকে—ভাবে যা সাহিত্যের (নাটকের ?) জন্যে নয়, সাহিত্যের বীজ

অনেক সময়ে তারই ভিতরে থাকে। সাহিত্য মানে অনেকে ভাবেন, নায়ক নায়িকার প্রণয় কিংবা স্থূল জগতের যে-কোনও বৈচিত্র্যময় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ জীবন, —তা নয়।······কাব্য বা সাহিত্য রসাত্মক বাক্য বা ভাবের ব্যঞ্জনা।" এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আলঙ্কারিকের মতের কথাই উল্লেখ করেছেন, "ডাকঘর" যে নাটক হয়নি, নিজে এমন মত প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেছেন বটে, "এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক," কিন্তু গদ্য লিরিকের নাটক হতে বাধে না, এবং আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যে গল্প নেই এমন সব রচনাও নাটক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ নিজে "ডাকঘর"কে নাটক বলেই মনে করতেন।

এর আগে আমরা "প্যানসাইকি" বা আত্মাশ্রয়ী নাটকের সমর্থক এবং প্রতীক-নাট্যপ্রণেতা লিওনিড আন্দ্রীভের কথা তুলেছি। "Andreyeff asserts that he does not in the least mean that events have ceased to occur that people have ceased to act, or that history has ceased its forward movement. The chronicle of current events is still sufficiently replete with suicides, strife, and war, but all these events in their outward aspects have fallen in dramatic value. Life has become more psychological. In the place of the older passions and the traditional heroes of the drama, love and hunger, there has arisen a new protagonist, the intellect. Not love, nor hunger, nor ambition, but thought in its sufferings, joys, and struggles, is the true hero of the life of to-day. To it therefore is due the first place in the drama. Indeed, Andreyeff has gone so far as to entitle his last drama "Thought".

এই আলোচনায় বাংলার গিরিশচন্দ্র এবং রুশিয়ার আন্দ্রীভের মতবাদ আগেও উদ্ধার করেছি, এবারেও করলুম। পাঠকরা লক্ষ্য করলে দেখবেন, আধুনিক নাটক সম্বন্ধে ওঁদের দুজনের মধ্যে কিছুমাত্র মতের অনৈক্য নেই—অথচ ওঁরা কেউ কারুর নাম বা রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। বেলজিয়ামের মেটারলিঙ্কও ছিলেন একই মতাবলম্বী। ওঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, বাইরের স্থূল ঘটনাকে প্রধান্য না দিয়ে আধুনিক নাটক রচনা করা চলে। আন্দ্রীভ "Thought" বা মনন বা চিন্তন নাম দিয়ে নাটক

লিখেছেন। সুতরাং গল্পত্ব অল্প বলে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর"ও নাটকের মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ "ডাকঘর" রচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে। সেখানকার সুরসিক শ্রোতারাই সর্ব্বপ্রথমে কবির মুখ থেকে শোনবার সুযোগ পান নাটকখানির পাঠ। কিন্তু কেবল তাইতেই কবির মন উঠল না। এই রচনাটি শেষ ক'রে নিশ্চয়ই তিনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, কারণ এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল তাঁরই আত্মার কোন বিশেষ অনুভূতি। কলকাতায় তাঁর অনুগত ও শিষ্যস্থানীয় যে কয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক থাকতেন, তাঁদের কাছে নিজের আত্মার এই কাহিনী না শুনিয়ে বোধ করি তাঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না; অতএব কলকাতায় এসে তিনি আমন্ত্রণ করলেন "ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকগণকে। একদিন কবির বাসভবনে বসল "ডাকঘর" পাঠের আসর। তাঁর ভাবদ্যোতক অপূর্ব্ব কণ্ঠে এই "গদ্য লিরিক" শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কারণ আমি ছিলুম তখন কলকাতার বাইরে।

"ডাকঘর" পাঠ করে একজন প্রবীণ সাহিত্যিক লিখেছেন :—"এটিও প্রতীকী নাটক। বদ্ধ জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার ডাক পৌঁছিলে তাহার সকল বন্ধন খুলিয়া যায়। বালক অমল জীবাত্মার প্রতীক। মাধব কবিরাজ, মোড়ল নিজ নিজ সংস্কার-রূপী বাধার প্রতীক। ঠাকুরদা, দইওয়ালা, প্রহরী, ডাকহরকরা, সুধা, ক্রীড়াশীল ছেলের দল—প্রকৃতির সরল বিশ্বাসী সন্তানদের প্রতীক। ডাকঘর পরমাত্মার নির্দ্দেশ দিবার স্থানের প্রতীক। কবি নাট্যকারের মনে যে আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল "ডাকঘর" নাটকখানি তাহারি একটি লহরী।"

একই প্রতীক এক-একজনের মনের উপর বিভিন্ন ভাবের দিক দিয়ে কাজ করতে পারে। "ডাকঘরে"র ভিতর থেকে কেউ অন্য কোন অর্থ আবিষ্কার করলেও বিস্মিত হবার কারণ নেই। এখানে ছোট একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। ধরুন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "সোনার তরী" কবিতা। এক সময়ে তাকে নিয়ে ঘোরতর বাদানুবাদের ফলে মাসিক সাহিত্যের আসর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথম অনর্থ-পাতের সূত্রপাত হ'ল কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের কথায়। তিনি বললেন, ঐ কবিতাটি অর্থহীন। প্রতিবাদ করলেন "সোনার তরী"র একাধিক ভক্ত, তাঁরা ওর মধ্যে আবিষ্কার করলেন একাধিক অর্থ। বেশ বোঝা গেল,—"সোনার তরী" কোন কিছুর প্রতীক হোক বা না হোক, বিভিন্ন পাঠক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার মধ্যে

বিভিন্ন অর্থ দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সেইখানেই তো কবির শ্রম সার্থক।

এখানে আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমি যখন "ডাকঘর" পাঠ করি, তখন জীবাত্মা বা পরমাত্মার কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি বা টের পাবার চেষ্টাও করিনি। আমাকে আনন্দে বিভোর করেছিল তার অনুপম "গদ্য লিরিক"। তারই রস পেয়ে মন হয়েছিল খুশী। গীতিকাব্যের মধ্যে অরূপও যদি রূপ পায়, ভাবুক পাঠকের কাছে তা ধারণাতীত হয় না। কিন্তু "ডাকঘরে"র রচয়িতা তাকে দিয়েছেন নাটকের আকার। মঞ্চস্থ করলে অরূপকে নিয়ে নাট্যকার মুস্কিলে পড়তে পারেন, কারণ নাটকের সংস্কৃত নাম হচ্ছে 'দৃশ্যকাব্য'—অর্থাৎ যে কাব্য দ্রষ্টব্য। কাজেই মনে সন্দেহ জাগল, মঞ্চের উপরে "ডাকঘরে"র সার্থকতা হবে কতখানি? তারপরেই লোকপরম্পরায় শোনা গেল,—বিলাতে ইংরেজীতে অনূদিত "ডাকঘর" মঞ্চস্থ হয়ে প্রেক্ষকদের প্রশস্তি লাভ করেছে। কিন্তু তখনও ভাবলুম, বিলাত হচ্ছে অভিনয়ের দেশ, সেখানকার সেরা নটনটীরা ইংরেজী ভাষায় যেমন ক'রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ফোটাতে পারে, বাংলা ভাষায় তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারগ নটনটীর অভিজ্ঞতা আছে কি? কিছুকাল পরেই পাওয়া গেল এই প্রশ্নের উত্তর।

করিতকর্ম্মা সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে রবীন্দ্রভবনে প্রতিষ্ঠিত "বিচিত্রা" বৈঠকের তখন খুবই বাড়বাড়ন্ত। নিয়মিতভাবে সেখানে হয় প্রথম শ্রেণীর প্রখ্যাত গুণীদের নিয়ে বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন—কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ, নৃত্যগীতবাদ্য বা যাত্রা ও মঞ্চাভিনয় বা ললিতকলা সম্পর্কীয় বৈঠকী আলাপ আলোচনা প্রভৃতি। আসরে উপস্থিত থাকেন দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদগ্ধ-মণ্ডলী। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সেইখানেই মঞ্চস্থ হ'ল "ডাকঘর"। শিল্পীদের অধিকাংশই ছিলেন ঠাকুর-পরিবারভুক্ত ব্যক্তি। অভিনয় হয় দুই দিন। প্রথম দিনের প্রেক্ষক ছিলেন "বিচিত্রা"র সদস্যগণ এবং দ্বিতীয় দিনে আমন্ত্রিত হন মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য ও আনি বেশান্ত প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। প্রধান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রবীন্দ্রনাথ (ঠাকুরদা), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মাধব), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মোড়ল), অসিতকুমার হালদার (দইওয়ালা) ও আশামুকুল দাশ (অমল) ছোট্ট মেয়ে সুধার ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরূপা দেবী।

"বিচিত্রা"র দ্বিতলের হলঘরের পশ্চিম প্রান্তে বাঁধা হয়েছিল একরত্তি একটি মঞ্চ,

কিন্তু আকারে ছোট হলে কি হয়,—রুচি, সৌন্দর্য্য, কাব্যশ্রী, দৃশ্যসংস্থান ও পরিকল্পনার দিক দিয়ে তা বড় বড় সাধারণ রঙ্গালয়ের বহুবিজ্ঞাপিত মঞ্চশিল্পকে অনায়াসেই লজ্জা দিতে পারত—এতটুকু জায়গায় এমন আয়োজন যে করা যায়, এটা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। অভিনয়ের চমৎকারিতাও ভাষায় বর্ণনাতীত। আজও তা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে মনের মাঝখানে। বিভিন্ন ভূমিকায় প্রত্যেকেই অভিনয় ক'রে গেলেন শ্রেষ্ঠ গুণীর হাতে সমস্বরে বাঁধা বীণার বিভিন্ন তারের মত। বালক আশামুকুল, তিনিও দক্ষতার পরিচয় দিলেন পরিপক্ক শিল্পীর মত। আশ্চর্য্যান্বিত হলুম বটে, কিন্তু বুঝতে পারলুম, বাঙলা দেশেও "ডাকঘরের" অভিনয় হওয়া সম্ভবপর।

বাল্যকাল থেকে লোকের মুখে মুখে শুনে আসছি রবীন্দ্রনাথের অভিনয়খ্যাতির কথা। কিন্তু অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে যখন সর্ব্বপ্রথমে ১৩২২ সালে "ফাল্গুনী" নাট্যাভিনয়ের অন্ধ বাউলের ভূমিকায় দেখি, তখন আমি যৌবনের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। তারপর "ডাকঘর" পালায় দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখলুম আর এক শ্রেণীর ভূমিকায়। এই দুটি ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-বৈচিত্র্য দেখে তিনি যে কত বড় শিল্পী তা বুঝতে আর বিলম্ব হ'ল না। অন্ধ বাউল রূপে অভিনয়ের ছন্দ জেগেছিল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে কিন্তু ঠাকুরদা রূপে তিনি নির্ভর করেছিলেন প্রধানতঃ নিজের মৌখিক ভাব ও কণ্ঠস্বরের উপরে এবং একমাত্র কণ্ঠের সাহায্যেই তিনি যে তাবৎ নাটকীয় ক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে পারেন, সে কথাও আমি উপলব্ধি করলুম।

বলা হয়েছে, "ডাকঘরে"র (১৩২৪ সাল) আগেই আমি দেখেছিলুম "ফাল্গুনী"র (১৩২২ সাল) অভিনয়। দেখা যাক্, যে-সময়ে এই দুইখানি নাটক অভিনীত হয়েছিল সে-সময়ে বাঙলাদেশের সাধারণ নাট্যজগতের অবস্থা ছিল কি রকম। পেশাদার হয়ে বাংলা থিয়েটারের প্রকৃতি যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় বটে, কিন্তু আমাদের সৌখীন নাট্যশালাকে দেখতে হবে তার সূতিকাগৃহেরই মত, কারণ গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত সে এখান থেকেই অধিকাংশ শিল্পী সংগ্রহ করে আসছে।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল বসুই যে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রধান ত্রিমূর্ত্তি ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে অমৃতলাল অভিনয়ের দিক দিয়ে সমকক্ষতার দাবি করতে পারতেন না, অমৃতলাল মিত্রও (এবং আরো কেউ কেউ) ছিলেন তাঁর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর নট; কিন্তু অন্যান্য নানা দিক দিয়ে বাঙলা রঙ্গালয়ের উপরে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-অমৃত, এই ত্রয়ীর পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় সাধারণ বাঙলা রঙ্গালয় একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর

মধ্যে থেকে নিজের উপযোগী একটি আদর্শ স্থির করে নিয়েছিল। সৌখীন নাট্যশালা থেকে তার জন্ম হলেও সেখানকার অনেক বিধানই সে মানতে পারত না, কারণ নাট্যকলাচর্চ্চা ছিল তার পেশা, তাই জনসাধারণের মুখ তাকিয়ে তাকে চলতে হত প্রতি পদেই—প্রমাণ, গিরিশচন্দ্রের নিজের উক্তি : "ব্যবসায় কৃতকার্য্য না হলে আমার হাত-পা বাঁধা।" গত যুগের পেশাদার থিয়েটারের পূর্ণ-পরিণতির সময়ে এখানকার সৌখীন নাট্যশালার বিশেষ কোন প্রভাব তার উপরে ছিল বলেও মনে হয় না। মাঝে প্রায় এক যুগ ধরে সহরের সৌখীন সম্প্রদায়গুলির উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল প্রখ্যাত "নাট্য সমাজ"। কিন্তু আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের উপরে সে কোন দাগই কাটতে পারেনি। সাধারণ রঙ্গালয়ের কৃতী ও রসজ্ঞ পরিচালকরা যে উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর নাট্যকলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এটা হচ্ছে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু তাঁদের ছিল 'হাত-পা বাঁধা'। তবু ঐ অবস্থার মধ্যে থেকেই গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-অমৃত সাধারণ রঙ্গালয়কে যতটা সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কয়েকবার সেখানে এমন চমৎকার অভিনয় দেখেছি, মনকে তা চিরদিনই ভাস্বর করে রাখবে আগ্নেয় স্মৃতির মত।

অর্দ্ধেন্দুশেখর পরলোকে গমন করেন ১৩১৫ সালে। সেযুগের অন্যতম প্রধান অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র মারা যান আরো কিছুকাল আগে। রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটকে কুমার সেনের ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় করে "ট্রাজেডিয়ান" নামে অভিহিত মহেন্দ্রলাল বসু গিরিশ-যুগের আর একজন প্রথম শ্রেণীর নায়ক-নট ছিলেন, তিনিও পরলোকগত হন অর্দ্ধেন্দুর পূর্ব্বে (১৩০৯ সালে)। অবশেষে ১৩১৮ সালে মধ্যমণি গিরিশচন্দ্র যখন দেহরক্ষা করলেন, তখন শিবরাত্রির সলিতার মতন প্রধানদের মধ্যে বর্ত্তমান রইলেন একমাত্র অমৃতলাল বসুই। কিন্তু তিনি একাধিপত্য করতে পারেন নি, কারণ তখন তাঁর প্রতিভা শ্রান্ত, শক্তি নিস্তেজ ও দেহ জরাজর্জ্জর। দানীবাবুর নাম তখন ডাকসাইটে, কারণ গিরিশোত্তর যুগে তিনিই অধিকার করে-ছিলেন প্রধান অভিনেতার গদী। কিন্তু দানীবাবু ছিলেন বিদ্যা ও মনীষা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, পিতা গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার দৌলতে পুরাতন ভূমিকাগুলি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন বটে, কিন্তু নাট্য-পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর কোন যোগ্যতাই ছিল না। ফলে গিরিশোত্তর যুগের নায়কহীন সাধারণ রঙ্গালয় নিশ্চিতভাবে নেমে যেতে লাগল ধাপে ধাপে অধঃপতনের অতলে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের এই অরাজকতার যুগেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে মঞ্চস্থ হয়

"ফাল্গুনী" (ও "ডাকঘর") নাটক। ইংরেজীতে যাদের "ফিলিষ্টাইন" বলে এবং সংস্কৃতে বলে "অর্ব্বাচীন" বা অপক্ক বুদ্ধি, সাধারণ রঙ্গালয়ের অধিকাংশ দর্শক ছিল সেই শ্রেণীর। "ফাল্গুনী বা "ডাকঘরে"র মতন নাটক বোঝবার বুদ্ধি তাদের ছিল না এবং ছিল না তখনকার সাধারণ নাট্যশালার পরিচালকদেরও। উপরোক্ত দুই নাটকের জন্যে যে অপূর্ব্ব ও বিচিত্র মঞ্চশিল্প ব্যবহার করা হয়, আমাদের সাধারণ নাট্যজগতে তারও সমঝদারের অভাব ছিল। "রবীন্দ্রজীবনী"-কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "ফাল্গুনীর ষ্টেজ সজ্জা পরযুগে বাংলাদেশের ষ্টেজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস-লেখকদের বিশেষ গবেষণার বিষয় হইবে।" কিন্তু এক্ষেত্রে গবেষণার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ প্রথমতঃ, "ফাল্গুনী" (ও "ডাকঘরে"র) মঞ্চশিল্প ছিল গিরিশোত্তর যুগের সাধারণ রঙ্গালয়ের ধারণার বাইরে ; দ্বিতীয়তঃ, ওখানকার কেষ্টো-বিষ্টুদের কারুকেই আমি ঐ দুটি নাট্যাভিনয়ের আসরে উপস্থিত থাকতে দেখিনি। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, নাটকীয় দৃশ্যপরিকল্পনার ক্ষেত্রে ঠাকুর-বাড়ীর শিল্পীরা যখন রীতিমত যুগান্তর আনয়ন করেন, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের মাথাওয়ালা ব্যক্তিগণ তখন অপরিসর টিকিট-ঘরের কোণে ব'সে জমা-খরচের হিসাব নিয়ে মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন। হিসাবের খাতা ছাড়া আর কোন দিকে দৃক্‌পাত করা তাঁরা দরকার মনে করতেন না।

হ্যাঁ, ঐ হিসাবের খাতাই হচ্ছে যত অনর্থের মূল। সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ নাটক যাচাই করতেন জমা-খরচের ঘরের দিকে তাকিয়ে। তাই সৌখীন নাট্যজগতে যখন "ফাল্গুনী"ও "ডাকঘর" প্রভৃতি নাটক করে নূতন যুগের সূচনা, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়গুলি তখন "কণ্ঠহার", "মোগল পাঠান", "কিন্নরী" ও "দেবলাদেবী" প্রভৃতি পালা মঞ্চস্থ ক'রে দর্শকদের পকেটের ভার হালকা ক'রে আসছে বিপুল আনন্দে। আজ সেখানে আসনাসীন হয়েছে সেই সব দর্শকেরই সুযোগ্য বংশধরগণ, এবং আজও তারা ঐ শ্রেণীর নাট্যাভিনয় দেখে করতালি-ধ্বনিতে প্রেক্ষাগারকে মুখরিত ক'রে তোলে। দেখে মনে হয়, যেন এখানে স্তম্ভিত হয়ে আছে কালচক্রের গতি। সেকালেও যা, একালেও তাই। বায়ু পরিবর্ত্তন বা আধুনিকতার হাওয়া এখানে অসহনীয়। "অচলায়তনে"র বিভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আর কি। রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" এবং "বউ-ঠাকুরাণীর হাটে"র নাট্যরূপ সেকালেও এখানে সহনীয় হয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে ছিল অতীতেরই ঐতিহ্য।

গিরিশোত্তর যুগের ধর্ম্ম কতকটা বদলে গেছে বটে সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশির-

কুমারের আবির্ভাবের পরে। এর প্রধান কারণ, বর্ত্তমান যুগের নেতা হচ্ছেন তিনিই এবং তিনি হচ্ছেন একান্ত ভাবেই রবীন্দ্রভক্ত (যে কোন বিদগ্ধ ব্যক্তি যা হ'তে বাধ্য), তাঁর মঞ্চ-ভাষণেও রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বিশেষত্ব আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। শিশিরকুমারের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আরো বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি (তাঁদেরও অনেকে তাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্য) সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেছেন, ফলে থিয়েটারী অচলায়তনের মধ্যেও কিছু কিছু নবযুগের হাওয়া আমাদের গায়ে এসে লাগে। পেশাদার হয়েও মাঝে মাঝে তাঁরা হিসাবের খাতা মুড়ে রেখে "গৃহপ্রবেশ" ও "তপতী" প্রভৃতি নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হন এবং প্রমাণিত করেন, রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মতর শ্রেণীর নাটক রূপায়িত করবার শক্তি ও সাধ্য তাঁদের আছে। কিন্তু সে সব হয়েছে বেনাবনে মুক্তা ছড়ানোর মত। কারণ দর্শকরা আজও সাবালক হ'লেন না। প্রথম ভাগ সাঙ্গ করবার আগেই তাদের যেন পড়তে দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় ভাগ। কাদের দোষে এটা হ'ল, এখানে তা নিয়ে আলোচনা করবার জায়গা নেই। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, দিল্লী এখনো বহু দূরে।

১৩২১ সালের "সবুজপত্রে"র চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" নাটিকা প্রকাশিত হয়। "সবুজপত্রে"র আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণেও এনে দিয়েছিল যেন নূতন এক প্রেরণা। তাঁর বহুধা বিভক্ত প্রতিভার মোড় ফিরে গিয়েছিল নূতন ক'রে বিভিন্ন দিকে। সেই সময়েই তিনি নিজের গদ্য রচনায় বিশেষ ক'রে কথ্য ভাষাকে দেন যথার্থ সম্মানের আসন। গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে নব নব রূপ নিয়ে চলে তাঁর লেখনীর লীলা। তাঁর কথাসাহিত্যেও দেখা যায় অভিনব পরিকল্পনা। পরিণত বয়সেও কবির চিত্তে যেন জাগ্রত হয় পূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বাস। বহুকাল আগেই কবিদের এই অজর যৌবনের কথা নিজের কবিতায় তিনি প্রকাশ ক'রেছেন।

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে এত নজর কেন ?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক-বয়সী জেনো !"

অন্যত্র তিনি বলেছেন :

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমারে দেখো না বাহিরে।

আমারে দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।"

প্রাচীন বয়সেও তাই তিনি "সবুজপত্রে"র যাত্রারম্ভের সুরটি ধ'রে দিলেন তাজা যৌবনের জয়গান গেয়েই। "ফাল্গুনী"র মধ্যে সর্ব্বত্র স্পন্দিত হয়ে উঠেছে ঐ যৌবনেরই জয়যাত্রার ছন্দ ও আনন্দ। "ফাল্গুনী"র মত নাটক ভারতীয় ভাষায় আর রচিত হয়নি এবং পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাতেও আছে ব'লে জানি না। জনৈক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে "Eastern equivalent of Maeterlinck" ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু "ফাল্গুনী"র মধ্যে মেটারলিঙ্ককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় ব'লে মনে করি না।

মেটারলিঙ্ক প্রতীক-নাট্যকার এবং "ফাল্গুনী"র মধ্যেও আছে বটে প্রতীকের প্রভাব। কিন্তু মেটারলিঙ্ক তো নাট্যসাহিত্যে প্রতীকের প্রবর্ত্তক নন—তিনি বিশেষ-ভাবে প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, এইমাত্র বলা যেতে পারে। পৃথিবীর সব ভাষা তো আমার নখদর্পণে নেই, সুতরাং তা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু বাংলা ভাষাতেই দেখি, মেটারলিঙ্কের আগেই আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একাধিক প্রতীক-নাট্য ("স্বপ্নের ফুল" ও "দেলদার" প্রভৃতি) রচনা করেছেন। সাহিত্যে প্রতীকের প্রচলন হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই, সুতরাং "ফাল্গুনী"তে ব্যবহৃত প্রতীকের মূল খোঁজবার জন্যে মেটারলিঙ্কের কাছে ধরণা দেবার দরকার নেই।

এবং "ফাল্গুনী"র প্রতীক হচ্ছে অত্যন্ত সহজবোধ্য, নাটিকা পাঠ করবার সময়ে যে কোন সাধারণ পাঠক অনায়াসেই তা উপলব্ধি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সঙ্কোচ বোধ হয়। ...Facts-এর দিকে দেখি জরা, মৃত্যু, truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন, যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্ত্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেউলে মনে হল সেই মুহূর্ত্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন।" কিন্তু এমন বিশদ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন ছিল না কারণ প্রেক্ষাগৃহে ব'সে প্রেক্ষকরাও সেই একই বাণী শুনতে পান—"ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ

করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।" —"বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা! বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।"

"ফাল্গুনী"র প্রতীককে অতি-সাধারণ বললেও অন্যায় বলা বা অত্যুক্তি করা হবে না। আমাদের সংস্কৃত কাব্যে বা নাট্যেও অল্পবিস্তর পরিমাণে এই শ্রেণীর প্রতীক দুর্লভ নয়। অনন্যসাধারণ প্রতিভার ছোঁয়া পেলে অতি-সাধারণ প্রতীকও যে অতি-অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, "ফাল্গুনী" হচ্ছে তারই একটি ভাস্বর নিদর্শন। বৎসরে বৎসরে চিরকালই মানুষের চোখের সামনে ঘূর্ণ্যমান ঋতুচক্রে শীতের পরে আসে বসন্ত, শুকনো পাতা-ঝরার পর হয় স্নিগ্ধ ও তরুণ পত্রোদ্‌গম, পাণ্ডুর শ্রীহীনতা ভেদ ক'রে জাগে বর্ণাঢ্য ইন্দ্রধনুর বিচিত্র ছন্দ—এ যেন বিবর্ণ মৃত্যুর ভিতর থেকে নবীন জীবনের জন্ম, নিসাড় বার্দ্ধক্যের মধ্য থেকে মুখর যৌবনের আত্মপ্রকাশ, কঙ্কালসার বনস্পতির প্রাণ থেকে স্ফূর্ত্ত পত্রমর্ম্মরের নূতন সঙ্গীত। যুগে যুগে কত কবিরই চোখ দেখেছে এই সব সাধারণ দৃশ্য এবং থেকে থেকে রূপক প্রভৃতির সাহায্যে মৃত্যুর কোলে এই নবজীবনের জাগরণের ভাব নিয়ে কবিতা রচনার চেষ্টাও যে হয়নি, এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু ১৩২১ সালের পূর্ব্বে "ফাল্গুনী"র সমগোত্রীয় আর কোন রচনা কেউ পাঠ করে নি। সহজকেও আরো সহজ ক'রে তোলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ "বৈরাগ্য সাধন" নামে আর একটি নাটকিত রচনা মুখবন্ধের মত "ফাল্গুনী"র সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এক দিক দিয়ে তারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আর এক দিক দিয়ে দেখি, "ফাল্গুনী" নাট্যাভিনয়ের দিনে তারই দৌলতে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে আমরা আর এক অভিনব রূপে লাভ করবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি।

পৃথিবীর সব দেশেই দেখি, কবিরা চিরকালই বহিঃপ্রকৃতির অনুরাগী। বিলাত হচ্ছে শীতপ্রধান দেশ, সেখানে ভারতবর্ষের মত ষড়্‌ঋতুর মহাসমারোহ নেই, কিন্তু সেখানেও পাওয়া যায় প্রকৃতিপ্রেমিক শত শত কবি এবং বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির যোগসাধন ক'রে সেখানেও রচিত হয়েছে কবিতার পর কবিতা। সুতরাং ভারতবর্ষের কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় যা দেখি, পৃথিবীর আর কোন কবির শব্দচিত্রশালায় প্রকৃতি এত ভাবে, এত রসে, এত রূপে ছন্দবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে ব'লে মনে হয় না। "ফাল্গুনী" হচ্ছে একান্তভাবেই প্রকৃতির অপূর্ব্ব স্তোত্র। রবীন্দ্রনাথ তাকে এক কথায় নাটক ব'লে পরিচিত করেছেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে কুশীলবের কথোপকথনের চেয়ে ঢের বেশী প্রধান হয়ে উঠেছে

সঙ্গীতাংশই এবং ঐ সঙ্গীতাংশের মধ্যে যত্র-তত্র পাওয়া যাবে প্রকৃতিরই নিজস্ব রূপকথা এবং আলোছায়ার ছন্দ! "ফাল্গুনী"কে অনায়াসেই প্রাকৃতিক গীতিনাট্য ব'লে গ্রহণ করা চলে।

এ-সভায় ও-সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখে আসছি বালকবয়স থেকেই। কখনো তিনি প্রবন্ধ প'ড়ে শোনান এবং কখনো বা করেন কবিতাপাঠ। বিশেষ ক'রে টাউন হলের একটি মহাসভায় শিবাজী উৎসবে তিনি যে স্বরচিত দীর্ঘ কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, তার কথা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে কি উদাত্ত ও ভাবাপ্লুত কণ্ঠস্বর, অতবড় সভাগৃহকে আচ্ছন্ন ও বিপুল জনতাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে দিলে। তখনও নাটকের কোন ভূমিকায় অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বর যদি নটের প্রধান অবলম্বন হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরকে অতুলনীয় ব'লে স্বীকার করতে বাধে না। নানা প্রবন্ধে ও নানা কবিতায় বিভিন্ন ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতেও বিভিন্ন শব্দার্থব্যঞ্জনার জন্যে তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে বিচিত্র পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছি, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার উপযোগী।

প্রথম যৌবনে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের কলানৈপুণ্যের কাহিনী শ্রবণ করতুম এবং তা দেখার সুযোগ পাইনি ব'লে মনে মনে করতুম যারপরনাই আপসোস। আরো শুনতুম সকলের কাছে তাঁর গান গাইবার শক্তির কথা। কিন্তু কপালগুণে হঠাৎ একদিন গান শোনার সাধ পূর্ণ হ'ল। মনে হচ্ছে সেটা "মানসী" পত্রিকার প্রথম বৎসর। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল "কাব্যে দুর্নীতি"র ধুয়ো তুলে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিষম এক ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করেছেন। এক দিন বৈকালে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাসায় ব'সে আছি, এমন সময়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এসে খবর দিলেন, আজ সাড়ে পাঁচটার পরে য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের মঞ্চে একজন বিখ্যাত মুসলমান সঙ্গীতবিদের (বোধ করি তাঁর নাম ছিল ইমদাদ আলি খাঁ) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা পাওয়া যাবে।

তিনজনেই ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করতে বিলম্ব করলুম না। য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের অবস্থান ছিল তখন গোলদীঘির উত্তর প্রান্তে, তার আধুনিক বাড়ী তখনও নির্ম্মিত হয় নি। গিয়ে দেখলুম কলেজের ছাত্রবৃন্দ সভাগৃহ পরিপূর্ণ ক'রে ফেলেছে। মুসলমান সঙ্গীতবিদ্‌টিকে সঙ্গে ক'রে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের উপরে দেখা দিলেন এবং নিজের সরস ভাষায় অল্প কথায় ওস্তাদজীর গুণের পরিচয় দিয়ে উপবেশন করলেন—সেদিন তিনি এইটুকু কর্ত্তব্য পালনই করতে এসেছিলেন। তারপর সুরু

হ'ল ওস্তাদজীর কথন—অর্থাৎ ভারতীয় সঙ্গীতের গুণ-ব্যাখ্যা। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ থেকে দু-এক টুকরো গানের নমুনাও পাওয়া গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথ উঠে সভাভঙ্গের নির্দ্দেশ দিতে গেলেন—কিন্তু তা পারলেন না। সভাসুদ্ধ লোক এক-বাক্যে চীৎকার করতে লাগলো—"আমরা আপনার গান শুনব, আমরা আপনার গান শুনব।" সেই সম্মিলিত কণ্ঠের আবেদন উপেক্ষা করা অসম্ভব, তিনি ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখে (সে স্মিত হাসিটুকু আজও দেখতে পাই) একখানা চেয়ারের উপরে আসীন হয়ে কোন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই গেয়ে গেলেন—

"তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।"

বৃহতী সভা, বিনা সঙ্গতে গান, কিন্তু আসর এমন জ'মে উঠল যে শ্রোতারা ব'সে রইল চিত্রার্পিতের মত। তারপর কবির কণ্ঠে আরো বহুবার সঙ্গতহীন সঙ্গীত শুনেছি এবং মনে হয়েছে, তিনি যেন কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতকে আলাদা করে রাখতেই ভালোবাসতেন, কারণ আগেই উল্লেখ করেছি তাঁর আর একটি নাট্যানুষ্ঠানে শ্রীমতী সাহানা দেবীকেও বিনা সঙ্গতে কয়েকটি গান গাইতে শুনেছি এই পদ্ধতিতে গায়ক বা গায়িকাকে নির্ভর করতে হয় কেবল নিজের কণ্ঠশক্তির উপরে এবং শ্রেষ্ঠ গায়করাও এভাবে কোন বড় আসর রাখতে ভরসা করেন না। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের নামজাদা গীতিশিল্পীরাও কোনকালে এই পদ্ধতিতে গান গাইতে রাজী হন নি। ছোট ছোট বৈঠকে বাংলাদেশের আর একজন প্রখ্যাত গায়ক কবিকে এইভাবে গান গাইতে শুনেছি—তিনি হচ্ছেন অতুলপ্রসাদ সেন।• কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল স্বভাবতঃ মৃদু, বৃহত্তর আসরেও তিনি খালি গলায় কখনো গান গেয়েছেন কি না জানি না, অন্ততঃ আমার তা শোনা হয় নি।

এর পরেও বেশ কিছুকাল কেটে গেল, ক্রমে কবির কাছে গিয়ে বসবার ও তাঁর মধুবর্ষী সংলাপ শোনবার সৌভাগ্যও অর্জন করলুম, কিন্তু তাঁর অভিনয় দেখবার সুযোগ আর হয়ে উঠল না। মাঝে মাঝে সে একটা সময় গেছে, রবীন্দ্রনাথ যখন দীর্ঘকাল ধ'রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে নিজেকে নিযুক্ত ক'রে রেখেছেন —এমন কি নাট্যজগতে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে লেখনীচালনাও করেছেন, তবু অভিনেতার সাজপোষাক আর পরতে চান নি। মনে মনে দুঃখিত ভাবে ভাবতুম, আমাদের কাছে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ গত যুগের মানুষ হয়েই রইলেন, পরিণত বয়সে আর তাঁকে আকর্ষণ করবে না পাদপ্রদীপের আলোকমালা।

তারপর এর তার মুখে শুনি, তাও তো নয়, কবি শান্তিনিকেতনে কখনো কখনো অভিনয়ের আয়োজনও করেন এবং মাঝে মাঝে নিজেকেও তার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে খাপ খাইয়ে নেন, যত দোষ করলে কলকাতার বাসিন্দারা,—এ যেন মথুরায় গিয়ে বৃন্দাবনকে ভুলে থাকা। আগেই বলা হয়েছে তখনকার দুর্গত সাধারণ রঙ্গালয়ের কথা। আমাদের ভাগ্যে তখন সেইখানে গিয়ে চেরাগের তলায় অন্ধকার নিরীক্ষণ করা ছাড়া আর কিছু করবার রইল না।

তারপর ১৩২১ সালে জানা গেল, শান্তিনিকেতনে কবিকে নিয়ে "ফাল্গুনী"রও অভিনয় হয়ে গিয়েছে এবং আমরাও নাটিকাখানি পাঠ করলুম ও মুগ্ধ হলুম বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব ও অভাবিত প্রয়োগনৈপুণ্যে ও কবির নিজের উপস্থিতিতে সে অভিনয় যে কতটা উচ্চস্তরে উঠতে পারে, তখনও তা ধারণায় আনবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আর অভিনয় হচ্ছে শান্তিনিকেতনে, কলকাতায় ব'সে কল্পনায় তার ভালো মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার আছে ব'লেও মনে করলুম না। আরো কিছুদিন পরে হঠাৎ কলকাতার ভাগ্য ফিরল। সেটা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ—প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে সমানভাবে। সেই সময়ে বাঁকুড়ায় দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। হৃদয়বান কবি স্থির থাকতে পারলেন না। দুর্ভিক্ষ-কাতরদের সাহায্য করবার জন্মে কলকাতায় করলেন টিকিট বেচে "ফাল্গুনী"র অভিনয়ের ব্যবস্থা। একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের উপকার সাধন এবং আর একদিকে সুরসিকদের মানসক্ষুধায় সুভিক্ষের ব্যবস্থাকরণ—অর্থাৎ একসঙ্গে মানবতার ও নাট্যকলার সেবা।

চিত্রাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু একটি চমৎকার প্রস্তাব করেছেন বা ইঙ্গিত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" নাট্যের অভিনয় হওয়া উচিত মুক্ত আকাশের তলায়। আমরা ঐ নাটকের অভিনয় দেখেছিলুম মানুষের হাতে বাঁধা কৃত্রিম রঙ্গমঞ্চে, ইষ্টক-পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু প্রকৃতির প্রাণের সঙ্গীতকে চিত্তের মাঝখানে উপলব্ধি ক'রে কবি রচনা করেছিলেন "ফাল্গুনী" কে। রঙ্গালয়ের বাঁধা নাট্যকার যখন নাটক লেখেন, তখন তাঁর চোখের সামনে জেগে থাকে অপ্রশস্ত মঞ্চ-জগৎ, সেখানকার বিবিধ বাধানিষেধের 'চীনের প্রাচীর' ভেদ ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না তাঁর বন্দিনী কল্পনা, লেখনীকে সংযত করতে হয় তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। রঙ্গালয়ের এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে কত কবির কত অসমাপ্ত ও অঙ্গহীন সঙ্গীতের গোপন ইতিহাস আছে, তা ধরা পড়ে কেবল বিশেষজ্ঞদের চোখেই।

কিন্তু "ফাল্গুনী" এ শ্রেণীর রচনা নয়। কবি যখন কাগজের উপরে কলমের

রেখাপাত করেছিলেন, তখন যে তিনি হাতে-আঁকা দৃশ্যপট ও মঞ্চের পাদপ্রদীপ প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে একবারও মাথা ঘামান নি, "ফাল্গুনী" পড়তে বসলে এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না। এর মধ্যে প্রাণের মন্ত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে মুক্ত প্রকৃতির বাধাবন্ধহীন, দিগন্তবিস্তৃত বর্ণবিচিত্র বসন্তোৎসব—যেখানে পথের ধারে দখিন হাওয়ার জন্যে ব্যাকুল বেণুবন আচম্বিতে বাঞ্ছিতের সাড়া পেয়ে বিপুল পুলকে গান গেয়ে ওঠে এবং যেখানে কথা কয়, নেচে ওঠে, হিন্দোলে দোলে ফুলফল, তৃণলতা ও গাছের সবুজ পাতারাও। সুতরাং মাথার উপরে বহিঃপ্রকৃতির উদার ও অসীম নীলাকাশ এবং পদতলে তার স্বহস্তে বিছানো হরিৎশষ্পশয়ন নিয়েই "ফাল্গুনী"র নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করলেই তাকে যথার্থ মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভবপর হবে। সেখানে কুশীলবদের সঙ্গে প্রেক্ষকরাও মুহুর্মুহুঃ কেবল ফুলগন্ধবাহী বসন্ত সমীরণের ছন্দ নয়, সেই সঙ্গে বিহঙ্গদের কলসঙ্গীত ও মধুকরদের গুঞ্জরণ কানে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে নিসর্গের অঢেল সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে অভিভূত না হয়ে পারবে না।

অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য, যে অতুলনীয় শিল্পীরা মঞ্চজগতে "ফাল্গুনী"র রূপকে ফুটিয়ে তোলবার ভার নিয়েছিলেন, তাঁদের কাজ কেবল নিখুঁত হয়েছিল বললেই সব বলা হয় না; তাঁরা প্রায় অসাধ্যসাধন করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাল্যকাল থেকেই সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছি; কিন্তু মঞ্চশিল্পের মধ্যে যথাযথ প্রয়োগনৈপুণ্য "ফাল্গুনী"র আগে আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। অপরিসর মঞ্চের উপরেই তাঁরা জীবন্ত প্রকৃতির প্রাণের প্রাচুর্য্যকে যতটা সম্ভব জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

আর অভিনয়ও হয়েছিল তেমনি অপূর্ব্ব। রাজার ভূমিকা নিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। তাঁর আগে মঞ্চের উপরে দেখেছিলুম বহু তথাকথিত "রাজা-মহারাজা"কে, কিন্তু সাজে, ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে তাঁদের কারুকেই সত্যিকার রাজা ব'লে ভ্রম হয় নি, গগনেন্দ্রনাথকে দেখে যা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ যে একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাভিনেতা, অল্পের মধ্যেই সে প্রমাণও পাওয়া গেল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণও অভিনয়কে সার্থক ক'রে তুলতে অল্প সাহায্য করেন নি। স্বর্গীয় পিয়ারসন সাহেবের বিবিধ গুণের কথা লোকমুখে শ্রবণ করেছি। তাঁকেও দেখলুম একটি নীরব ভূমিকায়। তাঁকে সেই আমার প্রথম ও শেষ দেখা।

সর্ব্বোপরি হচ্ছে নাটের গুরু রবীন্দ্রনাথের অভিনয়। "বৈরাগ্যসাধনে" তিনি দেখা দিলেন এক তরুণ ভূমিকায়। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের কোঠায়। কিন্তু মঞ্চের মায়ামন্ত্রে রূপান্তর পেয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি নবীন এক যুবকের মত। সর্ব্বাঙ্গে তাঁর যৌবনের চাঞ্চল্য, তারুণ্যের লীলা; ভাষণেও তাজা স্বরমাধুর্য্য। এরও প্রায় এক যুগ পরে রবীন্দ্রনাথকে তরুণ জয়সিংহের রূপ পরিগ্রহণ করতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম এবং সেদিনও আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। মনে মনে ভেবেছিলুম, রবীন্দ্রনাথ যখন "কড়ি ও কোমল" এবং "মানসী" প্রভৃতি কাব্যরচনা করেছিলেন, তখন কি তাঁর মূর্ত্তি ছিল এমনি সুকুমার, এমনি অনিন্দ্যসুন্দর? কেবল চেহারা নয়, তাঁর অভিনয় হয়েছিল বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য এবং কবির ভূমিকায় আধুনিক পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির অভিনয় হবে যে উচ্চশ্রেণীর ও স্বভাব-সুন্দর, এটা কিছু বিচিত্র কথা নয়।

তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অন্ধ বাউলের ভূমিকায়। একেবারে বিপরীত ভূমিকা। প্রাচীন বাউল, দেহে যৌবনের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু বার্দ্ধক্যও যে শ্রীমন্ত হ'তে পারে, তার দিকে তাকালে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। বাউল অন্ধ বটে, কিন্তু আত্মার মহান দৃষ্টিতে তার মৌখিক ভাব দীপ্যমান। হাতে একতারা নিয়ে বাউল মনোহর নাচের ভঙ্গিতে গান ধরলে—"ধীরে বন্ধু ধীরে"। সে কি হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত, রাগিণীর ঝঙ্কারে তার কি গভীর ভাবের অভিব্যক্তি, যে কোন মূর্চ্ছিত চিত্তও তার ধ্বনির ইন্দ্রজালে মুহূর্ত্তে সচেতন হয়ে উঠতে পারে, সেই অপূর্ব্ব সুর-সুরধুনীর সঙ্গে বাউলের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিগলিত হয়ে শ্রোতাদের শ্রবণমনের উপরে ঝ'রে পড়তে লাগল। কত সেরা সেরা গুণীর গান শুনেছি, কিন্তু মানসচোখে আর কারুর কণ্ঠ-ধ্বনির মধ্যে তেমনভাবে অরূপকে রূপধারণ করতে দেখি নি। এ আমার অতিবাদ নয়, সেদিনকার প্রেক্ষাগারে যে ভাগ্যবানরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার কথায় সায় দিয়ে বলবেন, সঙ্গীতে তেমন রূপায়ণ ধারণাতীত। এডোয়ার্ড টমসন সেই গীতাভিনয় দেখে লিখেছিলেন: "Not often can men have seen a stage part so piercing in its combination of fervid action with personal significance. It was almost as if Milton had acted his own Samson Agonistes."

আগেই যথাসময়ে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীর ব্যাখ্যা আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়; আমরা কেবল গৌণ ভাবে তাঁর কয়েকখানি নাটক

সম্পর্কে কিছু কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা", "রক্তকরবী", "কালের যাত্রা", "তাসের দেশ", "গৃহপ্রবেশ", "তপতী" ও "চণ্ডালিকা" প্রভৃতি রচনা সম্বন্ধে আমরা এখানে বিশেষ ভাবে কিছু বলব না; তবে আনুষঙ্গিক কারণে কোন কোন নাটক সম্বন্ধে অল্পস্বল্প বাক্যব্যয় করলে নিতান্ত মন্দ হবে না।

উপরে যে রচনাগুলির নাম করলুম, তার মধ্যে প্রতীক-নাট্যরূপে "রক্তকরবী" অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছে। এ নাটকখানির ভিতরের কথা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং আরো অনেকে ছোট-বড় আলোচনা করেছেন। এ-সব ব্যাপারে তুলি ও কলমের যাদুকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণতঃ মৌনব্রত অবলম্বন ক'রেই থাকতেন, কিন্তু "রক্তকরবী"র সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনিও ব্যাখ্যাতারূপে দেখা না দিয়ে পারেন নি। তাঁর সে ভাষণ অল্পের মধ্যে অপূর্ব্ব ও উপভোগ্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতকটা অবান্তর; তাই লোভ থাকলেও উদ্ধার করতে পারলুম না। "রক্তকরবী" ঠাকুর-বাড়ীতে মঞ্চস্থ হয় নি, বাইরে অন্য কোথাও অভিনীত হয়েছে ব'লেও সংবাদ পাইনি; কেবল দুঃসাহসী শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী একসময়ে সাধারণ রঙ্গালয়ে তার অভিনয় দেখাবার জন্যে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হ'লে আমাদের তথাকথিত 'থিয়েটারী' জনতার কাছ থেকে "রক্তকরবী" যে অভিনন্দন লাভ করত, এমন বিশ্বাস আমার নেই। মুক্তা বেশ দামী আর সেরা জিনিস, কিন্তু তার সমঝদাররা যে বেণাবনবাসী নয়, প্রবাদ সে কথা আগে থাকতেই ব'লে রেখেছে। "রক্তকরবী"র অভিনয় দেখিনি বটে, কিন্তু অন্য একটি কারণের জন্যে এই নাটকখানি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের একটি অভ্যাস ছিল। নূতন কোন নাটক (এবং অন্যান্য রচনাও) লিখলে তিনি তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের কাছে তার পাঠ না শুনিয়ে তৃপ্তি পেতেন না। বাছা বাছা শ্রোতারাই এ শ্রেণীর আসরে উপস্থিত থাকতেন, রসভঙ্গ হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এই ভাবে আমরা কবির নিজের মুখে তাঁর বহু কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটকের পাঠ শোনবার যে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি, তার জন্যে নিজেদের ভাগ্যবান ব'লে মনে করি। সে সব আবৃত্তি আমাদের কাছে ঐশ্বর্য্যের মত হয়ে আছে—ইহজীবনের পরম সঞ্চয়।

একদিন কবির কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল, তিনি আমাদের "রক্তকরবী" পাঠ ক'রে শোনাবেন। সেটা ঠিক কোন্ বৎসর, স্মরণে আসছে না। "রক্তকরবী" প্রকাশিত

হয়েছিল ১৩৩০ সালের "প্রবাসী" পত্রিকায়। নাটকখানির পাঠ শুনেছিলুম বোধ করি তার আগেই। সেদিনকার সান্ধ্য আসর বসেছিল অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতলের বসবার ঘরে। শ্রোতার সংখ্যা বেশী ছিল না। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তিন সহোদর তো ছিলেনই, আর ছিলেন "ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন সাহিত্যিক, যেমন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আরো কেউ কেউ, সকলের নাম মনে পড়ছে না। ফরাশপাতা কক্ষতলের মাঝখানে এসে আসনে আসীন হ'লেন রবীন্দ্রনাথ,—দীর্ঘ ঋজু দেহ, মুখে মৃদু হাস্য, দুই আয়ত চক্ষে প্রতিভার শান্তস্নিগ্ধ দীপ্তি, পরিধানে পাটভাঙা রেশমী পাঞ্জাবি ও কাপড়। তাঁর বয়স তখন চৌষট্টির কম হবে না, কিন্তু বার্দ্ধক্যও যে কত সুন্দর হ'তে পারে প্রাচীন রবীন্দ্রনাথকে যিনি দেখেন নি তিনি তা বুঝতে পারবেন না। আমরা তিন দিক দিয়ে তাঁকে বেষ্টন ক'রে বসলুম, তিনি পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ আরম্ভ করলেন অনতি-উচ্চ স্বরে।

সমসাময়িক প্রায় অনেক বাঙালী কবিকেই স্বলিখিত রচনার আবৃত্তি করতে শুনেছি, কিন্তু সাফল্য অর্জ্জন করতে দেখেছি খুব কম লোককেই। অনেকেই ভালো লেখেন, কিন্তু ভালো আবৃত্তি করতে পারেন না। অনেক নাট্যকারও নাটক প'ড়ে শুনিয়েছেন, কিন্তু আবৃত্তি হিসাবে তা উল্লেখযোগ্য হয় নি আদৌ। এমন কি যাদের কাছ থেকে লোকে বৈধ আবৃত্তির আশা ক'রে থাকে, বাংলা দেশের সেই অভিনেতারাও অনেক সময়ে এ ক্ষেত্রে রীতিমত অক্ষমতা প্রকাশ করেন। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা। কিন্তু তাঁর আবৃত্তি হ'ত প্রায়ই অর্থহীন, অথচ ভালো আবৃত্তির একটা মস্ত গুণ হচ্ছে তা একসঙ্গে শ্রুতিমধুর, শব্দার্থ-বোধক ও রচনার সৌন্দর্য্য-প্রকাশক।

যান্ত্রিক সভ্যতার নির্ম্মমতা ও বীভৎসতা দেখানোই ছিল "রক্তকরবী" নাটকের উদ্দেশ্য, কিন্তু যে অতুলনীয় কবিত্ব ও রচনাকৌশলের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছেন, পাঠককে তা বিস্ময়ে অভিভূত না ক'রে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যখন আবৃত্তি করতে বসলেন, তখন নাটকের তাবৎ বিশেষত্ব ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল ফুলের মত। আমার মতে, সাধারণ অভিনয়ের চেয়ে আবৃত্তি হচ্ছে দুরূহ আর্ট। মঞ্চের উপরে অভিনেতাকে সাহায্য করে তাঁর হস্ত-পদ এবং সহ-অভিনেতারা, দৃশ্যপট ও আলোকনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। কিন্তু আবৃত্তিকারকের প্রধান

সম্বলমাত্র তাঁর কণ্ঠস্বর। এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনুপম কণ্ঠস্বরের অধিকারী, তাঁর কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যে-কোন ভাব অভিব্যক্ত হ'তে পারত, যে গুণ নেই বহু শ্রেষ্ঠ অভিনেতার। তাঁর আবৃত্তির কথা আগেও অন্যত্র বলা হয়েছে, সুতরাং এখানে আর কিছু না বললেও চলবে। তবে এ কথা ঠিক যে, বাংলা দেশের নাট্য তথা সাহিত্য-জগতে আর কারুকেই আমি রবীন্দ্রনাথের মত আবৃত্তি করতে শুনিনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ বৈশিষ্ট্য

ইতিমধ্যে সাধারণ বা পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তরুণ রবীন্দ্রনাথ "বাল্মীকি-প্রতিভা" নিয়ে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে পেশাদার নটনটীদের কোনই সম্পর্ক ছিল না, অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সম্প্রদায় পরেও আলফ্রেড, এম্পায়ার ও নিউ এম্পায়ার প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তা নিয়েও পেশাদার নাট্যশালার গৌরব বোধ করবার কিছুই নেই।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধ'রে পেশাদার বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। গিরিশ-যুগে এখানে উচ্চশ্রেণীর অভিনেতার অভাব ছিল না, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর প্রয়োগনৈপুণ্যের অভাব ছিল যে যথেষ্ট, এ কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বেশ বোঝা যায়, তখনকার নাট্যাচার্য্যগণ অভিনয়ের দিকে যতটা জোর দিতেন, প্রয়োগনৈপুণ্যের দিকে ততটা দিতেন না। আরো একটা কথা বলা দরকার। কোন একখানি নাটকের আগাগোড়া অভিনয়ের সুর উচিতমত উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা না হ'লেও তাঁরা নাটক মঞ্চস্থ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। ফলে আমরা গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে এমন সব অভিনেতাকেও দেখতে বাধ্য হতুম, যাঁদের বরদাস্ত করা রীতিমত অসম্ভব। গিরিশোত্তর যুগে এই অক্ষমদের অত্যাচার আবার মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

সেকাল থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখেছিলেন। মাঝে মাঝে আহূত হয়ে পেশাদার সম্প্রদায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও অভিনয় করতে যেত। কিন্তু সে সব অভিনয় যে তাঁর মনের মত হয়েছিল, এমন মত তিনি প্রকাশ্যে কোনদিনই জাহির করেন নি। বরং একবার অনুরুদ্ধ হয়েও সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন যে: "কাগজে নিজের জবানীতে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য। প্রায়

বালকবয়স থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে নাট্যকলার চর্চ্চা ক'রে এসেছেন। তার উপর তরুণ বয়স থেকেই তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয় দেখবার দুর্লভ সুযোগও পেয়েছিলেন—যে সৌভাগ্য হয় নি তখনকার অন্য কোন বাঙালী নাট্য-পরিচালকের। সুতরাং সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয় যে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় মনীষাকে তৃপ্তি দিতে পারত না, এটুকু অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। জনৈক নাট্যরসিক সাহিত্যিক পত্রান্তরে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদের পেশাদার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্দ ধারণা পোষণ করতেন না। এই উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। ১৩৩৪ সালের একদিনের কথা স্মরণ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন: "যে ভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে, সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই টিঁকতে পারবে না। সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়—যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চান, তাঁদের জন্যে কি বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না?...এমন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে আমাদেরও অভিনয় দেখবার সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লেখবারও ইচ্ছা জাগে।" তিনি এই সঙ্গে আরো কিছু মূল্যবান কথা বলেছিলেন, ১৩৩৪ সালের "নাচঘর" পত্রিকায় আমি সে সব প্রকাশ করেছিলুম, এখানে তা আর উদ্ধার করবার দরকার নেই।

সাধারণ বাংলা রঙ্গালয় রবীন্দ্রনাথের মনে প্রেরণা সঞ্চার করে নি বটে, কিন্তু সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষরা কবির দানকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। রবীন্দ্রনাথ "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জ্জন" নাট্যকাব্য রচনা করেন যৌবনবয়সে। রচনার অল্পদিন পরেই (১৮৯০ খৃষ্টাব্দ) মিনার্ভা থিয়েটারে তা সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে বিক্রমদেব, কুমারসেন, দেবদত্ত, সুমিত্রা ও ইলার ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন যথাক্রমে মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, গুলফন হরি ও কুসুমকুমারী (বিবাদ)। অভিনেতৃগণের সকলেই ছিলেন প্রখ্যাত। খুব সম্ভব আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও সেই অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কেমন লেগেছিল, এ কথা আমরা জানি না। তবে কুমারসেনের ভূমিকায় মহেন্দ্রলালের অভিনয় যে জনসাধারণের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, এ খবর আগেই দিয়ে রেখেছি। তাঁর "বিসর্জ্জন"ও সে সময়ে নিশ্চয়ই সাধারণ রঙ্গালয়ে সাদরে গৃহীত হ'ত, কিন্তু কেন যে হয় নি সে কথাও ব্যক্ত করেছি যথাসময়েই। ১৯১০ কি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে আমি "রাজা ও রাণী"র

পুনরভিনয় দেখেছিলুম। বিক্রমদেবের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় হয়েছিল নিশ্চিতরূপে নিম্নশ্রেণীর। ক্ষেত্রনাথ মিত্র (কুমারসেন) অনেক প্যাঁচ কষেও আসর জমাতে পারেন নি। ভূমিকার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পেরেছিলেন একমাত্র সুশীলাবালাই (রাণী সুমিত্রা)।

তারপর বহুকাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় বিরত দেখে সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা অন্য উপায়ে তাঁর জনপ্রিয়তাকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর বিবিধ গল্প ও উপন্যাস অবলম্বন ক'রে থিয়েটারের পালা রচিত হ'তে লাগল, যেমন "বসন্ত রায়" (বউঠাকুরাণীর হাট), "চোখের বালি", "ডালিয়া" ও "দশচক্র" (মুক্তির উপায়) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এ সবের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের কোন যোগাযোগ ছিল না, নাট্যরূপদাতারা তাঁর কাহিনীকে ব্যবহার করেছিলেন যথেচ্ছভাবেই। তারও বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যভাবে না হোক অন্ততঃ গৌণভাবেও সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করেছিলেন এবং তার ফল হয়েছিল যথেষ্ট শুভদায়ক।

সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের সম্পর্ক নিয়ে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক ("রাজা ও রাণী") আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তারপর আরো কয়েকটি পালার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত ছিল বটে, কিন্তু সেগুলি হচ্ছে তাঁর লিখিত গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ মাত্র—বিভিন্ন লেখক আপন আপন মর্জ্জি অনুসারে রবীন্দ্ররচনার কোন কোন অংশ গ্রহণ বা ত্যাগ করেছিলেন। এমন কি কোন কোন নাট্যরূপদাতা ঐ সব পালার মধ্যে নিজেদের কুলিখিত গানও চালিয়ে দিতে সঙ্কোচবোধ করেন নি। এই শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ পালার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল "বউ ঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাস থেকে গৃহীত "বসন্ত রায়"। ছোট হাস্যনাট্যের উপাদান জুগিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়" গল্পটি। এই গল্পটি যে জনসাধারণকে অতিরিক্ত মাত্রায় আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ হচ্ছে, একাধিক লেখকের দ্বারা এটি বিভিন্নভাবে ও কৌশলে হাস্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছিল (একবার ষ্টার এবং একবার মনোমোহন থিয়েটারে)। গল্পটির মধ্যে নাটকীয় সম্ভাবনা দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে তা গৃহীত হয়নি বোধকরি এই কারণেই যে, চুটকি হাস্যনাট্যের রেওয়াজ তখন উঠে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত "রাজা ও রাণী" এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল বহুকাল আগে, অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। শুনতে পাই ঐ সময়ে ওখানে তাঁর ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য "চিত্রাঙ্গদা"ও একবার নাকি মঞ্চস্থ হয়েছিল, কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কোনই সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নি। "রাজা ও রাণী" মঞ্চস্থ হবার পর প্রায় দুই যুগ কেটে যায়, এবং এর মধ্যে আমাদের থিয়েটারের কর্ত্তারা রবীন্দ্রনাথের লেখনীর নিজস্ব দান গ্রহণ করার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ দেখান নি। তারপর হঠাৎ কি কারণে বা কোন্ খেয়ালে জানি না, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ মঞ্চস্থ করে বসলেন রবীন্দ্রনাথের "বিদায়-অভিশাপ" নামে খণ্ড নাট্যকাব্যখানি। যদিও দানীবাবু (কচ) ও তারাসুন্দরী (দেবযানী) এর দুই ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন, তবু এই অভিনয়কে উল্লেখযোগ্য বলতে পারি না। কারণ পালাটিকে বোধ হয় একরাত্রির পরে আর মঞ্চস্থ করা হয় নি।

তারপর আরো সাত বৎসর কেটে যায়। এর মধ্যে বাংলা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের একবারও মনে পড়ে নি, বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথ নামধেয় জনৈক নাট্যকারের অস্তিত্ব আছে। ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেছেন উপেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিদেশী ম্যাডানদের থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেছেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। উপেন্দ্রবাবু ছিলেন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তখনকার চলতি বাংলা থিয়েটারগুলির মালিকদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এদেশের নাট্য-জগতে নূতন যুগকে আর ঠেকিয়ে রাখা চলবে না। তাঁরই আগ্রহে শিশিরকুমারের পরেই নবযুগের অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র এবং আরো কেউ কেউ মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। আমরা উপেন্দ্রবাবুকে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটক খোলবার জন্যে অনুরোধ ক'রেছিলুম। কিন্তু তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি, কারণ থিয়েটারের অন্যান্য লোক তাঁকে ভয় দেখান যে "বিসর্জ্জনে"র শেষ-দৃশ্যে যে প্রতিমা বিসর্জ্জনের দৃশ্য আছে তা দেখলে দর্শকরা বিদ্রোহ প্রকাশ করবে। তখন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে উপেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথের "বশীকরণ" কৌতুকনাট্যখানি নিজের রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করেন। প্রধান পুরুষ-ভূমিকায় রাধিকানন্দের অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। এ হচ্ছে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কথা। অর্থাৎ "রাজা ও রাণী" খোলবার প্রায় বত্রিশ বৎসর পরে বাংলা রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত নাটকের নিয়মিত অভিনয় সম্ভবপর হয়েছিল। বাঙ্গালীর পক্ষে এটা খুব গৌরবের কথা নয়।

তার কিছুকাল পরেই বাংলা নাট্যজগতে নবযুগের প্রবর্ত্তক শিশিরকুমার মনোমোহন নাট্যমন্দিরের পত্তন করলেন। তাঁর মত মনীষী যে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হবেন, এটুকু সহজেই অনুমেয়। "সীতা" খোলবার পরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক অবলম্বন করতে চাইলেন এবং তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথও পূর্ব্বলিখিত "চিরকুমার সভা"কে অভিনয়ের উপযোগী করে দিলেন। কিন্তু শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ নাটকখানি কি ক'রে যে তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়, সে সব কথা বলা হয়েছে যথাসময়েই। মোট কথা, তিনিই উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন, তাই তার ধারা গিয়ে প'ড়েছিল ষ্টার থিয়েটারে। সেখানে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "চিরকুমার সভা" মঞ্চস্থ হয়। বাংলা রঙ্গালয়ের নবযুগে এই নাটকখানি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের অগ্রদূতের মত। কারণ যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের জন্যে কোনদিনই মাথা ঘামান নি, তিনিই এর পর তার মুখ চেয়ে "গৃহপ্রবেশ", "শোধবোধ" ও "শেষরক্ষা" প্রভৃতি পালাগুলিকে অভিনয়ের উপযোগী ক'রে দিয়েছিলেন। এবং তার পরও রবীন্দ্রনাথেরই মতানুসারে তাঁর "পরিত্রাণ" "বিসর্জ্জন", "তপতী" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা" প্রভৃতি নাটকও সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। সেকাল-কার বাংলা থিয়েটারে বত্রিশ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত একখানিমাত্র নাটকের নিয়মিত অভিনয় সম্ভবপর হয়েছিল, কিন্তু সেখানে নূতন দলের শিল্পীদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিজের লেখা একখানি নাটকের সঙ্গে জনসাধারণ পরিচিত হবার সুযোগ পায়। এ হচ্ছে নবযুগেরই বিশেষত্ব।

কেবল তাই নয়, এই সময়ে বাংলা থিয়েটার সঙ্গীতের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুরের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং মঞ্চশিল্পের দিক দিয়ে ঠাকুরবাড়ীর শিল্পাচার্য্যদেরও অল্পবিস্তর সাহায্য লাভ করেছিল। অভিনয়ের দিক দিয়েও "তপতী" "বিসর্জ্জন", "গৃহপ্রবেশ" ও "চিরকুমার সভা" প্রভৃতি নাটকও যে যারপরনাই উৎরে গিয়েছিল, এ সত্য আজ সর্ব্বসম্মত বলা যেতে পারে। তবে ব্যবসায়ের দিক দিয়ে তাদের সাফল্য যদি অসামান্য না হয়ে থাকে, তাহ'লে সেজন্যে দায়ী করতে হবে বাংলা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে নয়, বাংলা দেশের জনসাধারণকেই।

রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকখানি ছোট ও মাঝারি আকারের নাটক আছে, কিন্তু সেগুলির বিষয়বস্তু নিয়ে আর কোন কথা না বললেও চলবে, কারণ রবীন্দ্রনাথ স্বষ্ট নাট্যসাহিত্যের বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—সে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করেছেন যোগ্যতর ব্যক্তি। নাট্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে ভালো ক'রে বোঝাবার জন্যে

যতটুকু দরকার, ততটুকু আলোচনা করেছি আমরা ইতিপূর্ব্বেই এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে সেইটুকুই যথেষ্ট মনে করলে ভুল হবে না।

সাধারণ নাটকের আসরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শেষ অভিনয় করেছিলেন "শারদোৎসবে"র সন্ন্যাসীর ভূমিকায়। সেটা হচ্ছে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা। ঐ বৎসরই আমরা আর একটি অপূর্ব্ব রসাস্বাদনের প্রথম সুযোগ পাই। রঙ্গমঞ্চের উপরে আমরা দেখি অভিনেতার সমগ্র আর্টকে। এক্ষেত্রে সমগ্র আর্ট বলতে বুঝি অভিনেতার ভাষণ, অঙ্গভঙ্গ ও চলাফেরা। অর্থাৎ এক সঙ্গে দর্শন ও শ্রবণের আনন্দ। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নিউ এম্পায়ার রঙ্গালয়ে "অরূপরতনে"র অভিনয়ের যে আয়োজন হয়েছিল, দুটি কারণের জন্যে আমাদের কাছে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রথম কারণ হচ্ছে: সেদিন আমরা অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে রঙ্গমঞ্চের উপরে দর্শন করি নি, শ্রবণ করেছিলুম কেবল তাঁর বাক্যাভিনয়। "অরূপরতনে"র প্রধান ভূমিকা হচ্ছে রাজার ভূমিকা। রাজা কোথাও চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন না—সাড়া দেন নেপথ্য থেকেই। নাটকের এই অশরীরী চরিত্রের যা-কিছু বিশেষত্ব সমস্তই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কেবল তার বচনের ভিতর দিয়েই। সুতরাং কণ্ঠস্বরের উপরে কতখানি দখল থাকলে এমন চরিত্রের বিশেষ ভাবটি শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে, বিশেষজ্ঞদের কাছে সে কথা বলা বাহুল্য মনে করি। সমস্ত ঘটনার মূলসূত্র ধারণ ক'রে আছেন স্বয়ং রাজা, অতএব তাঁর ব্যক্তিত্বেরও প্রকাশ হওয়া চাই অসাধারণ এবং তাও ফুটিয়ে তুলতে হবে একমাত্র ঐ কণ্ঠস্বরের সাহায্যেই। এ যেন কায়াহীনের ছায়া দেখানোর মত অসম্ভব কাজ, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব্ব ও বিচিত্র কণ্ঠস্বরের ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে সম্যকভাবে এই সব অসাধ্যসাধনই করতে পেরেছিলেন। রাজাকে চোখে না দেখেও আমরা গ্রহণ করতে পেরেছিলুম অন্তরের মাঝখানে। বরং মনে হয়, শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রসাদে আমরা এইভাবেই অরূপের রূপকে আরো ভালো ক'রে উপলব্ধি করতে পারি, রাজাকে চোখের সামনে পেলে হয়তো তাঁর মহিমা হ'ত কতকটা ক্ষুণ্ণ।

আর একটা কথা ভেবে বিস্ময় অনুভব না ক'রে পারি না। রবীন্দ্রনাথ যখন রাজার এই বাঙ্ময় ভূমিকা গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বৎসর। সাধারণ রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয়ে অভ্যস্ত পেশাদার অভিনেতারাও এ বয়সে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশে বোধ করি একমাত্র অমৃতলাল বসুই সত্তর পার হয়েও মঞ্চাভিনয় ত্যাগ করেন নি। তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে, শেষ বয়সে অমৃতলালের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক ভাবেই দুর্ব্বল হয়ে

পড়েছিল এবং তাঁর বাণীও ততটা মার্জিত ছিল না। কিন্তু পঁচাত্তর বৎসর বয়সে রাজার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে বাণী শুনেছিলুম, তা ছিল যেমন সবল, তেমনি পরিষ্কৃত ও তেমনি সঙ্গীতময়। কেউ ব'লে না দিলে বুঝতে পারা অসম্ভব ছিল যে, রাজার ভাষণের জন্ম কোন অতি-প্রাচীনের কণ্ঠের মধ্যে। কেবল রাজা নয়, ঠাকুর্দ্দার ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথ উপহার দিয়েছিলেন বাক্যময় ভূমিকা।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ঐ অভিনয় আর এক কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর পরে সাধারণ নাট্যশালায় আর রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। তিনি রঙ্গমঞ্চের উপরে সর্ব্বপ্রথমে অভিনয় করেন অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে, অলীকবাবুর ভূমিকায়। সে হচ্ছে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের কথা। তারপর সুদীর্ঘ আটান্ন বৎসর কাল নটজীবন যাপন ক'রে রবীন্দ্রনাথ অবশেষে বিদায়গ্রহণ করলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় এ বিদায় নেওয়া নয়, কারণ পর বৎসরেই দেখি, নিজের নাট্য-সম্প্রদায় নিয়ে তিনি ভারতে সফর করতে বেরিয়েছেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অর্থসংগ্রহ করবার জন্যে। তখনও তাঁর প্রাণে নবীনের মত অদম্য উৎসাহ, যদিও অত্যন্ত অপটু জরাজর্জ্জরিত দেহ। কিন্তু এমন অসাময়িক ও অত্যধিক উৎসাহ বরদাস্ত করতে পারলেন না মহাত্মা গান্ধী। কবির প্রতি তাঁর মমতা ছিল এতই বেশী যে, শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের জন্যে তিনি নিজেই টাকা তুললেন এই সর্ত্তে, দিল্লী থেকেই রবীন্দ্রনাথকে ফিরতে হবে দেশের দিকে। তখন বাধ্য হয়েই কবিকে প্রত্যাগমন করতে হ'ল সদলবলে। দেশের বাইরে ছুটাছুটি হয়তো চক্ষুলজ্জার দায়েই বন্ধ হ'ল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিরতরুণ প্রাণের মধ্যে নাট্যকলা কোনদিনই শ্রান্ত হয়ে পড়ে নি। ঘরোয়া অভিনয়ের আসরে তাঁকে বাধা দেবে কে? মৃত্যুর অল্পদিন আগেই আবার তিনি করলেন "ডাকঘর" অভিনয়ের আয়োজন এবং নিজে নিলেন আবার ঠাকুর্দ্দার ভূমিকা! আবার নিয়মিত মহলা চলল, কিন্তু সেবারে আর নাটক মঞ্চস্থ হ'তে পারে নি। তাঁর মত নাট্যপ্রীতির কথা অশ্রুতপূর্ব্ব।

নাট্যজগতে শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে যে সব অবদান রেখে গিয়েছেন, এতদিন ধরে আমরা তার একটি মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি; কিন্তু সাহিত্যজগতের মত নাট্যজগতেও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র অবদান হচ্ছে বহুধাবিভক্ত; সম্পূর্ণভাবে, বিস্তৃতভাবে ও বিশদভাবে তা দেখাবার শক্তি ও সুযোগ আমাদের নেই। তবু আরো কিছু আলোচনা করতে হবে, কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন কোন কথা এখনো বলা হয়নি।

নাট্যশিল্পীর অন্যতম অবলম্বন হচ্ছে সঙ্গীত। কেবল কথা নয়, স্মরণাতীত কাল থেকেই সঙ্গীতের মাধ্যমেই নাট্যরস পরিবেশিত হয়ে আসছে। বর্ত্তমান যুগে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে সঙ্গীত হয়ে আছে সবচেয়ে বেশী কোণঠাসা। এখানকার কর্ত্তা-ব্যক্তিরা নাটক বলতে বোঝেন যেন খালি কথার নাটক। গীতিনাট্য তো একরকম নির্ব্বাসিত হয়েছেই, সাধারণ নাটকেও সঙ্গীতকে মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয় যেমন তেমন করে নিতান্ত নাচার ভাবেই। কিন্তু পাশ্চাত্য নাট্যজগতে সঙ্গীত আজও অসাধারণ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। সত্য বটে, সেখানকার সাধারণ নাটকে গানকে বড় আমল দেওয়া হয় না, কথাই হচ্ছে তার সর্ব্বস্ব। কিন্তু সেখানে যেসব কথাসার নাটক নিরতিশয় লোকপ্রিয়তা লাভ করে, বিভিন্ন গীতিনাট্যমন্দিরে সেগুলিকে আবার নতুন করে কেবল সঙ্গীতের মাধ্যমেই মঞ্চস্থ করা হয় এবং কথা তখন কিছুমাত্র প্রশ্রয় পায় না।

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং সঙ্গীত হচ্ছে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য। তাঁর পক্ষে সঙ্গীতকে কোথাও ভুলে থাকবার কথা নয়। নাট্যজগতে সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রথম নাটক ("বাল্মীকি-প্রতিভা") আত্মপ্রকাশ করে। তারপর তিনি বরাবরই গদ্য ও পদ্য যে সব বাক্যপ্রধান নাটক রচনা করেছেন, সেগুলির নাটকীয় ক্রিয়া এবং রসের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক যে কতখানি, বিশেষজ্ঞদের তা অজানা নেই! সঙ্গীতহারা হলে মাঠে মারা যাবে তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রই। পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ নাট্যকাররা সাধারণতঃ নাট্যরসবিকাশের জন্যে সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করতে চান না, একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলা হচ্ছে গীতাভিনয়ের দেশ। সেকালে এখানে যে কোন নাট্যাভিনয়কে মনে করা হ'ত গীতাভিনয়ের নামান্তর। ইংরেজী প্রভাবের ফলে থিয়েটার এখানে যাত্রার উপরে টেক্কা দিলে বটে, কিন্তু আমাদের আধুনিক নাট্যকাররা পাশ্চাত্য প্রথায় নাটক রচনায় নিযুক্ত হয়েও বাঙালীর সঙ্গীতানুরাগকে বর্জন করতে রাজী হলেন না—এমন কি চলতি ধারার বিরোধী মাইকেল মধুসূদন পর্য্যন্ত সাধারণ নাটকেও সঙ্গীতের অধিকার বা সার্থকতা অস্বীকার করতে পারেন নি। রবীন্দ্রপ্রতিভা বিশ্বজনীন বটে, কিন্তু তার মধ্যেও বাঙালীর ঐ বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কেবল গীতিনাট্যে নয়, সাধারণ নাটক রচনার সময়েও সঙ্গীতকে তিনি পরিহার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা বিস্ময়জনক। সারাজীবন ধ'রে তিনি যত গান রচনা করেছেন, পৃথিবীর আর কোন কবি তা পেরেছেন বলে জানি না! বাংলার

সঙ্গীতকলাকে তিনি বাঙালীর জাতীয় সম্পদে পরিণত করেছেন। এ সম্বন্ধে বড় বড় মাথাওয়ালারা বহু মূল্যবান আলোচনা করেছেন, করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। তা নিয়ে আমার ছোট মাথা ঘামাবার দরকার দেখি না। কিন্তু আমি আর একদিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান বা ঋতু-সঙ্গীত।

পাশ্চাত্য গীতিকাররা কোন দিনই ঋতুসঙ্গীত রচনা করতে পারেন নি—যেহেতু সেখানে নেই বাংলার মত ছয় ঋতুর সমারোহ। আবার বাংলা দেশেও আর কোন কবি বা গীতিকারও এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নন, আর কেউ পারেন নি এমন সমগ্রভাবে জমিয়ে তুলতে ছয় ঋতুর খেলাকে। তার উপরে বিশেষ বিশেষ ঋতুর জন্যে গানের মালা গেঁথে তিনি যে ঋতু-উৎসব প্রবর্ত্তন করেন, সেও একটা রীতিমত স্মরণীয় ব্যাপার, কারণ তাঁর আগে এমন অভিনয় প্রচেষ্টা আর কখনো হয় নি। সর্ব্বপ্রথমে (১৩২৮ সালে) "বর্ষামঙ্গল" নিয়ে এই শ্রেণীর উৎসব সুরু হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে সেই প্রথম ঋতুর জলসায় উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মনে আছে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর লীলার সাহায্যে কাব্যগীতির ভিতর দিয়ে বর্ষার যে চলচ্ছবি শ্রোতাদের চিত্তে সমগ্র হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল বিচিত্র নাটকীয় ক্রিয়ার আভাস। 'বর্ষামঙ্গল' এমন জমে ওঠে যে পরে রবীন্দ্রনাথের আসরে সুরু হয় অন্যান্য ঋতুরও উৎসব।

ক্রমে এই সব ঋতু-উৎসবের নাটকীয় রূপটি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গানে, নাচে, ভাবাভিনয়ে ও আবৃত্তিতে রস গাঢ়তর হয়ে সকলকে মুগ্ধ করে। গানের মালার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় কথার পালাও—যেমন "বসন্তোৎসব", "শেষবর্ষণ", "সুন্দর" ও "শ্রাবণগাথা" প্রভৃতি ঋতুনাট্য। কখনো বিশেষ ভূমিকা নিয়ে দেখা দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। এই সব অনুষ্ঠানে বিচিত্রতা ও নাটকীয়তার ক্রমিক স্ফূর্ত্তি নিশ্চিতভাবে প্রকাশিত করে অনুষ্ঠাতার আন্তরিকতা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ। একবার গানের পালা "নবীনে"র আসরে গিয়ে দেখলাম নাচে-গানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেও মঞ্চের একপ্রান্তে বসে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন ব্যাখ্যার ও আবৃত্তির ভার। তারপরেও কোন কোন অনুষ্ঠানে দেখেছি, নাচগানের সময়ে মঞ্চের একপাশে আসরে আসীন নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বাক মূর্তি। কেবল তাঁর মহনীয় উপস্থিতিই তখন যেন সার্থক করে তুলত সমগ্র আসরকে। আজও আসর বসে, গানের পালা হয়, কিন্তু মঞ্চের উপরে প্রতিভাধরের সেই অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব আর কারুকে অভিভূত করে না।

রবীন্দ্রপ্রতিভার আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করি। আর্টের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি অচ্ছুতকে স্পর্শনীয় করতে চেয়েছেন। এক সাহিত্য ক্ষেত্রেই এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত আছে একাধিক, এখানে তা নিয়ে অলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সঙ্গীতের দিক দিয়ে একটা কথা বললে অবান্তর হবে না। ভারতীয় সঙ্গীতকলায় বাঙালীর বিশেষ দান হচ্ছে, কাব্যগীতি। অবশ্য কাব্যরসস্নিগ্ধ ভাবপ্রধান ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করেছেন বাঙালী ও অবাঙালী বহু কবিই—তাঁদের সুপরিচিত নামের ফর্দ দাখিল না করলেও চলবে। কিন্তু সাধারণ প্রেমসঙ্গীত সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ওস্তাদ-গাইয়েদের মুখে মুখে অবাঙালীর রচিত যে সব প্রেমসঙ্গীত প্রচলিত হয়ে আসছে, সেগুলির মধ্যে যে কাব্যরস একেবারেই নেই, এমন কথা বলব না; তবে সে কাব্যরসের প্রকাশ কি রকম? না প্রচুর মেঘকালিমার মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে একটুখানি বিদ্যুৎবিকাশের মত। ঐ শ্রেণীর অধিকাংশ সঙ্গীতের মধ্যেই একটি বা দুইটি পংক্তির ভিতরে অল্প-বিস্তর কবিতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, বাকি অংশে দেখি খালি বিস্তর শুকনো কথার বুনন।

কবি ও সাধক রামপ্রসাদ যে সময়ে অভিনব ধর্ম্মসঙ্গীতে দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন, ঠিক তার অব্যবহিত পরেই মুখে মুখে অপূর্ব্ব প্রেমসঙ্গীত নিয়ে দেখা দেন বাঙালী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী রামনিধি গুপ্ত (১১৪৮—১২৪৫ বঙ্গাব্দ)। তাঁর রচিত গানগুলি নিধুবাবুর টপ্পা নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। নিধুবাবুর গানের কাব্যসম্পদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচিত হয়েছে অসংখ্য, সুতরাং কারুর সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে আমাকে আর বাক্যব্যয় করিতে হবে না। কিন্তু এখানে একমাত্র বক্তব্য এই যে, নিধুবাবুই হচ্ছেন বাংলা দেশের প্রথম কাব্যগীতি রচয়িতা। এক সময়ে বাংলার হাটে-বাটে মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়েছিল নিধুবাবুর টপ্পাগান, এমন কি ওস্তাদ সমাজেও তার কদরের অভাব হয় নি। এবং আজকের দিনেও অধিকাংশ ওস্তাদ গায়কও তা নিয়ে কিছু না কিছু নাড়া-চাড়া করে থাকে।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই উন্নাসিক ও নব্যশিক্ষিত তরুণের দল নিধুবাবুর প্রভাবকে জোর ক'রে 'নস্যাৎ' ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। সেকেলে বাংলার অনেক কিছুর মধ্যেই তাঁরা ভব্যতা ও সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা আবিষ্কার করতে পারতেন না। সেই অশ্লীলতার যুগে রচিত হ'লেও নিধুবাবুর গানগুলি যে অভাবিতরূপে অশিষ্টতার ছোঁয়াচ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে না। তবু তরুণের দল ফতোয়া দিয়ে বসলেন, সেকেলে

সব কিছুই অপাঙক্তেয়। অতএব পথিকৃৎ নিধুবাবু এবং তাঁর পরে একে একে দেখা দেন শ্রীধর কথক প্রমুখ যে সব পাকা কাব্যগীতি রচয়িতা, তাঁদেরও পাত্তা পাওয়া গেল না তখনকার অতি-আধুনিকদের আসরে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে উপেক্ষিত হয় নি নিধুবাবুর কাব্যগীতির সুর। এই শ্রেণীর প্রেমসঙ্গীতের মধ্যে আছে যে কতখানি সম্ভাবনার সুযোগ, তাঁর দিব্যদৃষ্টি তা দেখতে ভুল করলে না। এখানে দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নেই কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার রচিত গীতাবলীর মধ্যে নিধুবাবুর সুরের প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করা কিছু মাত্র কঠিন নয়। এক জায়গায় নয়, বিভিন্ন জায়গায়। অবশ্য এ কথা বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর ভদ্র বাঙালীর বৈঠকে তার খাতিরের অভাব ছিল না। নাচ সম্বন্ধে এমন কথাও বলা চলে না। কি রক্ষণশীল ও কি নব্য বাঙালী সমাজে নৃত্যের সত্যকার মর্য্যাদা ছিল না কিছুমাত্র। এখানে নৃত্যকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা ব'লে মৌখিক স্বীকৃতি ছিল বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। নৃত্যের ভার অর্পণ করা হয়েছিল সমাজ-বহির্ভূত পতিতাদের উপরে এবং ভদ্র পুরুষদের কাছে তা ছিল নিষিদ্ধ ফলের মতই। থিয়েটারে চলতি ছিল এক শ্রেণীর জাতিচ্যুত নাচ এবং কতিপয় ভদ্রসন্তানও সে নাচে যোগদান করত, কিন্তু ভদ্রসমাজে তারা ছিল দস্তুরমত হরিজনের সামিল। রক্ষণশীল সমাজের অনেকে তবু ঐ সব নাচ দেখে বাহবা দিতে ছাড়তেন না, কিন্তু নব্য রুচিবাগীশরা তা চোখে দেখতেও নারাজ ছিলেন এবং সেজন্যে তাঁদের বড় দোষ দিতেও পারি না, কারণ খেমটা, ঝুমুর বা বাইজীদের নাচ শ্লীল ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। থিয়েটারে গিয়েও আমরা প্রথম বয়সে এমন সব নাচের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, গুরুজনদের সঙ্গে বসে যা কিছুতেই দেখা চলত না। সমাজের সঙ্গে যোগ ছিল না, তাই উচ্চশ্রেণীর চারুকলা হয়েও বাংলা দেশে এসে নৃত্য হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত কুখ্যাত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কিন্তু এমন এক অচ্ছুতশিল্পকে জাতে তোলবার ভার গ্রহণ করবেন যে রবীন্দ্রনাথের মত অভিজাত মনীষী পুরুষ, বাংলা দেশে সেটা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।

শিক্ষিতদের বৈঠকে ভদ্রঘরের বাঙালীর ছেলেরা যে পায়ে ঘুঙুর প'রে নাচবে, পঞ্চাশ বৎসর আগে এটা ছিল আমাদের কল্পনাতীত। সৌখীন ও পেশাদার থিয়েটারে ছিল যে-সব পুরুষ-নাচিয়ে তারা ভদ্রঘরের ছেলে বটে, কিন্তু তাদের নাম-কাটা বকাটে ব'লে মনে করা হ'ত—শিষ্ট সমাজে কেউ তাদের আমল দিতে চাইত না। সেই শ্রেণীর ছেলে আজও আছে সৌখীন ও ভ্রাম্যমান পেশাদার নাট্যসম্প্রদায়ে

এবং যাত্রার দলে, কিন্তু নৃত্যকলা সমাজে এখন গৃহীত হ'লেও আজও তারা কিছুমাত্র সামাজিক সম্মান অর্জ্জন করতে পারে নি।

প্রায় ঐ সময়েই—অর্থাৎ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ণিমা সম্মিলনীর এক আসরে গিয়ে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলুম। সে আসরে উপস্থিত ছিলেন বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী ও দেশবিশ্রুত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁদের অনেকেরই নাম আজকের শিক্ষিত সমাজেও সুপরিচিত ও সমাদৃত। সেই জ্ঞানী ও গুণীদের আসরে দাঁড়িয়েই নৃত্য করলেন তখনকার একজন বিশিষ্ট সুধী—যতীন্দ্রনাথ বসু। সেই দিনই প্রথম বুঝেছিলুম যে, প্রতিবেশ প্রভাবের গুণে বাংলা দেশেও পুরুষের নৃত্য ধিক্কৃত না হয়ে স্বীকৃত ও সমাদৃত হ'তে পারে।

তারপর ১৩২২ সালের কথা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর প্রশস্ত অঙ্গনে "ফাল্গুনী"র স্মরণীয় অভিনয়। অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কেবল স্বর্গীয় গীতামৃতই বিতরণ করলেন না, সেই সঙ্গে নিজের সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ করলেন অপূর্ব্ব এক নৃত্যছন্দ। ললিতকলার প্রত্যেক বিভাগে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ছিল যে কতটা উদার ও মুক্ত, তাঁর সঙ্গে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁদের সে কথা অজানা নেই। সুতরাং তাঁর কাছে নৃত্যকলা যে উপেক্ষিত হয়ে থাকতে পারে না, এটা সহজেই বোঝা যায়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে "ফাল্গুনী" নাট্যাভিনয়ের অল্পকাল পরেই (১৩২৬ সালে) ছাত্রদের জন্যে তিনি মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে ভোলেন নি, যদিও সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টা কিছুদিন পরেই ব্যর্থ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা"র আসরে মাঝে মাঝে বসত স্বদেশী ও বিদেশী নাচের আসর। সেখানেও আমরা দেখেছি পূর্ব্বোক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও তেক্কোরা নামে এক জাপানী নর্ত্তকীকে। এই সব দৃষ্টান্তই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত করত নৃত্যকলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগ।

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে পারেন নি যে, এইবারে বাংলা দেশের মহিলাদের চরণেও ধ্বনিত হয়ে উঠবে নৃত্যের নূপুর। সেই সময়কার একটা কথা মনে পড়ে। স্বর্গীয় ললিতমোহন গুপ্ত সম্পাদিত দৈনিক "হিন্দুস্থান" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলুম, অন্ততঃ দৈহিক স্বাস্থ্য ও গঠনের উন্নতির জন্যেও বাঙালীর মেয়েদের নৃত্যকলা চর্চ্চা করা উচিত। তার ফলে অনেকের কাছে আমাকে রীতিমত খোঁটা খেতে হয়েছিল। কিন্তু যা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর, অনতিবিলম্বে

বাস্তবে তাই-ই হ'ল সম্ভবপর। ১৩৩৩ সালে "নটীর পূজা"র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে চিত্রাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসুর কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবী নটীর ভূমিকায় অনবদ্য নৃত্য দেখিয়ে কলকাতার শিক্ষিত সমাজকে বিস্ময়চকিত ক'রে তুললেন।

এই নিয়ে এখানে ওখানে যে তিক্ত আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে সব হ'ল বন্যার মুখে খড়কুটোর মত তুচ্ছ। কারণ তারপরেই দেখা গেল, কলকাতায় নব্য শিক্ষিতদের ঘরে ঘরে বাঙালী বালিকারা "নটী"র অনুকরণে নাচতে সুরু ক'রে দিয়েছে। পথ খুলে গেছে দেখে আরো কোন কোন তরুণী নাচ শিখে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন। আনাচে-কানাচে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শোনা গেল না তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নারীনৃত্য লাভ করলে জন-সাধারণের পরিপূর্ণ প্রশস্তি। এবং দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে নৃত্যকলা হয়ে উঠল সর্ব্ববাদীসম্মত। রাম-শ্যাম বা আর পাঁচজনেও চেষ্টা ক'রে এমন অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলতে পারত না, কিন্তু বাংলাদেশে নৃত্যকলার নবজন্ম যে প্রথম থেকেই সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠল তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভা ও বিপুল ব্যক্তিত্ব।

রবীন্দ্রনাথ কেবল একটিমাত্র বালিকার নৃত্য দেখিয়ে, আন্দোলনের সূত্রপাত ক'রেই ক্ষান্ত হন নি। আধখেঁচড়া কাজ করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বাংলাদেশের তরুণ ও তরুণীদের সামনে তিনি এক যুগোপযোগী নৃত্যাদর্শ তুলে ধরলেন এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা দেবার জন্যে বোলপুরে এক নৃত্য-বিদ্যালয়ও পত্তন করলেন। সেখানে আহূত হলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রখ্যাত নৃত্য-বিশেষজ্ঞগণ। তারপর মণিপুরী, দক্ষিণী, প্রাচীন নাচ এবং চলতি প্রাদেশিক লোকনৃত্য প্রভৃতির সার সংগ্রহ ক'রে সেখানে যে বিশেষ ভঙ্গির নৃত্য পরিকল্পিত হ'ল, লোকে আজ তাকে এককথায় 'শান্তি নিকেতনের নাচ' ব'লে জানে। এবং কেবল নূতন নৃত্যপদ্ধতি নয়, একে কার্য্যকর ক'রে তোলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ "চণ্ডালিকা", "তাসের দেশ" ও "শ্যামা" প্রভৃতি নৃত্যনাট্যও রচনা করতে ভোলেন নি, বাংলা নাট্যজগতে এও নূতন ব্যাপার। এ দেশে পেশাদার নাট্যশালাতেও যেটুকু নৃত্যচর্চ্চা ছিল, তার মধ্যে নাচ দেখা যেত বিচ্ছিন্নভাবেই; নবরসপূর্ণ বিভিন্ন নৃত্যের সাহায্যে যে একখানি সমগ্র নাটক ফুটিয়ে তোলা যায়, এটা দেখবার সুযোগ আমরা পাই নি। রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রথম নৃত্যনাট্যকার। এইভাবে নবজাগ্রত বাংলা নৃত্যকলাকে সকল দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন

নি। তাঁর প্রতিভার স্পর্শ না পেলে আজও নব্য বাংলার জাতীয় নৃত্য ব'লে কোন-কিছুর অস্তিত্ব থাকত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এবং তাঁর অভিনয়ের কথা আলোচিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে। সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় তাঁর বিশিষ্ট দানের বিষয় নিয়েও মোটামুটি কিছু-কিছু বলবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংক্রান্ত আরো কোন কোন কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি বটে, কিন্তু ভালো করে বলা হয়নি। এদেশী মঞ্চশিল্পেও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি অবদান আছে। এইবারে সেই কথাই বলতে চাই।

Stage-craft বা মঞ্চশিল্পের জন্ম স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে। নাট্যকার নাটক রচনা করেই খালাস; কিন্তু সেই নাটককে সুষ্ঠুভাবে দেখাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় মঞ্চশিল্পীকে। তিনি এই সুকঠিন কর্ত্তব্য পালন করে আসছেন যুগে যুগে দেশে দেশে। প্রাচীন ভারতের মঞ্চশিল্প সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কোন কোন নির্দ্দেশ-পুস্তক আজও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা পাঠ করেও কোন কোন বিষয় নিয়ে কেমন ধোঁকা থেকে যায়। সেকালে রঙ্গমঞ্চের উপরে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হ'ত কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলেন, প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের অস্তিত্ব ছিল। কেউ বলেন, ছিল না। রবীন্দ্রনাথ রায় দিয়েছেন শেষোক্তের স্বপক্ষেই।

মঞ্চশিল্পের মধ্যেই দৃশ্যপট হয়ে উঠেছে একটা প্রধান দ্রষ্টব্য—বিশেষতঃ জনসাধারণের কাছে। এমন সব গোলা লোকেরও অভাব নেই, যারা কেবল 'সিন-সিনারি'র চমৎকারিত্ব দেখবার লোভে রঙ্গালয়ের দিকে ধাবমান হয়। আমাদের কলকাতা সহরে এই শ্রেণীর অধিকসংখ্যক দর্শককে দেখা যায় পার্শী থিয়েটারে এবং অত বেশী দলে ভারি না হলেও বাংলা থিয়েটারও তাদের অনেকের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত নয়। আজ এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় জনসাধারণের মনোভাব জানবার উপায় নেই, কিন্তু এদেশে দৃশ্যপটের প্রতি এই অতিভক্তির জন্ম হয়েছে আধুনিক কালেই। এমন কি যাত্রার আসরে গিয়ে যে সব অত্যন্ত গোলা লোকও তথাকথিত 'সিন-সিনারি' নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামায় না, থিয়েটারে গিয়ে পটের বাহার দেখতে না পেলে তারাও খুসি হ'তে চায় না। ইংরেজী থিয়েটারের দেখাদেখি দেশী থিয়েটারের আত্মপ্রকাশ। সেক্সপিয়ারের যুগেও বিলাতী থিয়েটারে যে দৃশ্যপটের উপসর্গ ছিল না, এ কথা সকলেই জানেন বোধ হয়। কিন্তু তারপর থেকে সেখানে ক্রমেই বাড়তে থাকে দৃশ্যপটের প্রভুত্ব। সেই সময়েই ইংরেজরা কলকাতায়

থিয়েটারের খেল্ দেখাতে সুরু করে এবং বাঙালীরা হুবহু নকল করতে থাকে তাদের ভালো-মন্দ সব-কিছুই !

য়ুরোপেও ব্যাপারটা ক্রমশঃ হয়ে ওঠে বিসদৃশ। এমন কি গর্ডন ক্রেগ শেষটা থিয়েটারকে করে তুলতে চাইলেন চিত্রকরের স্বর্গ ।অভিনয়কে দাবিয়ে রেখে মঞ্চের উপরে ছবিই হয়ে উঠল স্বয়ংপ্রভু। কিন্তু তাঁর মত মেনে নিয়ে যাঁরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তাঁদের কেহই সফলতা অর্জন করতে পারলেন না। এখন লোকের চোখ ফুটেছে। মঞ্চশিল্পের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রেগের কোন কোন মত আজও পরিবর্ত্তিতভাবে গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ মতামতই হয়েছে একেবারেই পরিত্যক্ত। একালের অন্যতম বিখ্যাত মঞ্চশিল্পী লি সাইমনসন বলেন :

"The art of designing stage settings is the art not of making pictures but of relating them to living presences. A scenic drawing is no more than the record of an intention, without value except as it is realized in a theatre." নাটক তথা অভিনয়কে প্রায় পরোক্ষভাবেই সাহায্য করবার জন্যে দৃশ্যপট প্রভৃতিকে দরকার হয়—এমন কি এ-সব উপসর্গ না থাকলেও যে নাট্যকার ও অভিনেতার কাজ সুষ্ঠুভাবে চ'লে যায়, আমাদের যাত্রার আসরে সেই সত্য নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। কুশীলবদের নৈপুণ্যে নাটকের পাত্রপাত্রীরা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে এবং চোখের সামনে কেবল তাই দেখবার জন্যেই নাট্যরসিকরা রঙ্গালয়ে গমন করেন, নাট্যশালাকে চিত্রশালা ক'রে তোলবার জন্যে কোনকালেই তাঁরা রাজী হবেন না। ছবিটা সেখানে হচ্ছে উপরি পাওনার মত, কিম্বা তাকে অলঙ্কার বললেও বলতে পারেন। আসল পাওনা না পেলে উপরি পাওনার মানে হয় না। দেহকে একেবারে ঢেকে ফেললে অলঙ্কারের সার্থকতা কি ?

তাই পাশ্চাত্য রঙ্গালয়েও চিত্রকরের কাজ ক্রমেই সহজ, সরল ও বাহুল্যবর্জ্জিত হয়ে আসছে। দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপটের ভিড় সেখানে আর বড় একটা দেখা যায় না এবং সে ব্যাপারটা আজকালকার দর্শকরাও সেকেলে ব'লে মনে করে। আধুনিক দৃশ্যপট প্রায়ই হয় ইঙ্গিতপ্রধান—দর্শকদের কল্পনা-শক্তিকে জাগ্রত ক'রেই সে ক্ষান্ত হ'তে চায়। এ কর্ত্তব্যসাধনের পক্ষে প্রভূত বর্ণের প্রলেপের পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে তুলির দুই-তিনটি রেখাই যথেষ্ট। কেবল তাই নয়, মাঝে মাঝে কোন কোন মঞ্চশিল্পী দৃশ্যপটকে বয়কট করতেও কুণ্ঠিত হন না, এক বা একাধিক পর্দ্দার সাহায্যেই কাজ সারতে চান।

কিন্তু দৃশ্যপটের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, পেশাদার বাংলা রঙ্গালয় আজও বাস করছে সেই সেকেলে অচলায়তনের মধ্যে। কলকাতার ইংরেজী থিয়েটারের আদর্শে প্রথম যুগের সৌখীন বাংলা রঙ্গালয়ে যে সব দৃশ্যপট আঁকা হ'ত, সেকেলে সংবাদপত্রে তার কিছু কিছু বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, এমন কি দুই-চারিখানা দৃশ্যপটের নমুনা দুর্লভ হ'লেও আজও পাওয়া যায়। সেই সব সৌখীন রঙ্গালয়ের পটশিল্পীদের অনুকরণেই পরে—অর্থাৎ প্রথম যুগের পেশাদার নাট্যশালার পটুয়ারা দৃশ্যপট প্রস্তুত করতেন এবং সেটা হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কথা। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর আধাআধি পেরিয়ে এসেও আধুনিক পেশাদার রঙ্গালয়ের শিল্পীরা প্রায়ই এমন সব দৃশ্যপট অঙ্কন করতে লজ্জিত হন না, যাদের পরিকল্পনা ও ষ্টাইলের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় আদিযুগের সৌখীন রঙ্গালয়ের পটুয়াদের হাতের কাজ। এবং তারও চেয়ে আশ্চর্য্য কথা হচ্ছে এই যে, সেই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন শিল্পীর কাজ দেখেও আমাদের অতি আধুনিক দর্শকদের রসবোধ কিছুমাত্র আহত হয় না। অতঃপর আমরা দেখবার চেষ্টা করব, এই একান্তভাবে পরিবর্ত্তনবিমুখ মঞ্চশিল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা কতখানি আধুনিকতা ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রকাশ করতে পেরেছে।

কলকাতার সৌখীন ও তাঁদের দেখাদেখি পেশাদার নাট্যশিল্পীরা সেকালে ইংরেজদের অনুকরণে যে-শ্রেণীর দৃশ্যপট তথা মঞ্চশিল্প নিয়ে কাজ করতেন, গতবারে তা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। এবং এটাও দেখানো হয়েছে যে, সেই সেকেলে মঞ্চশিল্পের প্রভাব থেকে আধুনিক রঙ্গালয় আজও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই প্রভাবমণ্ডলের বাইরে, অনুচিকীর্ষণের দ্বারা তিনি চালিত হন নি।

কিন্তু নাট্যজগতের যে প্রতিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, তা এই স্বাধীনতার অনুকূল ছিল না। যে কয়েকটি সৌখীন নাট্যশালার আদর্শে পরে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের দ্বারা পরিচালিত জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ছিল অন্যতম। ওখানেও যে দৃশ্যপট নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামানো হত এবং বাস্তবতাকেই মনে করা হত দৃশ্যপটের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের উক্তিতেই সেটা প্রকাশ পায়। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার একটি নাট্যানুষ্ঠান (১২৭৩ সাল) সম্বন্ধে তিনি বলছেন: "ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা

এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর ও সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। "সোমপ্রকাশে"র উক্তি পাঠ করিলে বোঝা যায়, তখনকার নাট্যসমালোচকরাও এই সব দৃশ্যপট দেখে খুসি হয়েছিলেন, যথা—"নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দ্রষ্টব্যর্থগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর হইয়াছিল।"

"সোমপ্রকাশে"র সমালোচক বলেছেন, "নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত" হয়েছিল। তাঁর এই "প্রকৃত রীতি"টা কি? নিশ্চয় প্রাচীন ভারতীয় রীতি নয়, কারণ তখন পর্য্যন্ত তা নিয়ে বাংলাদেশে গবেষণা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। সেদিন পর্য্যন্ত ইঙ্গ-বঙ্গ নাট্যশিল্পীরা প্রাচীন ভারতীয় রীতি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করতে পারলে কলকাতার ইংরেজী থিয়েটারের প্রায় হুবহু নকল করতে অগ্রসর হতেন না। বড় জোর এইটুকু বলা যায় যে, তাঁরা সংস্কৃত নাটকাবলী পাঠ করেছিলেন, তাই সংস্কৃত নাটকের কোন কোন বিশেষত্ব তাঁরাও প্রকাশ করতে ছাড়েন না। সুতরাং তথাকথিত "প্রকৃত রীতি" যে ইংরেজদের দ্বারা গৃহীত রীতি, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালার পূর্ব্বোক্ত অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বয়সে নিতান্ত শিশু। সেই বয়সেই বড়দের দেখাদেখি তিনিও যে খেলাঘরে থিয়েটার পত্তন করবার জন্যে মেতে উঠেছিলেন, এমন প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু সে বয়সটা মৌলিকতা প্রকাশের বয়স নয়। সুতরাং তিনিও যে সব বিষয়ে বড়দেরই নকল করতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। তারও প্রায় এক যুগ পরে তিনি যখন "বাল্মীকি-প্রতিভা" নাট্যাভিনয়ে নট ও নাট্যকাররূপে দেখা দেন, তখন তাঁর বয়স বিশ বৎসর। তার আগেই তিনি বিলাতে গিয়েও মূল বিলাতী রঙ্গালয়েরও সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাঁর মনের মধ্যে মঞ্চকলা সম্বন্ধে কোন আলোড়ন জেগেছিল কিনা, আজ আর তা জানবার উপায় নেই। তবে কলকাতায় "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয়ের সময়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ও নাট্যবিষয়ে শিক্ষাগুরু জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর প্রধান সহকর্ম্মী। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও খুব সম্ভব মঞ্চশিল্পে ঠাকুরবাড়ীতে অবলম্বিত পূর্ব্ব-রীতিই অনুসৃত হয়েছিল। এর পরেও রবীন্দ্রনাথ আরো কয়েকখানি স্বলিখিত নাটক-নাটিকার অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেও মঞ্চশিল্পে বিশেষ কোন নূতন পরিকল্পনা প্রদর্শিত হয়েছিল বলে শোনা যায় না।

"সঙ্গীত সমাজে"র নাট্য-সম্প্রদায়ে অন্যতম প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে রবীন্দ্রনাথ প্রায় দশ বৎসর কাল কাটিয়ে দিয়েছিলেন। "রবীন্দ্র-জীবনী"-লেখক বলেছেন: ১৩০৮ সালের পর তাহার সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়া আসে।" উক্ত নাট্য-সম্প্রদায়ে একা রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন না, সুতরাং যথেচ্ছভাবে কাজ করবার স্বাধীনতাও যে পান নি, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কিন্তু তখন থেকেই মঞ্চশিল্প সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণা তাঁর মনের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে সুরু করেছিল। কারণ ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে নব-পর্য্যায়ের "বঙ্গদর্শনে" তিনি বলেছিলেন: "কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণগৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে।*** নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকা মাত্র;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।" প্রবন্ধের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ নিজের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেছেন এই কথা বলে: "ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।" এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ পরে কোন্ পথ অবলম্বন করেছিলেন, এইবারে তা দেখবার চেষ্টা করব।

১৩০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ "রঙ্গমঞ্চ" নামে যে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন, তার অংশবিশেষ উদ্ধার ক'রে আমরা দেখিয়েছি যে, দৃশ্যপটের প্রতি তাঁর বিরাগটা হচ্ছে পুরাতন। নিজের মতকে দৃঢ়তর করবার জন্যে তিনি আরো ভালো ক'রে বলেছেন: "দুষ্মন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্ত্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও! আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি—এটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে। **** দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটা আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়। **** ভাবুকের চিত্তের মধ্যে

রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবি-কল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"

দেখা যাচ্ছে, দৃশ্যপট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত বেশ স্পষ্ট। কিন্তু এখানে অপর পক্ষও দুই-একটা কথা বলতে পারেন। দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে মর্য্যাদা দিয়েও তাঁরা দৃশ্যপটের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করবেন না। তাঁরা বলবেন, বিলাতে যাঁদের 'গ্রাউণ্ডলিং' বলে এখানে তাঁরা মেঠো দর্শক নামে কুখ্যাত, কিন্তু তাঁরাও যে বিনা দৃশ্যপটেই নাটকের রস উপভোগ করতে পারেন, যাত্রার আসরে গেলেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখা যায় যে, দর্শক মেঠো না হয়ে মনীষী হ'লেও দৃশ্যপট দেখবার বাসনা মনের মধ্যে পোষণ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি অনুসারে বলেছেন, "দুষ্মন্ত-শকুন্তলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক ভঙ্গি একেবারে প্রত্যক্ষবৎ অনুমান করিয়া লওয়া শক্ত—সুতরাং সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান দেখিতে পাই, তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়", সেই যুক্তি অনুসারেই বলা চলে যে, কল্পনায় দ্রষ্টব্য দৃশ্য চোখের সামনে যদি "প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান দেখিতে পাই", তখনও "হৃদয় রসে অভিষিক্ত" হ'তে পারে। বাংলা দেশে যাত্রা যখন থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়, তখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিচারে প্রত্যেকেরই কাছে তার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল দৃশ্যপটের ঐশ্বর্য্য। পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে সমালোচকদের রচনায় আজও এই প্রমাণ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন নাট্যজগতে প্রবেশ করেন, তখন দৃশ্যপটকে অবহেলা করেন নি। হয়তো ও-সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত তখনও দৃঢ়ীভূত হয়ে ওঠে নি, কিংবা ওদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া তিনি দরকার মনে করেন নি। তারপর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও "বিসর্জন" প্রভৃতি নাটকেও তিনি দৃশ্যপটের সামনে দাঁড়িয়েই অভিনয় ক'রেছিলেন। ১৩০৯ সালে পূর্ব্বোক্ত মতপ্রকাশের পরেও অনেক কাল পর্য্যন্ত তিনি দৃশ্যপট বর্জন করেন নি। ১৩২২ সালে "ফাল্গুনী" নাট্যাভিনয়ে এবং তারপরে "ডাকঘরে"র সময়েও যে তাঁর অনুষ্ঠানে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয়েছিল, এটা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি—যদিও সেই সব দৃশ্য-সংস্থানের সঙ্গে থিয়েটারের তথাকথিত "সিনসিনারি"র পার্থক্য ছিল আসমান-জমিন। সুদীর্ঘকাল পরে ১৩৩৬ সালে "তপতী" নাট্যাভিনয়ের সময়ে রবীন্দ্রনাথ আবার প্রকাশ্যভাবে তাঁর পুরাতন মত প্রকাশ করেন—"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা

ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা।" সেই অভিনয়ে সুচারু মঞ্চসজ্জা ছিল, কিন্তু পটপরিবর্ত্তন হয়নি।

কিন্তু এই শ্রেণীর অভিনয়ে বিশেষ একটি অসুবিধায় পড়তে হয়। ঘটনার ধারা যখন প্রবাহিত হয় দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, দর্শকরা সহজে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন না। বারান্তরে বলেছি, বিলাতেও এলিজাবেথীয় যুগের সাধারণ নাট্যশালায় দৃশ্য-পটের চলন ছিল না। কিন্তু পাছে দর্শকরা অসুবিধাবোধ করেন সে জন্যে কুশীলবরাই বিভিন্ন দৃশ্যের পার্থক্য বোঝাবার ভার গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন স্থান বোঝাবার জন্যে সাইনবোর্ডও ব্যবহৃত হ'ত। অবশ্য একালে "প্রোগ্রাম" দেখলে ঐ উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হ'তে পারে বটে, কিন্তু তাতেও অল্পবিস্তর অসুবিধা আছে, এবং যে কারণেই হোক অধিকাংশ দর্শকই যে "প্রোগ্রাম" ক্রয় করেন না, এ কথা আমরা সকলেই জানি।

মঞ্চাভিনয়কে পট-নিরপেক্ষ করবার মধ্যে চিন্তনীয় বিষয় আছে, তাই রবীন্দ্রনাথের ঐ মতের প্রতি উপেক্ষাপ্রকাশ করা চলে না। তবে এই মতানুসারে কাজ করতে গেলে ঠিক কোন্ উপায় অবলম্বন করা উচিত, বোধ করি এখনো তা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নি। মঞ্চকলার অনেকখানিই হচ্ছে visual বা দৃষ্টিগম্য আর্ট। তাই তার মধ্যে শ্রোতব্য বিষয় থাকলেও সংস্কৃত ভাষায় নাটকের অন্য নাম রাখা হয়েছে—"দৃশ্যকাব্য"। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি যে, চিত্রকলার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েও মঞ্চকলা প্রভূত পরিমাণে দ্রষ্টব্য সৌন্দর্য্যের সন্ধান দিতে পারে। বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথই এদিকে সর্ব্বপ্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যজগতেও এই বিষয় নিয়ে অল্পবিস্তর পরীক্ষা চলছে।

এইবারে রবীন্দ্র-অধ্যুষিত নাট্যজগৎ থেকে আমাদের বিদায় গ্রহণের সময় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী নাট্যচর্চ্চা এবং সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়, এই দুটিকেই আমরা দেখতে পেয়েছি একসঙ্গে পাশাপাশি। বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত না করলেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য সকলেরই চক্ষে ধরা পড়বে।

কলকাতায় ইংরেজদের অনুকরণে থিয়েটারের রেওয়াজ রীতিমত জমে ওঠে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। বলা বাহুল্য, সেটা ছিল একেবারেই সৌখীন নাট্যা-ভিনয়ের যুগ এবং তখন সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমি, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রি-ক্যাল সোসাইটি, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ও বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়। এগুলির

অভিনয় পদ্ধতি ঠিক কিরকম ছিল, আমরা তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তখনকার সংবাদপত্র থেকে যতটুকু জানা যায়, এদিক দিয়ে তার মূল্য বেশী নয়, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সমালোচনা নয়, বিবরণ মাত্র।

তবে কিছু কিছু অনুমান করা চলে। তদানীন্তন কালেই সর্ব্বশেষে আত্মপ্রকাশ করে বাগবাজারের বিখ্যাত সখের দল। পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গিয়েছে এক এক যুগে গৃহীত হয়েছে অভিনয়ের এক এক শ্রেণীর আদর্শ ও পদ্ধতি। সুতরাং যদি বলা যায়, পূর্ব্বকথিত সৌখীন নাট্যশালাগুলির আদর্শ সামনে রেখেই বাগবাজারের সখের দল গঠিত হয়েছিল, তাহ'লে নিতান্ত অমূলক কথা বলা হবে না।

অতঃপর বিবেচ্য, কিরকম ছিল ঐ আদর্শ? বাগবাজারের সখের দলই পরে পরিণত হয় পেশাদার বা সাধারণ সম্প্রদায়ে। তখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ে যাঁরা প্রধান ছিলেন (গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু, অমৃত বসু), বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁদের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। এখানে অমৃতলাল বসুর কথা বিশেষভাবে ধর্ত্তব্য নয়, কারণ যথার্থরূপে গম্ভীর ভূমিকায় সাধারণতঃ তিনি আত্মপ্রকাশ করতেন না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর করতেন অতিশয় স্বাভাবিক অভিনয়। তাঁদের অভিনয় ছিল রীতিমত সংযমের দ্বারা নিয়মিত ; তার মধ্যে অত্যধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার স্থান ছিল না বললেই চলে। কেবল সামাজিক নাটকে নয়, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর ও সিরাজদ্দৌল্লা প্রভৃতি অতিরিক্ত রং-চড়ানো রোমাণ্টিক পালাতেও গিরিশ-চন্দ্রকে মেলো-ড্রামাটিক অভিনয় করতে দেখিনি। শুনেছি, সুর নিয়ে গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। সম্ভবতঃ এই শোনা কথা মিথ্যা নয়। একজন অভিনয়ের ভাষণে সুর পছন্দ করতেন, আর একজন করতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ব্যক্তিগতভাবে গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর দুজনেই প্রধানতঃ সুরবর্জ্জিত অভিনয় করতেন। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর কিছু পরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। তাঁদেরও ভাষণ ও অঙ্গভঙ্গি হত যথাক্রমে সুরবর্জ্জিত ও বাহুল্য-হীন। অর্দ্ধেন্দুশিষ্য তারক পালিতও অল্পবিস্তর এই পদ্ধতিতেই অভিনয় করতেন।

কিন্তু গিরিশ-যুগের অধিকাংশ অভিনেতা সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা যায় না। যদিও বাগবাজারের সখের দলের প্রবীণ নাট্যাচার্য্য ছিলেন গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর, তবু তাঁদের শিষ্যবৃন্দের অভিনয়ে যে কৃত্রিমতা এবং সুর ও অঙ্গভঙ্গির বাহুল্য ছিল না, এমন কথা জোর ক'রে বলা অসম্ভব। তখনকার প্রাচীনদের মধ্যেই অন্যতম প্রধান নট ব'লে গণ্য হতেন অমৃতলাল মিত্র। এমনি তাঁর খ্যাতি ছিল যে, অনেকে আজও

গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গেই তাঁর নাম উচ্চারণ করে থাকেন। সকলেই জানেন, অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রেরই শিষ্য। কিন্তু কয়েকটি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখেছি বলেই বলতে পারি, তাঁর ভাবভঙ্গি হত মেলো-ড্রামাটিক ও তাঁর ভাষণে ছিল অতিরিক্ত সুরের প্রাধান্য। শিষ্য হয়েও তিনি গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। খুব সম্ভব অভিনয়ের এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তক ছিল বাংলা দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী সৌখীন সম্প্রদায়গুলিই। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু এই পদ্ধতির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলেও আর সবাই—এমন কি তাঁদের শিষ্যগণও—তা পারেননি। এ বিষয়ের আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে দানীবাবুর অভিনয়। তাঁর প্রথম বয়সে অমৃতলাল মিত্র তাঁকে মানুষ করেছিলেন বটে, কিন্তু যে সব ভূমিকার দৌলতে দানীবাবু এক সময়ে বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব'লে গণ্য হয়েছিলেন, সেগুলি শিখেছিলেন তিনি তাঁর পিতা গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকেই। কিন্তু তবু তিনি বাহুল্যহীন স্বাভাবিক অভিনয় করবার চেষ্টা করেন নি। নিজের পিতাকে তিনি বহুবার "প্রফুল্ল" পালার যোগেশ ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে দেখেছিলেন, কিন্তু দেখেও তিনি কিছুই শেখেন নি। কারণ ঐ ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় হ'ত যেমন অকৃত্রিম, দানীবাবুর অভিনয় হ'ত তেমনি মেলো-ড্রামাটিক। কিন্তু অমৃত মিত্র ও দানীবাবু ছিলেন সত্য সত্যই প্রতিভাবান নট। অন্যান্য যে সব গুণে তাঁদের কৃত্রিমতাও সহনীয় হ'ত, আর সকলের সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। উপরন্তু গিরিশোত্তর যুগে একেবারে চরমে উঠেছিল সুরপ্রধান অভিনয়ে তথাকথিত কৃত্রিমতা ও সংযমহীনতা। এইখানেই ছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয়ের প্রধান পার্থক্য।

আসলে সুর জিনিষটা অস্বাভাবিক নয়, বরং বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, মানুষ তাই আটপৌরে কথাবার্ত্তাতেও সুরের সাহায্য না নিয়ে পারে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের সময়ে একই শব্দকে বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করতে হয়। সুতরাং অভিনয়েও সুরহীন ভাষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু কথা ওঠে বেসুর বা কৃত্রিম সুর নিয়ে। গিরিশোত্তর যুগের শিল্পীরা ঐ কৃত্রিম সুরকেই ভাষণের প্রধান সম্পদ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এজন্যে কেবল গিরিশোত্তর যুগের শিল্পীদেরই দায়ী করলে চলবে না, কারণ ঐ কৃত্রিম সুরেরও একটা ঐতিহ্য আছে। এখানে সব কথা বিস্তৃতভাবে বলা সম্ভবপর নয়, তবে দু-চারটি ইঙ্গিত দিতে পারি। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আমাদের পেশাদার রঙ্গালয় যাঁদের নিয়ে প্রথম যবনিকা তোলে, তাঁদের অধিকাংশই আগে ছিলেন

সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনেতা এবং তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণও ছিলেন তাই। তাঁদের আগে ছিল না থিয়েটারের আসর, ছিল কেবল যাত্রার আসর। সাহেবদের দেখা-দেখি বাবুদের যখন থিয়েটার খোলবার সখ হ'ল, তখন তাঁরা যাত্রার আসর ছেড়ে সরাসরি আরোহণ করলেন বাঁধা ষ্টেজের উপরে। সহজেই অনুমান করা যায়, প্রধানতঃ মঞ্চ ও দৃশ্যপটই তখন যাত্রাকে রূপান্তরিত করেছিল থিয়েটারে। নাটকের গড়নও কিছু কিছু বদলাতে হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু দেখিয়েছেন, সে যুগের "থিয়েটারী নাটক যাত্রার নাটকেরই নবরূপ।" যাত্রাভিনয়ের কোন কোন নিয়মও পরিত্যক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু অভিনেতাদের ভাষণে যে কোন নূতন রীতি অনুসৃত হয়েছিল, এমন কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাত্রার কুশীলবদের কথার ঐ সুর যে কতটা কৃত্রিম হ'তে পারে, আজকের দিনেও পাওয়া যাবে তার প্রচুর প্রমাণ। যাত্রার সুর ও ঢং তো কুখ্যাত হয়েই আছে। প্রথম যুগের সৌখীন থিয়েটারওয়ালারাও ও-ত্রুটির কবল থেকে নিশ্চয়ই মুক্ত হ'তে পারেন নি এবং নাট্যসাধনায় তাঁদেরই উত্তরসাধক হয়ে সেকালকার পেশাদার অভিনেতারাও হয়েছিলেন একই পথের যাত্রী। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর জীবদ্দশাতেই ব্যক্তিগত ভাবে আমাদেরও এই শ্রেণীর বহু নট-নটীর সঙ্গে পরিচিত হ'তে হয়েছে। এমন কি যে যুগটাকে আমরা বাংলা রঙ্গালয়ের নবযুগ ব'লে জানি, তখনও এই দলের লোকগুলি অনেকটা কমজোরি হয়ে পড়লেও, একেবারে আসর ছেড়ে স'রে পড়তে রাজী হন নি।

'ক্লাসিক্যাল' সঙ্গীতের তথাকথিত গোঁড়া ভক্তরা যেমন নূতন নূতন গানের কথায় একই পুরাতন বা সুপরিচিত বাঁধা সুর বসিয়ে আমাদের শুনতে বাধ্য করেন, ঐ অভিনেতারাও আধুনিক নাটকে নূতন ভূমিকা পেলেও সেই বহু-ব্যবহৃত বাঁধা সুরেই কথাবার্ত্তার কাজ চালিয়ে যেতেন নিশ্চিন্তমনে। শব্দার্থ অনুসারে যে সুরের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, এই সহজ জ্ঞানটুকুও তাঁরা ব্যবহার করতে পারতেন না। যাঁদের মধ্যে থাকত প্রতিভার আগুন (যেমন গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি), সেই সেকালেও তাঁরা বাঁধা সুরের দাসত্ব স্বীকার করেন নি, কিন্তু যত্রতত্র যার তার মধ্যে তো জ্বলে না প্রতিভার আগুন!

অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের ভাষণে সুরের প্রতি কোন অনাসক্তিই লক্ষ্য করা যেত না, বরং তাঁর মৌখিক কথাগুলির মধ্যে আমরা লাভ করতুম অসাধারণ সঙ্গীতের প্রতি-ধ্বনি। নাট্যজগতে তাঁর মত সুরেলা কণ্ঠস্বর ছিল সত্য সত্যই দুর্লভ। কিন্তু তা

বেসুর বা কৃত্রিম বা বাঁধা সুর নয়, শব্দার্থ অনুসারে তা কখনো হ'ত কোমল, কখনো কঠোর এবং কখনো বা তরল। বাংলা রঙ্গালয়ের গিরিশোত্তর যুগের শিল্পীরা রবীন্দ্র-নাথের কণ্ঠস্বরের ঐ অপূর্ব ইন্দ্রজাল কোন দিনই আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন নি এবং তার প্রধান কারণ বোধ হয় মনীষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিক্ষায় ছিলেন না তাঁরা উন্নত। আধুনিক বাংলা নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ না ক'রেও ভাষণে স্বাভাবিক সুরের লীলা ও শব্দার্থগত পরিবর্তন প্রথম দেখাতে পেরেছেন শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী এবং তার অন্যতম হেতু, তিনি হচ্ছেন একান্তভাবেই রবীন্দ্র-ভাবরাজ্যের ভাবুক। তাঁর প্রভাবে বাংলা রঙ্গালয়ের নাটকীয় কথোপকথায় সুরের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা নিশ্চিতভাবে অনুভব করা যায়, তবে এই উন্নতি এখনো সর্বাঙ্গীন বা আশানুরূপ হ'তে পারে নি।

গোড়ার দিকে সাহেবদের দেখাদেখি আমরা কোমর বেঁধে নেমেছিলুম থিয়েটারের আসরে—যদিও তখনো ত্যাগ করতে পারিনি যাত্রার রং-ঢং। আমাদের যৌবন-কালেও ষ্টেজের উপরে নাটুকে বীরপুঙ্গবদের যে সব তর্জন-গর্জন, অঙ্গভঙ্গি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি ও মঞ্চের চারিদিকে ঘন ঘন পরিক্রমণ প্রভৃতি মেলো-ড্রামাটিক ব্যাপার ছিল একান্ত সুলভ, সে-সবের আমদানী হয়েছিল যাত্রার আসর থেকেই। কিন্তু আজও প্রায়ই দেখি, ঐ সকল উপসর্গের কবল থেকে আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অব্যাহতি লাভ করে নি। অথচ একেলে পেশাদার শিল্পীদের চোখের সামনে এদিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক অভিনয়ের কি আদর্শ নিদর্শন রেখে গিয়েছেন! শান্ত-ভাবে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ ক'রে, চোখের একটুখানি ইঙ্গিতে, ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলী-ভঙ্গিমায় তিনি যতখানি গভীর ভাবের ছবি দর্শকের মনের পটে এঁকে দিতে পারতেন, তথাকথিত বীরবরদের সুদীর্ঘ ও প্রচণ্ড কণ্ঠরোল, লম্ফঝম্প ও বাচালতার দ্বারা কোন-কালেই তা প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে না। পাশ্চাত্য দেশেও পূর্বোক্ত আধুনিক পদ্ধতি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দুঃখিতভাবে এই কথা ব'লেই আমাদের রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করতে চাই যে, আমাদের নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভার মাহাত্ম্য আজও আমরা ভালো ক'রে উপলব্ধি করতে পারি নি।